দিনরাতের খেলা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৩৬৭

বুদ্ধদেব গুহ

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের

অন্য নগর

দূরের মিছিল

স্মরণচিহ্ন

প্রদক্ষিণ

পূর্বপত্র

দময়ন্তী

দিনরাতের খেলা

॥ এক ॥

প্রথমে খুব ছোট করে লেখা 'দি গ্রেট', পরে বড় বড় অক্ষরে 'জুয়েল সার্কাস' এবং তারও পরে রং করা টিনের ও কাঠের বোর্ডে এত কথা ভুল বানানে লেখা আছে—

"প্রত্যহ দুইবার খেলা। বেলা তিনটায় ও সন্ধ্যা সাতটায়। অসংখ্য সুন্দরী তরুণীর রোমাঞ্চকর খেলা দেখুন! তারের খেলা! সাইকেলের খেলা! বনের হিংস্র জানোয়ারের খেলা! বক্ষে হস্তী উত্তোলন! মোটর বাইক জাম্প! আরও নানা আকর্ষণ! আসুন! দেখুন!

জুয়েল সার্কাস! জুয়েল সার্কাস! জুয়েল সার্কাস!

টিকিটের হার: প্রথম শ্রেণী—দুই টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণী—এক টাকা পঁচিশ পয়সা। গ্যালারি মাত্র পঞ্চাশ পয়সা।"

কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে বড় রাস্তার ধারেই একটা ফাঁকা জমিতে দি গ্রেট জুয়েল সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। চার পোলের নতুন তাঁবু। সন্ধ্যেবেলা খেলার সময় আলো জ্বললে ঝলমল করে ওঠে।

টিকিটের কাউণ্টারের আশেপাশে বড় বড় বোর্ডে অনেক ছবিও আঁকা আছে। সাটিনের রঙিন কাঁচুলি ও জাঙিয়া পরা মেয়েরা লাল ছাতা ঘুরিয়ে তারের ওপর দিয়ে হাঁটছে, সাইকেল চালাচ্ছে। বাঘের খেলা দেখাচ্ছে এক লম্বা চওড়া মানুষ। গলায় মেডেল। হাতে চাবুক। বড় বড় গোঁফ। বাঘগুলো রোগা রোগা, কুকুরের মতন।

মেয়েদের ছবিও বড় অদ্ভুত। মোটা মোটা, বেঢপ। একটা হাত ছোট আর একটা বড়। রঙীন জাঙিয়া ও কাঁচুলি তাদের দেহের অনেকটা অনাবৃত রাখলেও এ সব ছবি দেখে যে দর্শক সাধারণ মুগ্ধ হবে না সে কথা হারকু সাহেব খুব ভাল করেই জানে।

"আমার সার্কাসে আওরাৎ আছে, জানোয়ার আছে—সেই কথাটা পাবলিক জানুক", এসব ছবি দেখতে দেখতে বেশ চড়া স্বরেই কথা বলে হারকু সাহেব, "আমার খপসুরৎ আওরাতের ছবির দরকার না, পাবলিসিটির দরকার।"

হারকু সাহেব অর্থাৎ জে. হারকিউলেস। এই সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার। বেঁটে ছোটখাট মানুষ। লোহার মতন শরীর। চোখ দুটোও ছোট ছোট। গলার স্বর ভারী, রুক্ষও। পিছনে দু' হাত ঝুলিয়ে চলাফেরা করে বড় তাড়াতাড়ি। এক ধার থেকে আর এক ধারে যেতে তার খুব বেশি সময় লাগে না। কোন তাঁবুর কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে ছোট ছোট চোখ দিয়ে তা দেখে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে হারকু সাহেবের।

"আমার নাম জে. হারকিউলেস। হার নাই। জিৎ আমার", এমন কথা এই সার্কাসের আর সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রায়ই বলে থাকে হারকু সাহেব।

"এই সার্কাস শুরুতে কী ছিল? এই এত্তটুকু ফাটা-ফুটা তাম্বু! দু-চারটে ছেঁড়া চ্যাটাই। আওরাৎ না, জানোয়ার না। শুধু বাবুর একটা মোটাসোটা সাপ আর বাঁশ। বাঁশ বাজি, সাপের খেলা আর ডিগবাজি হত জুয়েল সার্কাসে!"

সার্কাসের মালিক রঘুনাথ দাস। পাটনার লোক। হারকু সাহেবের মতন সকলে তাকেই বলে, বাবু।

হারকু সাহেব মাথা উঁচু করে চার পোলের নতুন তাঁবুটা আর একবার ভাল করে দেখে। আর তারই পিছনে প্রায় পঞ্চাশজনের ছোট ছোট কুড়ি-পঁচিশটা তাঁবুর দিকেও তাকায়। কোথাও উনুনের ধোঁয়া, কোথাও বাসন মাজার শব্দ, বালতির ঝন ঝন—উট, হাতি, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুকের বড় বড় খাঁচা, ক্যানটিনের রান্না—সব দেখে, সব শোনে হারকু সাহেব।

জুয়েল সার্কাসের লোকলস্কর জন্তু-জানোয়ার এবং নানা সরঞ্জাম দেখতে দেখতে হারকু সাহেবের শক্ত শরীর একটা তেজে দপদপ করে, আত্মবিশ্বাসের আভা মুখে উছলে ওঠে, "জুয়েল সার্কাসে জে. হারকিউলেস এল। ব্যাস, তারপর হাত্তি এল। উট এল। বাঘ ভাল্লুক সিংহ আর কত আওরাৎ ভি এল। নতুন নতুন খেলোয়াড় এল, পালোয়ান এল—"

নিজের তাঁবুতে বসেই সার্কাসের আর সকলকে বার বার হারকু সাহেব এ সব কথা শোনায়। সে আরও জোরে কথা বলে, তার গলা গম গম করে মাইকের মধ্যে দিয়ে আসা স্বরের মতন, "আরও আসবে—বহুৎ আসবে। চীনা সাহেব, বিলাইতি মেম-সাহেব। কাকাতুয়া, টিয়া পাখি। বন্দুক কামান। ঘোড়া, ট্র্যাপিজ। আমি জান দিয়ে জুয়েল সার্কাস বহুৎ বড় করে যাব!"

শেষ খেলার পর খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়। চার পাশ বড় চুপচাপ, নিঝুম। সব জোরালো আলোগুলো নিভে যায়। অন্ধকার কিলবিল করে ওঠে ছোট বড় তাঁবুর ওপর, জন্তু-জানোয়ারের খাঁচা আর সার্কাসের নানা রকম খেলার সরঞ্জামের ওপর। তখন কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়, গাঁজা খায়, জুয়ো খেলে।

হারকু সাহেবের চোখ জ্বলজ্বল করে, স্বর ঈষৎ জড়ানো, "শিববাবু, নোয়েল সাহেব, কী দেখছেন এখন আমাকে? এই জুয়েল সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার?"

বিনয়ে গলে গলে পড়ে হারকু সাহেব, হাসে। তারপর নিচু গলায় আরও বলে, "সে তো মালিকের সুবিচারের জন্যে, আমার কাজের জন্যে, গুণের জন্যে—"

কিছু সময় সে চুপ করে থাকে। মদের গেলাসে চুমুক দেয়, একটা ঘোরেই টেনে টেনে হারকু সাহেব কথা বলে যায়, "কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। ভুখের জ্বালা ছিল। কত সার্কাসে ঘুরেছি। লাথি খেয়েছি, মার খেয়েছি। কেউ পাত্তা দেয়নি আমাকে।...... এই নবীন, সোডার বোতল খোল!"

"শিবুবাবু, হাত্তি আমি বুকে উঠাইনি বটে আপনার মতন", কালির ভীম শিবনাথের দিকে কিছু সময় বড় স্পষ্ট করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের হাড়গুলো যেন একটি একটি করে গুনে নেয় হারকু সাহেব।

অল্প পরে শার্টের বোতাম খুলে ফেলে নিজের বুকে ঠাস করে হাতের একটা আঘাত করে বলে, "কিন্তু এই বুকের হাড্ডি বড় মজবুত। মণ মণ পাথ্থর ভাঙা হয়েছে আমার এই বুকের উপ্পর—বুঝলেন?"

"তাম্বু না, টিকিট না, ফাই-ফরমায়েশ খাটবার নোকর তো নাই-ই এই জুয়েল সার্কাসের মতন। পেটে ভুখ, নাম ভি কেউ পুছে না।"

"স্রেফ চিত হয়ে শুয়ে পড়তাম রাস্তায়। হাত্তি পেলে সো ভি তুলে নিতাম", লম্বা একটা নিশ্বাস ছাড়ে হারকু সাহেব, তার হুস শব্দও শোনা যায়, "হাত্তি কোথায় পাব! আমার বুকের উপ্পর পাথথর চাপানো হত—ভাঙা হত!"

"হাত তালি কেউ দেয়নি শিববাবু। জানিস নবীন? শুনলেন নোয়েল সাহেব? কিন্তু তাজ্জব বনে গেছে মানুষ। তারা বলেছে, শালা হারকিউলেস আছে।"

"আমার নাম দিল পাবলিক। বাপ-দাদার দেওয়া নামের আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমি বাপের না, মায়েরও না। আমি জুয়েল সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার জে. হারকিউলেস—আমি পাবলিকের নোকর।"

শীত শেষ হয়ে আসছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম। জমাট ধোঁয়ার মতন ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা বড় ঘন। সকাল বেলা হঠাৎ সময় বোঝা যায় না। টিপ টিপ বৃষ্টির ফোঁটার মতন হিমে ভিজে-ভিজে তাঁবু। থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

কয়েকদিন থেকে বিক্রি বেশ কমে গেছে। এ অঞ্চলে আর বেশি দিন খেলা চলবে না। এখন গ্যালারিতেও অনেক জায়গা খালি পড়ে থাকে। কিন্তু এখনো কোথাও নতুন ক্যাম্পের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়নি বলে আর কয়েকদিন এখানেই খেলতে হবে।

খুব সকালে বড় তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল হারকু সাহেব। গায়ে সাদা হাফ শার্ট। সাদা জিনের প্যাণ্ট চামড়ার কালো বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। হারকুসাহেবের হাতে সিগারেট, অনেকটা পুড়েছে।

খুব চিৎকার করছিল হারকুসাহেব, "এ মাহুত, হাত্তি লে আও! বাচ্চু, উট লে আও জলদি। যাও যাও, ড্রাম আউর ক্লারিওনেট লে আনে বল মণিবাবু কো। এ ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো!"

রোজকার মতন আজও একটা বড় দল বার হবে রাস্তায়। হাতি নিয়ে আগে আগে যাবে মাহুত। বামন ক্লাউন গোপাল ড্রামের তালে তালে হাসি-তামাশা করবে। তার সঙ্গে থাকবে আরও কিছু লোক। তারপর গাড়ি। গাড়িতে লাউড স্পীকার বসানো। বাঁশি বাজবে, গীটার ক্লারিওনেট আর রেকর্ডও বাজবে।

থেকে থেকে হঠাৎ ম্যানেজারদেরই একজন বলে উঠবে, "জুয়েল সার্কাস! জুয়েল সার্কাস! জুয়েল সার্কাস! একবালপুর রোডের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ! বনের হিংস্র পশু ও মানুষের মিতালি! মোটর বাইক জাম্প! তার, সাইকেল ও দাঁতের খেলা! অসংখ্য সুন্দরী নারী ও চ্যাম্পিয়ন পালোয়ানের কঠিন কঠিন খেলা দেখুন! জুয়েল! জুয়েল! জুয়েল! ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সার্কাস!"

হারকু সাহেবের আদেশ মতন মাহুত তাড়াতাড়ি হাতি নিয়ে এল। বাচ্চু উট আনল। মণিবাবু বাজনা ও বাজনাদারদের সঙ্গে এসে দাঁড়াল। বেঁটে ক্লাউন গোপাল বিড়ি খেতে খেতে আসছিল, হারকু সাহেবের সামনে আসবার আগে শেষ টান দিয়ে বিড়ি ছুঁড়ে ফেলল।

"আরে, জলদি জলদি—" হারকু সাহেব আরও ক্ষিপ্র হয়ে উঠল, আরও তৎপর, "নেই নেই বুদ্ধু, উট একদম পিছে। হাত্তি আগে লে আও! উট বহুৎ লম্বা না?"

উটের দৃষ্টি অনেক ওপরে, রাস্তার বড় বড় গাছের দিকে। সে হারকু সাহেবকে দেখবার জন্যে গলার কোন দুরূহ ভঙ্গি এখন করল না। হাতি করল, সামনের একটা পা তুলে অভিবাদন জানাল জেনারেল ম্যানেজারকে। খেলার সময় দর্শকদের যেমন করে, ঠিক তেমন।

হারকু সাহেব হাতির কাছে এসে তার গায়ে হাত রাখল। হাতির বয়েস বেশি না। বাচ্চা। মোটে কয়েক মাস আগে কিষণগঞ্জের মেলা থেকে কেনা হয়েছে। হাতির চোখ থেকে জল পড়েছে। তার চোখের নিচে এখনো জলের শুকনো দাগ বেশ স্পষ্ট।

"লছমী", হারকু সাহেব হাতির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খুব নরম গলায় ডাকল। প্যাণ্টের পকেট থেকে বাদামি রঙের একটা ছোট রুমাল বের করে লছমীর চোখের জলের দাগ তোলবার চেষ্টা করতে করতে মাহুতকে বলল, "দেখিস না, এ-সব কী হয়েছে হাত্তির গায়ে?"

"মচ্ছড় কেটেছে সাহেব—"

"চোপ রও উল্লু!" মাহুতকে ধমক দিল হারকু সাহেব, "সারা রাত বেচারিকে মচ্ছড় কাটবে, ওর আঁখ দিয়ে পানি গিরবে আর তুই শালা মজা মারবি?"

হারকু সাহেবের মুখের ওপর কোন কথা বলবার সাহস নেই মাহুতের। সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

"নবীনের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নিবি। রাতের খেলা হয়ে গেলে ফ্লিটের স্প্রে করবি হাত্তির গায়ে—বুঝলি?"

মাহুত আস্তে বলল, "জী।"

"এইবার আপনারা বেরিয়ে যান। মণিবাবু, ব্যাণ্ড লাগান। গোকুলবাবু, একটু ভাল করে বলবেন যে, আমরা এখান থেকে জলদি যাব, খেলা আর খুব কম দিন হবে। মাঝে মাঝে হিন্দী ভি বলবেন, সব মানুষ বাংলা বোঝে না। যান যান গোপালবাবু, আর দেরি করবেন না—"

ড্রাম বাজল, ডেরারা ডেরারা ড্রাম! ডেরারা ডেরারা ড্রাম! গাল ফুলিয়ে ক্লারিওনেটে ফুঁ দিল মণিবাবু। গোকুলবাবু ভ্যানে বসে চোখের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরল। এটা দেখেই আর-একটু এগিয়ে গিয়ে মাইকের কাছে সে মুখ আনবে। হারকু সাহেব যেমন বলে দিয়েছে, সেসব কথা তো বলতে হবেই। একটা পেনসিল হাতে নিয়ে গোকুলবাবু কাগজে যা-যা লেখা আছে, তা একটু বদলে নিচ্ছিল।

পিছনে দু' হাত ঝুলিয়ে হারকু সাহেব অফিস টেণ্টের দিকে এগিয়ে আসছিল। তার কপাল ভাবনার কয়েকটা রেখায় অল্প কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আজকালের মধ্যেই কোথায় নতুন ক্যাম্প হবে, তা ঠিক করে নিতে হবে। বাবু কবে ফিরবে, ঠিক নেই, তার একটা চিঠি আসা উচিত ছিল।

বাবু আসেনি। কলকাতার বাইরে গেছে বাঘ কিনতে। নগদ পাঁচ-সাত হাজার টাকা নিয়ে গেছে। জুয়েল সার্কাসে এখন গোটা দুই বাঘের খুব দরকার। দুটো চিতা আছে বটে, খুব দাম নেই ওগুলোর—মানুষ বাঘের খেলাই বেশি পছন্দ করে।

দেখা যাক বাবু কী করে! একটা সিংহ আর একটা সিংহী অন্য আর-এক সার্কাস বন্ধ হয়ে যাবার সময় সস্তায় কেনা হয়েছে। বাঘের চেয়ে সিংহের দাম অনেক কম। তাই কিনে নিয়েছিল বাবু। বাঘও পাওয়া যেত, কিন্তু তখন বড় বাঘ কেনবার মতন অবস্থা ছিল না জুয়েল সার্কাসের।

সিংহী বড় হিংস্র। অন্য সার্কাসে দু-একজনের হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল। এখনো রিং-মাস্টারের কথা শোনে না ঠিক মতন, তার ঘাড়ের ওপর

লাফিয়ে পড়তে চায়। কয়েক দিন আগে খুব মেজাজ দেখিয়েছিল। কৌশল করে তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে দিতে হয়।

সিংহর গলার নিচে একটা ঘা হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগেই লক্ষ করেছে হারকু সাহেব। রিং-মাস্টারকে জিজ্ঞেসও করেছে। রিং-মাস্টার আমল দেয় না। বলে, ওদের এমন ঘা হয়। ও কিছু না, আপনি সেরে যাবে।

এখনো ঘা শুকোয়নি সিংহর। অল্প অল্প কাবু হয়ে আসছে যেন। তার গর্জন আর্তনাদের মতন। এখনো রিং-মাস্টার চুপচাপ আছে। আশ্চর্য! মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল হারকু সাহেবের। সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না, এবার তার বোঝাপড়া হবে রিং-মাস্টারের সঙ্গে।

আরও জানোয়ারের দরকার। কয়েকটা বাচ্চা ঘোড়া সস্তায় কিনে নিতে পারলে ভাল হয়। লীলা হাসি যমুনা কাঞ্চী নলিনী বেলা শান্তা আমিনা আর রেবতী খুব চালাক মেয়ে। এরা অল্প দিনের মধ্যেই ঘোড়ার খেলা শিখে নিতে পারবে।

বড় তাঁবুর কাছাকাছি একটা ছোট পরিচ্ছন্ন তাঁবু। টেবিল আছে, চেয়ার আছে, গেলাস জলের কুঁজো আর কাগজপত্র ফাইল রাখবার একটা ছোট র‍্যাকও আছে। তাঁবুর বাইরে দড়ির ওপর একটা ছোট কাঠের বোর্ড ঝুলছে। বেশ বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা আছে, অফিস।

অফিসে ঢোকবার আগে প্যান্টের পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে হারকু সাহেব একবার চারপাশে তাকিয়ে নিল। বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। হাতি উট গাড়ি আর অনেক মানুষ বেরিয়ে গেছে। প্র্যাকটিস চলছে বড় তাঁবুর ভেতর। যাদের প্র্যাকটিসের দরকার নেই, তারা সংসারের কাজ সেরে নিচ্ছে। ছেলেরা বাজারে কিংবা চেনা-জানা মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেছে, কেউ কেউ বিশ্রাম করছে। মেয়েরা জামাকাপড় সেলাই করছে, ইস্ত্রি উনুনে বসিয়েছে, কলের কাছে দাঁড়িয়ে কুঁজো বালতি ভরে নিচ্ছে।

তাঁবুর পিছনের দিকের পর্দা তোলা ছিল, তাই এইসব দৃশ্য চোখে পড়ল হারকু সাহেবের। রোদ আসবে বলে তাঁবুর দু' দিকের পর্দাই ভোরবেলা ঝাঁট দেওয়ার সময় তুলে রেখে গিয়েছিল ছোকরা অনন্ত। এখন হারকু সাহেবকে অফিসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, পিছন দিকের পর্দা নামিয়ে দিয়ে গেল।

"এ অনন্ত—"

"হাজুর?"

"দেখো শিববাবু হ্যায় কি নেই, বোলাও জলদি", হারকু সাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। দু পা ছড়িয়ে দিল সামনে, সিগ্রেট ধরাল। তার মুখ এখন খুব প্রসন্ন নয়। স্থির হয়ে বসে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

অনন্ত ছুটে এসে খবর দিয়েছিল শিবনাথকে। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে দেরি করল। দাড়ি কামাল। অনেক সময় নিয়ে সাবান ঘষে-ঘষে মুখ ধুল। লুঙ্গি ছেড়ে শার্ট প্যান্ট কোট পরল। তারপর বাজারের থলি হাতে আস্তে আস্তে হেঁটে অফিসে হারকু সাহেবের সামনে দাঁড়াল।

শিবনাথের সাজ-পোশাক দেখে হারকু সাহেব হাসল, "কোথায় চললেন?"

"বাজারে যাচ্ছি মাংস কিনতে", হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ার শুধু কাছে টেনে নিল শিবনাথ, বসল না, "এ-সার্কাসে তো আর মাংস-টাংস কেনবার পাট নেই, শরীরটা রাখতে হবে তো।"

শিবনাথের কথা বলবার ধরন দেখে বন্দুকের শব্দের মতন রূঢ় একটা শাসন বেরিয়ে আসতে চাইছিল হারকু সাহেবের গলা ঠেলে। একটা দাহ তার চোখ মুখ এবং সমস্ত দেহ কয়েক মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন করে তুলল।

কিন্তু মুখ কঠিন হয়ে থাকলেও এলোমেলো কথা বলল না হারকু সাহেব, শুধু শব্দ করে চেয়ারটা টেবিলের আরও কাছে টেনে নিল, "আপনি ঠিক কথা বলেছেন শিববাবু", সে বেশ নরম গলায় বলল, "শরীর তো রাখতে হবেই, কিন্তু আমার কোম্পানীকেও তো রাখতে হবে। আপনি জানেন, এই ক্যাম্পে আমাদের কত টাকার লোকসান হল?"

অন্য দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বিরক্তি প্রকাশ করবার মতন একটা ভঙ্গি করে বলল, "না।"

"কিন্তু জানা দরকার ছিল", শিবনাথকে ঘুরিয়ে খোঁচা মারবার জন্যেই স্বর হঠাৎ খুব হালকা করে তুলল হারকু সাহেব, "আপনি এই সার্কাসের একজন ম্যানেজার আছেন তো বটে?"

এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না শিবনাথের। হারকু সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার অস্বস্তি হচ্ছিল। রোদের একটা ফালি ছিটকে এসে পড়েছিল তাঁবুর ভেতরে। সেদিকে তাকিয়ে হাতের থলিটা গুটিয়ে নিতে নিতে শিবনাথ কিছু পরে বলল, "আমাকে ডেকেছেন?"

"বসুন শিববাবু, বসুন", ডান হাতের কনুই টেবিলে রাখল হারকু সাহেব, লম্বা একটা টান দিল সিগ্রেটে, "আগের ক্যাম্পে ভাল পইসা হল না, এখানেও লোকসান হল। পরের ক্যাম্পে লাভ না হলে বাবু অনেক রাগ হবে—আমারও মুখ থাকবে না—"

"এর পর কোথায় খেলবেন?"

"টালিগঞ্জের কথা আপনি বলেছিলেন না?"

"এক মাসের জন্যে চার হাজার টাকা চায়।"

"চার হাজার টাকা!" টেনে টেনে উচ্চারণ করল হারকু সাহেব, অসহায় মানুষের মতন করুণ হাসল, "অত পয়সা দেবার ক্ষমতা জুয়েল সার্কাসের নাই শিববাবু, সে কথা তো আপনি জানেন।"

"তবে জায়গাটা খুব ভাল ছিল কিন্তু", হারকু সাহেব যে অসুবিধার কথা তুলল, তা গ্রাহ্য না করেই বলল শিবনাথ, "রাস্তার ওপর, টালিগঞ্জ রেসকোর্সের একেবারে পাশে, গলফ্ ক্লাব রোডের মুখে—"

শিবনাথের কথা শোনবার ধৈর্য থাকল না হারকু সাহেবের। এসব বর্ণনা তার প্রলাপের মতন মনে হচ্ছিল। বেশি কথা বলে শিবনাথ। সেসব কাজের কথা না।

তাকে থামিয়ে দিয়ে একটু জোরে হারকু সাহেব বলে উঠল, "আর কোথায় কোথায় জায়গা দেখেছেন বলুন?"

চুপ করে থাকল শিবনাথ। হারকু সাহেবের কথার উত্তর দিতে পারল না। বাজারের থলিটা দু' হাতে দুমড়ে মুচড়ে সে আপনমনেই উত্তেজনা প্রকাশ করতে থাকল। কেননা, হারকু সাহেবের গলা তার বড় রূঢ় মনে হল, কৈফিয়ত তলব করার মতন।

"চণ্ডীতলা যাদবপুর বড়াল গ্রাম—এসব জায়গার কথা আপনাকে বলেছিলাম—খবর করেছেন?"

"না", হারকু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলল শিবনাথ, হাতের

থলি ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে, "আমি হাওড়ায় লোহার বলের অর্ডার দিতে গিয়েছিলাম, বাজার ঘুরে-ঘুরে নতুন তার খুঁজতে হয়েছে—"

"ওসব ফালতু বাত ছাড়ুন শিববাবু, ওসব দু' মিনটের কাজ। এখন আমি কী করব বলুন?" চেয়ার ছেড়ে হারকু সাহেব উঠে দাঁড়াল, অস্থিরতার একটা ঝাঁজ তাকে তাঁবুর এক দিক থেকে আর এক দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে খুব জোরে জোরে সে নিশ্বাস ফেলছিল, মনে হচ্ছিল হারকু সাহেব হাঁপাচ্ছে।

হারকু সাহেবের দিকে এখন শিবনাথ দেখল না। কেননা, সে জানত হারকু সাহেবের চেহারা দেখলেই তার হাতের পেশী আরও ফুলে উঠবে, মেজাজ চড়ে যাবে। সকাল বেলা শান্ত হয়েই থাকবার চেষ্টা করছিল শিবনাথ, নিজের পয়সায় মাংস খেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে বিশ্রাম করতে চাচ্ছিল।

অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে গেটের দিকে হাত দেখাল হারকু সাহেব, শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন একটাও মানুষ নাই গেটের সামনে—বাচ্চা ছেলেমেয়েও না? একদম ফাঁকা। গ্যালারীর টিকিটও বিক্রি হয় না। বাবু নাই বলে আমি জোর করে এখানে খেলছি। লেকিন আর না। বড় জোর সাত-আট দিন। তারপর কোথায় যাব?"

"অত ভাববার দরকার কি", শুকনো গলায় শিবনাথ বলল, "ক্যাম্প ঠিক হয়ে যাবে।"

তাকে এখনো স্থির থাকতে দেখে উত্তেজনায় অল্প পিছিয়ে এল হারকু সাহেব, শব্দ করে জুতোসুদ্ধ পা একটা চেয়ারের ওপর তুলে ভারী স্বরে থেমে থেমে বলল, "আপনি পয়সার জন্যে সার্কাসে খেলতে আসেননি শিববাবু, আপনি লিখাপড়াজানা ভদ্দর লোক। আপনি এসেছেন নামের জন্যে, হাততালির জন্যে। কিন্তু আমার সার্কাসের বাকি পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষ? তাদের পয়সার দরকার আছে।"

শিবনাথের মুখ রক্তবর্ণ হল। স্থির হয়ে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মাথার মধ্যে রক্তের প্রবল চাপ সে অনুভব করছিল। একটা তাপ বেরিয়ে আসছিল তার বুকের ভেতর থেকে। ঠোঁট অল্প ফাঁক, উঁচু এবং বড় বড় দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

শিবনাথের গলার স্বর খুব রুক্ষ, প্রতিবাদের মতন, "হারকু সাহেব, নামের জন্যে, হাততালির জন্যে আমি এ সার্কাসে পড়ে নেই, অনেক বড় সার্কাস আমাকে লুফে নেওয়ার জন্যে বসে আছে।"

হারকু সাহেব হো-হো করে হেসে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল, "কোন্ সার্কাস? জেমিনি? রোমন? ইণ্টারন্যাশনাল? শিববাবু, কী শিখলাবেন আপনি আমাকে? ও-সব সার্কাসে মেয়েরা আপনার মতন হাত্তি বুকে উঠায়—"

"ফাঁকির খেলা, তক্তার কারসাজি", বাজারের থলি পায়ে মাড়িয়ে শিবনাথ চিৎকার করছিল, "আমি শুধু হাতি পাস করাই না, বুকের ওপর দু' মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখি। কে কোন্ সার্কাসে এ-খেলা দেখাতে পারে, বলুন?"

শিবনাথের প্রশ্নের ঝাঁজে কিছু দমে গেল হারকু সাহেব। তা হলেও হার-স্বীকার করতে চাইল না। তার অহংকার ভাঙবার জন্যে ভেবে-ভেবে বলল, "রোমন সার্কাসে সুধীরবাবু না কে আছে—আরও অনেক পালোয়ান এখন বড় বড় হাত্তি বুকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে—"

"ঝুট বাত!"

“না, ঝুট বাত না। সার্কাস কোম্পানীর খবর আমি আপনার থেকে অনেক বেশি জানি—” খুব শব্দ করে বড় রাস্তা দিয়ে পর পর কয়েকটা লরি যাচ্ছিল বলে হারকু সাহেব একটু চুপ করে থাকল।

কিছু পরে বলল, “শিববাবু, খেলোয়াড়ের চুপচাপ থাকা ভাল, দেমাক ভাল না। আপনার কথা আপনি কেন বলবেন? আপনার পাবলিসিটি আমরা করব। গোকুলবাবু মুখে মাইক লাগিয়ে চিল্লাবে, কলির ভীম শিবনাথ। হ্যান্ডবিলে লিখা হবে, দাঁত দিয়ে ভারী-ভারী বেঞ্চি তুলবার ক্ষমতা সারা দুনিয়ায় কেবল আপনার একলারই আছে। আপনি চুপচাপ খেলে যাবেন। দেমাক খেলোয়াড়কে ফিনিশ করে দেয়—”

হারকু সাহেবের কথা শুনতে শুনতে কিছু শান্ত হল শিবনাথ। যদিও তার মুখ এখনো গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন, সেখানে ঝাঁজের কোন প্রকাশ ছিল না।

তাকে দেখতে দেখতে হারকু সাহেব একটা তৃপ্তি অনুভব করল। তার মনে হল, শিবনাথের ওপর সে এবার প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছে।

এত পরে হারকু সাহেব শিবনাথের দিকে সিগ্রেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে হাসল, “এই যে শিববাবু, সিগ্রেট খান।”

“না থাক”, সিগ্রেট নিল না শিবনাথ, মাটি থেকে থলিটা তুলে ঝেড়ে নিয়ে বলল, “আমি এখুনি বার হচ্ছি, নতুন ক্যাম্পের ব্যবস্থা না করে আজ ফিরব না।”

“তিনটার মধ্যে জরুর ফিরবেন, আপনার নম্বর না করলে পাবলিক তাম্বু জ্বালিয়ে দিবে।”

শিবনাথ বেরিয়ে যাবার আগেই নবীন এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি এদিকে আসতে গিয়ে এইমাত্র তার চটি ছিঁড়েছে। তাহলেও জরুরী খবর বয়ে আনছে বলে খুব উৎফুল্ল হয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে নবীন।

“হারকুসাহেব, পুষ্পরাজ আর ঊষা এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এখানে নিয়ে আসব?”

“কী নাম বললি?” হঠাৎ একটা ব্যাকুল আগ্রহ হারকুসাহেবের মুখ ছেলে-মানুষের মতন নরম করে তুলল।

নবীন তাদের পরিচয় হারকুসাহেবের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে আরও বলল, “কোহিনুর সার্কাসের এক নম্বর ট্র্যাপিজ আর্টিস্ট পুষ্পরাজ আর ঊষা—”

নবীনের মুখ থেকে প্রথমবার নাম শুনেই হারকুসাহেব বুঝতে পেরেছিল কারা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বলেই আবার নবীনকে নাম জিজ্ঞেস করল।

“যা যা, জলদি লিয়ে আয়”, একটা আবেগ এখনো থরথর করছিল হারকু-সাহেবের গলায়। তার স্বর বেশ নিচু, এলোমেলোও।

নবীন চলে যাবার পর হারকুসাহেব চেয়ার টেনে-টেনে টেবিলের কাছে সাজিয়ে রাখল, রুমালের বাড়ি মারল দু-এক জায়গায়। শতরঞ্চির ওপর থেকে তারই খাওয়া পোড়া সিগ্রেটের টুকরো লাথি মেরে বাইরে সরিয়ে দিল।

শিবনাথের কানের কাছে হঠাৎ মুখ নিয়ে এল হারকুসাহেব, “শিববাবু আপনি আভি টালিগঞ্জে বেরিয়ে যান, ও-ই জায়গা চাই আমার। একটু দরাদরি করবেন। রাজি না হয় তো চার হাজার টাকাই হোক। পুরা এক মাসের কথা বলবেন। বিশ তারিখ থেকে সেখানে খেলব।”

শিবনাথ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়, পরে হারকুসাহেবকে দেখে হাসল। এখন তার প্যাকেট থেকেই সিগ্রেট নিয়ে ধরাল শিবনাথ এবং যেদিক দিয়ে ঊষা আর পুষ্পরাজ আসছিল, সেদিক দিয়েই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে টালিগঞ্জের দিকে গেল।

॥ দুই ॥

খুব আস্তে আস্তে হেঁটে নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছিল নবীন। ছেঁড়া চটির একটা পেরেক তার আঙুলে খোঁচা মারছিল, কিছু কিছু ঘাসও ঠেকছিল পায়ে। ভিজে, ঠাণ্ডা। নবীন এক-একবার নিচু হয়ে ঘাস দেখছিল।

ব্যাঙের ছাতার মতন অনেক ছোট ছোট তাঁবুর ওপর শীতের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেছে। বড় তাঁবুর ভেতর থেকে মোটর বাইকের শব্দ আসছে। নবীনের মাথা ধরে যাচ্ছিল।

সকাল থেকেই চিল উড়ছে। রিং-বয়রা গরুর মাংস ঠেলে দিচ্ছে বাঘ সিংহর খাঁচায়। নবীনের নাকে একটা উৎকট গন্ধ লাগল। সে দেখল, সামনে দু পা মেলে একটা হাড় চিবোচ্ছে সিংহ, তার মুখ এখন বড় হিংস্র। মাংসের দু-একটা টুকরো খাঁচার বাইরে ছিটকে পড়েছিল, রাস্তার কুকুর তা মুখে তুলে নিয়েছে।

রোজকার মতন আজও আর একবার চার পাশ বড় রুক্ষ মনে হল নবীনের। এই রুক্ষতা পুনঃ পুনঃ মশার কামড়ের মতন তার মনে একটা বিরক্তিকর অনুভূতিও এনে দিচ্ছিল। রিং মাস্টারের চাবুকের ভয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জানোয়ার যেমন রাগে গরর গরর করতে করতে খেলা দেখায় এবং আক্রমণ করবার সুযোগ খোঁজে, নবীনের অবস্থাও ঠিক যেন তেমন।

যদিও জানোয়ারের মতন হারকু সাহেবের মুখের ওপর সে ঝাঁজ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে না, শুধু মনে-মনে একটা আক্রোশ পুষে রাখে। যে-বিষ অল্প অল্প করে জমে উঠছে, একদিন তা ঢেলে ফেলে এই মৃত্যুর জগৎ থেকে বেরিয়ে যাবে নবীন।

যত সহজে এসব কথা মনে আসে নবীনের তত তাড়াতাড়ি সে এখান থেকে বাইরে যাবার কোন পথ খুঁজে পায় না। কেননা হারকু সাহেব জানোয়ারের মতন তারও হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে এবং খাঁচার ভিতরেও ঠেলে দিয়েছে। নিজের তাঁবুটা এখন খাঁচার মতনই মনে হয় নবীনের।

হারকু সাহেব! নাম মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে নবীনের মুখ বড় কঠিন হয়ে উঠল। যে তার বিয়ে দিয়েছে, হিসেবনিকেশের দায়িত্ব দিয়ে তাকে মান-মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে তার ওপর এমন আক্রোশ পুষে রাখা নবীনের পক্ষেও বড় যন্ত্রণার।

ঠাণ্ডা হাওয়া কনকন করে উঠছে নবীনের গায়ে। সে বিমূঢ় এবং ক্লান্ত। তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। আধময়লা চাদরের অংশ তুলে ধরে চোখ মুছে নিল নবীন, মাটিতে পা ঘষে ঘষে তার বিমূঢ় ভাব কাটাবার চেষ্টা করল।

তাঁবুর দিকে যেতে যেতে কিছুদূরে একটা বড় পোস্টারে ক্লাউন করালী-কান্তর অদ্ভুত চেহারা দেখে সে আরও আস্তে হাঁটতে লাগল। করালীকান্তর বাবরি চুল, গোলগোল চোখ, মাথায় লম্বা একটা টুপি। পানের দোকানের

ধুলোপড়া আয়নায় নবীন একদিন তার নিজের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। চেনা যায় না। একেবারেই অন্যরকম। লম্বা মুখ, পুরু ঠোঁট, নাক কান অনেক বড়।

নিজেকে দেখতে দেখতে তখন একবার নবীনের ক্লাউন হওয়ার কথাও মনে হয়েছিল। তাকে দেখে লোকে যদি হাসত, হাততালি দিত, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা না খুঁজে পেলেও অন্ধকারে সিংহীর খাঁচা খুলে মাতাল হারকু সাহেবকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠতে পারত, নয়া আওরাতের খেল দেখ শালা!

তাঁবুর মধ্যে লীলাকে দেখে অপ্রস্তুতের মতন দাঁড়িয়ে থাকল নবীন। তার এখন এখানে থাকবার কথা নয়। প্র্যাকটিসে সে কেন যায়নি, নবীন বুঝল না। লীলা তাঁবুতে আছে জানলে সে হয়তো এ সময়ে এদিকে আসত না।

খুব ছোট তাঁবু। জায়গা বড় কম। রোজকার দরকারের টুকিটাকি জিনিস এদিক-ওদিক পড়ে আছে। একটা টুলের ওপর যত্ন করে রাখা মা-কালীর বাঁধান পট। দুটো ক্যাম্প খাট। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ। স্নো, ক্রীম, পাউডার, সাবান তা-ও রাখা আছে একদিকে। একটা দড়িও টাঙানো আছে। নবীনের ধুতি গামছা, লীলার শাড়ি ব্লাউজ আর সার্কাসের পোশাক ঝুলছে।

গোলাপী সাটিনের একটা নতুন ফ্রক আর হলদে জাঙিয়া ইস্তিরি করছিল লীলা। নিজে পয়সা খরচ করে পছন্দ মতন করিয়েছে। তাঁবুর বাইরেই বালতি উনুন জ্বলছে। সে একটু আগে তার ওপর থেকে গরম ইস্তিরি তুলে এনেছে। জাঙিয়ায় অল্প জলের ছিটে পড়েছিল বলে ইস্তিরির চাপ পড়বার সময় ধোঁয়া উঠছিল।

লীলা নবীনকে দেখল। প্রথমে কথা বলল না। পরে, ইস্তিরি ঘষতে ঘষতেই জিজ্ঞেস করল, "এখন রাউটিতে এলে? কাজ নেই?"

কাজ অনেক নবীনের। খুশি মতন সে তাঁবুতে আসতে পারে না। এখন হারকু সাহেব ব্যস্ত। ঊষা আর পুষ্পরাজের সঙ্গে কথা বলছে। নবীন জানে, সে তাকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করবে না। অনেক সময় নিয়ে ঊষা আর পুষ্পরাজকে জুয়েল সার্কাসের ইতিহাস শোনাবে। এ সার্কাস গড়ে তোলবার সবটুকু কৃতিত্ব যে তারই প্রাপ্য, সে-কথা চতুরের মতন বুঝিয়ে তাদের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলবে হারকু সাহেব। এবং বাবু ফিরে এলে তাকেও বলবে, আর দুটা নতুন আর্টিস্ট আনলাম—আমার জুয়েল সার্কাস আরও বড় হল!

বাবু হাসবে। আরও বেশি নির্ভর করবে হারকু সাহেবের ওপর। যেন হারকু সাহেবই জুয়েল সার্কাসের মালিক এবং বাবু তার হাতের আর একজন লোক।

লীলার কথার উত্তর দিল না নবীন। এসব ভাবতে ভাবতে তাকে সে-ও জিজ্ঞেস করল, "প্র্যাকটিসে গেলে না?"

"পরে যাব খন। নতুন ছানাপোনাদের আগে টিট করুক না মাস্টার। আমি তো মেরে এনেছি, পরের ক্যাম্পে বল ডেন্স নম্বর করে দেব ঠিক," লীলার পায়ে অল্প ব্যথা হয়েছিল, কথা বলতে বলতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়াল। পরে, মাটিতে পা দুটোও চেপে নিল।

আরও একটা নতুন খেলা শিখছিল লীলা। খুব বড় তক্তার ওপর চামড়া দিয়ে মোড়া একটা কাঠের বল থাকবে। বলের ওপর উঠে দাঁড়াবে লীলা, নাচের মতন ভঙ্গি করে খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। এপাশে

ওপাশে বোতলের সারি, তক্তার ধারে ধারে কোন কোন অংশ বেশ উঁচু। বোতল বাঁচিয়ে লীলা পথ করে নেবে। উঁচু জায়গায় উঠবে, পায়ে বল চেপে নিচে নামবে। তার পা কখনো মাটিতে পড়বে না।

এ খেলার কথাই লীলা বলল, বল ডেন্স।

নবীনের শরীরের খাঁজে-খাঁজে বাতের ব্যথার মতন ক্লান্তি সেঁটে ছিল। সে লীলার সব কথা ভাল করে শুনল না। শুধু বুঝল যে, লীলা আরও কিছু সময় তাঁবুতে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল বলে নিজের খাটের একদিকে বসে পড়ল নবীন, চুপচাপ থাকল।

নিজের কাজের কথাই ভাবছিল নবীন। একটু ভুল হয়ে গেছে তার। যমুনা আর হাসির মাইনে দেয়ার সময় নবীনের খেয়াল ছিল না, যে টাকা তারা আগাম নিয়েছিল, কালই তা শোধ হয়ে গেছে। আজ তাদের পুরো মাইনে পাবার কথা। রাধানাথবাবুর মুখ বড় খারাপ। নবীনের ভুল ধরতে পারলে রাতে দিশি টেনে তার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে, আমার মেয়েদের ঠকাবার মতলব! এই জোচ্চর, লে আও, অভি রুপেয়া লে আও! বোতল লে আও! চলা আও! এই—আপ!

খুব সকালে আর্টিস্টদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাসিক মাইনে ঠিক হলেও প্রত্যেকের পাওনা দিনের হিসেব মতন রোজ চুকিয়ে দেয়া জুয়েল সার্কাসের নিয়ম। এ কাজ নবীনকেই করতে হয়। সে-ও অনেক সময়ের ব্যাপার। বড় সতর্ক থাকতে হয় তাকে। একটু ভুল হয়ে গেলেই মুশকিল। তারই নাম খারাপ হবে। আর্টিস্টরা তাকে বলবে চোর!

নবীনকে এখনো এক-একবার সতর্ক করে দেয় হারকু সাহেব, "কাউকে বেশি দিবি না, কম দিবি না। এক পইসা নিজে খাবি না। চোখ কান খুলা রেখে কাম করবি।"

হারকু সাহেবের কথা মতন এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার ইচ্ছায় খুব মন দিয়ে সকলের পাওনার হিসেব করে নবীন। বেশি সে কাউকে দেয় না। কমই হয়তো দেয় কখনো-কখনো। তা-ও ইচ্ছে করে নয়। থেকে থেকে একটা অদ্ভুত অবসাদ তার মন অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায়।

তখন জিব শুকনো-শুকনো ও সিগ্রেট বিস্বাদ মনে হলেও নবীন ধোঁয়া গিলে গিলে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চায়—সবকাজ ফেলে রেখে কোন ফাঁকা জায়গায় কিছু সময় একা একা একটা অসুস্থ মানুষের মতন তার চুপচাপ বসে থাকবার ইচ্ছে হয়।

জরির ওপর চাপ পড়ছিল বলে ইস্তিরির খসখস শব্দ হচ্ছিল নখের আঁচড়ের মতন। নবীনকে বসে থাকতে দেখে কাজ করতে করতেই লীলা কথা বলল, "হারকু সাহেব বেরিয়েছে বুঝি?"

"না। অন্য সার্কাস থেকে আর্টিস্ট এসেছে, তাদের সাথে আপিসে বসে কথা কইছে।"

"কারা গো?"

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিল নবীন। বাইরে তাকিয়ে বলল, "কোহিনুর সার্কাসের ঊষা আর পুষ্পরাজ—নাম জান না?"

"টেরাপিজ করে তো? জানি না?"

"শুধু ট্র্যাপিজ নাকি, আরও কত খেলা জানে মেয়েটা—"

ঊষার গুণের কথা শোনবার ধৈর্য ছিল না লীলার। ট্র্যাপিজ শেখার কোন

সুযোগ সে পায়নি বলে তার মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে এল। হাত আস্তে আস্তে চলছিল লীলার, এখন কাজেও মন ছিল না।

"দুজনে একসাথে এসেছে?"

"দুজনেই তো এল", লীলার মনের ভাব বুঝতে পেরে ঠোঁটে সিগ্রেট চেপে ধরে নবীন হাসল, "কোহিনুর সার্কাস থেকে ভেগে পড়েছে, ঊষার মাথায় সিঁদুর দেখলাম কি-না।"

"পুষ্পরাজের সাথে বিয়ে হয়েছে নাকি ওর?"

"মনে হয়। কাজের জন্যেই এখানে এসেছে।"

"হারকু সাহেব তাই বলল?"

"আমি বুঝি না?" নবীনের স্বর কিছু অসংযত, "কোহিনুরে ওরা আর থাকতে পারে নাকি? কার নজর ছিল ঊষার ওপর—সে পিছনে লাগবে না?"

নবীনের কথা লীলার ভাল লাগল না। তার কাজ হয়ে গিয়েছিল। ইস্তিরি মাটিতে নামিয়ে রাখতে রাখতে সে শুকনো গলায় বলল, "খেলা জান না, খেলার কদর বোঝ না, তাই আবোল-তাবোল যা মুখে আসে বলে ফেল। যে ভাল খেলা জানে কেউ তার পিছনে লাগতে সাহস পায়?"

লীলার কথা শুনে কিছু সময় চুপ করে থাকল নবীন। সে তার ব্যথার একটা জায়গায় হঠাৎ আঘাত করেছে। খেলা শেখবার কোন চেষ্টাই নবীন কখনো করেনি। সার্কাসের আলো বাজনা, ক্রীড়ারতা এক-একটি মেয়ের দেহের অনাবৃত অংশ বাইরে থেকে তার মনে একটা স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছিল। বারাসতের ছোট মুদির দোকানে বসে খাতা লিখতে আর মন চায়নি নবীনের। ছেলেবেলা থেকেই অনাথ। সে দ্বিধা করেনি, বারাসতের ক্যাম্প থেকেই রিং বয় হয়ে ঢুকল জুয়েল সার্কাসে।

খেলার সময় কাঠের বড় বড় স্ট্যান্ড বয়ে বয়ে আর দড়ি তার টানতে টানতে তার হাতে কড়া পড়ছিল, বাইরে থেকে দেখা স্বপ্নের জগৎও মুছে যাচ্ছিল অল্প অল্প করে। এবং হঠাৎ একদিন নবীনের মনে হল মৃত্যুর অন্ধকার ছাড়া তার সামনে আর কিছুই নেই। বড় বীভৎস, বড় ভয়ঙ্কর। অদ্ভুত একটা ভয় সাপের ঠাণ্ডা শরীরের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকল তার বুকের মধ্যে। কোন খেলা শেখবার ইচ্ছা হল না নবীনের, সে বাইরে যাবার পথ খুঁজল।

বাইরে যাবার ইচ্ছা, বেরুবার পথ নেই। শুধু ভয় নয়, একটা ঈর্ষাও নবীনকে থেকে থেকে বড় অস্থির করে তোলে। এ দু-ই অনুভূতি যে যন্ত্রণা ফেনিয়ে তোলে তার মনে, লীলার কথা তা আরও উথলে দিল বলে নবীন ঘন ঘন সিগ্রেট টানল।

সিগ্রেট নিভে গিয়েছিল নবীনের। আর একবার টানবার চেষ্টা করে সে তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বলল, "ওসব কথা রাখ। ভাল খেলা জানত না নিউ ন্যাশানেলের বীরেন আর মালা সাহা? মালিক তাদের নিশুত রাতে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেয় নি?"

কয়েক মাস আগে জুয়েল সার্কাসে কাজের জন্যে এসেছিল বীরেন আর মালা। নিউ ন্যাশানেলের মালিকের ওপর দুজনের খুব রাগ। বীরেন বলেছিল, মালিক নাকি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল মালার, সে তাকে বিয়ে করে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

জুয়েল সার্কাসের টেণ্টে তারা ছিল কয়েক দিন। বাবু তাদের চাকরি

দিতে রাজীও হয়েছিল। তখন জুয়েল সার্কাসের ক্যাম্প পড়েছিল মেটিয়াবুরুজে।

একদিন সকালবেলা সেখানে নিউ ন্যাশানেলের জেনারেল ম্যানেজার এসে উপস্থিত। বাবুর সঙ্গে দেখা করল, হারকু সাহেবের সঙ্গে কথা বলল। ব্যস, জুয়েল সার্কাসেও চাকরি হল না মালা আর বীরেনের।

তাদের নাম শুনে লীলা অপ্রসন্ন হল, বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল তার কপালে।

সে বেশ জোরে-জোরে কথা বলল, "ওদের কথা বাদ দাও। মেয়েটা বলেছে আমাকে সব। ন্যাশানেলের মালিক জামাকাপড় টাকা পয়সা আদর আহ্লাদ বেশি বেশি দেয়নি তাকে? তলে তলে পীরিত করলে মালিক ক্ষেপে যাবে না? মানুষ তো সে বটে।"

লীলার যুক্তি খণ্ডন করবার কোন চেষ্টা করল না নবীন। সে তাকে বিদ্রূপ করেই বলল, "সেই কথাই তো বলি আমি। কার মনে কী মতলব, কে কখন ক্ষেপে যায় ঠিক কী", কাশি আসছিল নবীনের, সে শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে নিল, "ঊষা আর পুষ্পরাজ তেমন পীরিত করে থাকলে কোহিনূরের মালিক খেলার কথা ভেবে মাথায় নিয়ে নাচবে তাদের?"

উত্তেজনার একটা বেগ লীলার মনে ফেনিয়ে উঠছিল। তার নবীনকে বলবার ইচ্ছে হল, তোমার মতন একটা ভীতু মানুষকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল হারকু সাহেব? বেশি মাইনে দিয়ে সে তোমাকে পুষছে না মাসের পর মাস?

কিন্তু এ সব কথা বলল না লীলা। প্র্যাকটিসে যাবার সময় নবীনের সঙ্গে তর্ক করে সে নিজেকে ক্লান্ত করে তুলতে চাইল না। ইস্তিরি করা নতুন ফ্রক আর জাঙিয়া দড়িতে মেলে দিতে দিতে বলল, "কেন, হারকু সাহেব খবর পাঠিয়ে ঊষা আর পুষ্পরাজকে ডাকতে পারে না?"

"ডাকলে আসবে কেন, কোহিনূর ছেড়ে জুয়েলে কেউ সাধ করে আসে?"

"বেশি মাইনে পেলে আসে না?" লীলা নবীনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "রাধানাথবাবু যমুনা আর হাসিকে নিয়ে ভারত সার্কাস ছেড়ে আসেনি?"

লীলা আস্তে, ঠাণ্ডা স্বরে কথা বললেও নবীন মাটিতে ছেঁড়া চটি ঘষে উত্তেজনা প্রকাশ করল এবং লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝগড়ার মতন করে বলল, "পপুলার তোমাকে বেশি টাকা দিতে চায়নি? পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে বাকি রেখেছিল, গেছিলে সেখানে?"

"না", নবীনের কথার ঝাঁজ লীলার মনে লাগল বলে তার মুখ বড় কঠিন হয়ে উঠল। রবারের একটা চুপসে যাওয়া পুতুল বাতাস পেলে হঠাৎ যেমন শক্ত হয়ে ওঠে তেমন একটা ভঙ্গি করে লীলা বলল, "পায়ে ধরে সাধলেও আমি যেতে পারি না। আমার কথা ভিন্ন।"

উত্তেজনা দমন করতে না পেরে পুরনো কথা তুলে লীলাকে চুপ করিয়ে দেবার ইচ্ছে হলেও নবীন জানত অনেক বেশি মাইনে পেলেও জুয়েল সার্কাস ছেড়ে লীলা কোথাও যাবে না। হারকু সাহেব যতদিন থাকবে এখানে, সেও থাকবে। হারকু সাহেব অন্য কোথাও গেলে সেও যাবে।

কিন্তু এসব নিয়ে লীলার সঙ্গে নতুন করে আর ঝগড়া করল না নবীন। তার কথায় যে উষ্মা ছিল তা লীলার মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে এখন সে খুব নরম হয়ে শুধু জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"জন্ম দেওয়ার সময় মা মরেছে। মায়ের মুখ দেখিনি। খেতে দিতে পারল না বাপ। চার-পাঁচ বছর আগে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জোর করে আমাকে রেখে গেল জুয়েল সার্কাসে" থেমে থেমে কথা বলছিল লীলা, থেকে থেকে উদাস হয়ে যাচ্ছিল, "বাপও কলেরায় মরল। সেই তখন থেকে কোম্পানীর নুন খেয়েছি, খেলা শিখেছি। এখন বেশি পয়সার লোভে অন্য কোম্পানীতে গেলে অধর্ম হবে না?"

বাইরে রোদ খেললেও হু হু শীতের হাওয়া দিচ্ছিল। গায়ের চাদরটা টেনে টেনে ঠিক করে নিল নবীন। মুখ তুলে দড়িতে টাঙানো লীলার নতুন পোশাক দেখতে দেখতে বলল, "ধর্ম-অধর্মের কথা তোমার মনে হয়, বাবু ভাববে—হারকু সাহেব ভাববে?"

"হুঁ, ভাববে।"

"দু দিন বাদে ট্র্যাপিজ চালু হবে, কোম্পানী বড় হবে—তখন ওরা বেশি মাইনে দেবে তোমাকে?"

"বেশিই তো দেয়", প্র্যাকটিসে যাবার জন্যে লীলা অস্থির হয়ে উঠেছিল। খাটে বসে ট্রাঙ্কের ওপর সে ছোট আয়না রাখল, চিরুনির একটা টুকরো খুব তাড়াতাড়ি মাথায় চালাতে চালাতে আবার বলল, "একটা খেলা জান না তুমি।"

প্রতিবাদের মতন মাথা ঝাঁকিয়ে নবীন বলে উঠল, "আমি সার্কাসে খেলতে আসিনি। সারাদিন গাধার মতন খেটে মুখে রক্ত উঠে যায় না আমার!"

লীলা হাসল, "খেলা জানলে এত রাগ হত না, মনটা তাজা থাকত—"

"খেলা জানলে কী হত?" যে ঝাঁজ ফেনিয়ে উঠছিল নবীনের মনে তা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না বলে সে ইস্তিরি তুলে নিয়ে দুম দুম করে ছেঁড়া চটির পেরেক ঠুকতে লাগল, "যেদিন খেলা পড়ে আসবে তোমার, সেদিন দূর করে তাড়িয়ে দেবে না তোমাকে?"

সেদিনের কথা এখন লীলার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। নবীন ভীতু মানুষ তাই এ সব ভাবে!

মোটর বাইকের ভট ভট শব্দ শুনল লীলা। নতুন একটা ছোকরাকে মরণ খাঁচায় মোটর বাইক চালাতে শেখাচ্ছে নোয়েল খান। লীলা তার কথা ভাবল। ছোকরার সাহস আছে। খুব তাড়াতাড়ি মরণ খাঁচার খেলা শিখে নিতে পারবে।

মোটর বাইকের শব্দ লীলার মনে একটা আবেগ সঞ্চার করছিল। তা হলেও সে কিছু বিমর্ষ হয়ে নবীনের কথার উত্তর দিল, "খেলা পড়ে গেলে বাঁচব না, তার আগে মরেই যাব।"

"যমের দুয়ারে পা বাড়িয়ে রাখলে মরতে কতক্ষণ", ইস্তিরি খাটের তলায় ঠেলে দিল নবীন, বুড়ো আঙুল গালে ঘষতে ঘষতে বলল, "এখানে বেঁচে থাকা ভাগ্যের কথা! জানোয়ার ছাড়া কেউ থাকতে পারে নাকি সার্কাসের দলে!"

লীলা বিরক্ত ও বিমর্ষ হল। চিরুনির টুকরো মাথায় গুঁজে ট্রাঙ্কের ওপর আয়না সোজা করে বসিয়ে মুখ দেখতে দেখতে বলল, "জানোয়ারকে তুচ্ছ কর না। মানুষের থেকে তাদের দাম কত বেশি না? আমার বাপ ক' টাকায় বেচেছিল আমাকে মালিকের কাছে জান? মোটে পঞ্চাশ টাকায়—"

"তা বলে জনম ভোর থাকতে হবে সার্কাসে?" লীলাকে বাধা দিয়ে খাঁচায় বন্ধ একটা জানোয়ারের মতনই আস্ফালন করে উঠল নবীন।

"হবেই তো।"

"হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে—তা-ও থাকতে হবে?"

লীলা আয়না চিরুনি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। ঝপ ঝপ করে তাঁবুর দুদিকের পর্দা নামিয়ে দিল। নবীনের পিছনে দাঁড়িয়ে শাড়ি সরিয়ে-সরিয়ে প্র্যাকটিসের পোশাক পরে নিতে নিতে বলল, "কার হাত-পা ভাঙবে, আমার? জীবনে না।"

এখন তাঁবু অল্প অল্প অন্ধকার। নবীনের কানের কাছে মশা এসে বসল। তা মারবার ছল করে সে হাতের শব্দ করল, "টুনি মাসির মাজা ভেঙে যায়নি?"

"টুনি মাসির কথা থাক। খেলায় মন ছিল নাকি ওর? নম্বর করবার সময় পীরিতের বাবুর দিকে তাকিয়ে মস্করা করলে মাজা ভাঙবে না তো কি হাত-তালির আওয়াজে কান ফাটবে?"

অনেক আগে কোন সার্কাসে খেলার সময় টুনি মাসি তার প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে পা ফসকে ছিল এবং সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল, সে গল্প এখানকার সকলেই শুনেছে।

নবীন টুনি মাসির কথা লীলাকে এখন বলতে চায়নি, হঠাৎ বলল। কেননা, লীলা তাকে স্পষ্ট করেই অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছে যে শুধু খেলার সময় নয়, অন্য কোন সময়ও তার দিকে তাকিয়ে সে খেলার কথা ভুলে যাবে না।

যত সময় জেগে থাকবে লীলা তত সময় তার দেহ শুধু তৈরি হবে খেলার নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করবার জন্যে, মন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে ঝমঝম বৃষ্টির মতন হাততালি পাবার আশায়। এবং রাতে স্বপ্নের ভিতরেও লীলা নবীনকে ধরবে না। সে অনুভব করবে চামড়া মোড়া কাঠের বড় বল, রঙীন ছাতা, এক চাকা কিংবা দু-চাকার সাইকেল।

সার্কাসের দড়ি আর তার, মানুষ আর জানোয়ার, মৃত্যুর মতন কঠোর জীবন লীলাকে পাকে পাকে বেঁধে রাখবে যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন। জাগার বেলায় যেমন, স্বপ্নের ভিতরেও তেমন।

অন্ধকার তাঁবুর ভিতরে হিমের মতন অবসাদ নবীনের ধমনীকে নিস্তেজ করে তুলল। লীলার দেরি হয়ে যাচ্ছিল, তাঁবুর পর্দা তুলে দেওয়ার কথা তার মনে থাকল না। সে প্র্যাকটিস করবার জন্যে বড় তাঁবুর দিকে ছুটে গেল।

লীলা চলে যাবার পরেও পর্দা তোলবার উৎসাহ হল না নবীনের। তার জিবের তলায় থুতু জমছে। তেতো তেতো স্বাদ। গলা জ্বলে জ্বলে বমির একটা বেগ আসছে। নবীনের অসুখের মতন মনে হচ্ছিল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বালতির উনুন তুলে নিয়ে যাচ্ছে টুনি মাসি। নবীন তার গলার কর্কশ স্বর শুনল, "ইস, জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে উনুনটা। দরকারের সময় নিয়ে আসে, খেয়াল করে ফেরত দেয় না—"

হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে থাকল নবীন। তার এখন নিজেকে ব্যাঙের মতন মনে হচ্ছিল।

নীল একটা পোশাক পরে শরীর ভেঙে ব্যাঙের মতন হয়ে খেলা দেখাত দুলাল। থপ থপ করে এদিক-ওদিক যেত, বড় টেবিলে লাফিয়ে উঠত-নামত। সবুজ একটা ব্যাঙ বলেই মনে হত তাকে।

বর্ধমানের ক্যাম্পে হারকু সাহেব সার্কাস থেকে বের করে দিল দুলালকে। যমুনা তার নামে নালিশ করেছিল। সে নাকি যমুনার হাত টেনে বলেছিল, রাতে আসবি আমার রাউটিতে?

মারতে মারতে দুলালকে গেটের কাছে নিয়ে গিয়েছিল হারকু সাহেব, নিকালো শালা!

দুলাল মার খেতে খেতে হাত তুলে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল, "রাধানাথবাবু আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। আমি চাইতে গেছিলাম। ওরা মিছে কথা বলছে, বদনাম দিচ্ছে—"

হারকু সাহেব দুলালের কোন কথা শোনেনি। একটা রিং বয়কে ডেকে তার সব জিনিসপত্র তাঁবু থেকে বের করে দিতে বলেছিল।

সেদিন হরতাল। রাস্তায় কোন লোক ছিল না। ট্রেন চলাচলও বন্ধ। তাহলেও খুব আস্তে আস্তে হেঁটে স্টেশনের দিকেই গিয়েছিল দুলাল। একবারও পিছনে তাকায়নি।

অন্ধকারে ব্যাঙের মতন জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে থাকতে নবীন দুলালের কথা ভাবছিল। একটা মশা তার ঘাড়ের রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছে।

এখন হাত উঠল না নবীনের।

॥ তিন ॥

ঊষার মুখ বড় মিষ্টি। কতকটা দক্ষিণ ভারতের মেয়ের মতন। এখন তার হাসবার কথা নয়, বরফের চাকের মতন মনে অনেক ভাবনার ভার—তাহলেও ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে সে হারকু সাহেবের সামনে বসেছিল। তার বাঁ দিকে পুষ্পরাজ।

সিল্কের পাতলা একটা শাড়ি পরেছে ঊষা, তার নিচে গরম ব্লাউজ। তার সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। ভিড়ের মধ্যে মা যেমন বাচ্চা ছেলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে থাকে, সে তেমন করে তার সবুজ ব্যাগ ধরে রেখেছিল।

পুষ্পরাজের মুখ বড় গম্ভীর। লাল-লাল চোখ। শক্ত পেশী। ট্র্যাপিজ করে করে হাতে কড়া পড়েছে। অভ্যাসবশত থেকে থেকে হাত মুঠো করেই আবার খুলে দিচ্ছিল পুষ্পরাজ।

হারকু সাহেব এখন শান্ত এবং স্থির। ঊষা আর পুষ্পরাজের নাম শুনেই সে বুঝে নিয়েছিল যে, তারা এখানে বেড়াতে আসেনি, চাকরির জন্যেই এসেছে। এখন তাদের চেহারা দেখে সে আরও বুঝল, সময় বড় খারাপ দুজনের। এমন অবস্থায় সার্কাসের মানুষের কঠোর মনও বড় নরম হয়ে থাকে। হারকু সাহেবও তার মুখ খুব কোমল করে তোলবার চেষ্টা করল, যেন বিপদে পড়ে যারা তার কাছে হঠাৎ এসে পড়েছে, তাদের সাহায্য করবার জন্যে সে বড় উৎসুক।

চা আনবার কথা আগেই বলে দিয়েছিল হারকু সাহেব। এখন ঊষার দিকে তাকিয়ে সে হাসল। পরে সিগ্রেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে পুষ্পরাজকে বলল, "সিগ্রেট চালান।"

কাকের ঠোঁটের মতন পুষ্পরাজের আঙুল পড়ল হারকু সাহেবের সিগ্রেটের ওপর। তার গলা শুকিয়ে আসছিল, ভারী স্বরে থেমে থেমে সে তার নিজস্ব হিন্দিতে বলল, "ধর্মতলা স্ট্রীটমে যিসকো রেডিওকা দোকান হ্যায়, মেরে দোস্ত মিস্টার সুন্দরম—"

"হাঁ হাঁ, সুন্দরম সাহেব আমারও বন্ধু আছে," ঊষার দিকে তাকিয়ে হারকু

সাহেব বাংলা বলবার ইচ্ছা দমন করতে পারল না, "বিশ-বাইশ সাল আগে সে সার্কাসে খেলল। সার্কাসের লোকের উপর ওনার বড় দরদ।"

"হামলোগ উনকো ঘরসে আতা হ্যায়।"

সব বুঝলেও পুষ্পরাজের চাকরি যাওয়ার কারণ তার মুখ থেকেই শোনবার কৌতূহল জাগল হারকু সাহেবের। সে জিজ্ঞেস করল, "কোহিনূর এখন কোথায় খেলছে বললেন?"

ইতস্তত করল পুষ্পরাজ। সে এখনো তার অহঙ্কার ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল। উষার সঙ্গে জুয়েল সার্কাসের তাঁবুতে হারকু সাহেবের সামনে বসে থাকলেও হঠাৎ সে বলতে পারল না যে, তার চাকরি গেছে। পুষ্পরাজের মতন আর্টিস্ট না ডাকতেই এখানে কাজের জন্যে এসেছে তা ভাবতে ভাবতে তার মুখ আরও রুক্ষ হয়ে উঠল।

পুষ্পরাজকে চুপ করে থাকতে দেখে হারকু সাহেব তার মনের ভাব বুঝতে পেরে আবার হাসল। এবার তাকে সহজ কথাটা তাড়াতাড়ি বলবার সুযোগ দেয়ার জন্যে সে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "সে সার্কাসের সাথে গোলমাল হল আপনার?"

"হাঁ হল", দু-হাত মুঠো করল পুষ্পরাজ, যেখানে কড়া পড়েছিল সেখানে আঙুল ঘষল। ঝাঁজের একটা তোড় বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল তার গলা ঠেলে। কিন্তু হঠাৎ এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ল পুষ্পরাজ যে তার নিজেকে অপ্রকৃতিস্থের মতন মনে হল। কিছু সময় সে কথা বলতে পারল না।

হারকু সাহেব আর একবার উষার দিকে দেখল। তার মুখ এখন কিছু নিষ্প্রভ। মনে মনে সে অস্বস্তি অনুভব করছিল। কোহিনূর সার্কাস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যদিও মালিকের মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারেনি পুষ্পরাজ, বলতে গেলে মারামারি হত, অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠত। কেননা পুষ্পরাজ বড় দাম্ভিক, তার হয়ে মালিকের সঙ্গে তর্ক করবার একটিও মানুষ ছিল না কোহিনূর সার্কাসে।

কিন্তু যেসব কথা উষাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় পুষ্পরাজ কোহিনূর সার্কাসের মালিক আর তার দলের লোকদের শোনাতে চেয়েছিল, উষার ভয় হল, এখন সে হয়তো হারকু সাহেবকে সে-সব বলবে।

অন্য সার্কাসের কথা এখন না তুললেই ভাল হয়। উষা ভাবল, আগে চাকরি হোক, অন্তরঙ্গতা হোক, তখন আস্তে আস্তে হারকু সাহেবকে সব কথা বলুক পুষ্পরাজ। চাকরি হওয়ার আগে সব কিছু স্পষ্ট করে বললে কে কী মিথ্যা কথা লাগাবে ঠিক নেই। এখানে চাকরি না হলে বড় অসুবিধা হবে তাদের।

উষাকে পুষ্পরাজ যেমন বুঝিয়েছে, জুয়েল সার্কাস ছাড়া আর কোথাও যাওয়া চলে না তার। জেমিনির সঙ্গে তার ঝগড়া, কমলা থেকেও সে বেরিয়ে এসেছে, রেমনের সঙ্গেও গোলমাল করেছে। ভারত আর ইন্টারন্যাশনাল তাকে ভয় করে, চাকরি দিতে সাহস করবে না। এ-সব ছাড়া আর যত সার্কাস আছে, সেগুলো বড় ছোট। তাদের মাইনেতে এদের চলবে না।

কোহিনূরের চেয়ে জুয়েল সার্কাসও অনেক ছোট। ট্র্যাপিজ দেখাতে এখন এরা রাজি হবে কিনা, তাও জানে না পুষ্পরাজ। ট্র্যাপিজ ছাড়া আর কোন খেলা তার নেই। আজ সকালে হারকু সাহেবের সঙ্গে সে খোলাখুলি কথা বলতে এসেছে। ট্র্যাপিজ পরে শুরু হলেও যদি আগে উষার চাকরি হয়—তাই

তাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে পুষ্পরাজ।

হারকু সাহেব পুষ্পরাজের মেজাজ চড়া দেখে মনে মনে খুশি হল এবং উত্তেজনার ঝোঁকে তার মুখ থেকে আরও কিছু অসংলগ্ন কথা শোনবার জন্যে বলল, "কোহিনুরের মালিকের বেশি দেমাক, অনেক আর্টিস্টের সাথে গোলমাল বাধায়—"

"বহুৎ হারামি। কোই আর্টিস্ট হুঁয়া যাস্তি দিন খেলনে নেহি সেকেগা—" উষার দিকে আঙুল দেখিয়ে পুষ্পরাজ বলল, "ই আওরাৎ হ্যায় না, ওই লিয়ে হুঁয়া থা চুপচাপ—"

উষার সঙ্গে প্রথম কথা বলবার সুযোগ পেয়ে হারকু সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোহিনুরে আপনি কতদিন খেললেন?"

"আমি আর কোন সার্কাসে খেলি নি, কোহিনুরেই ছিলাম", উষা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মনে মনে হিসেব করে বলল, "তা প্রায় আট-দশ বছর হবে।"

"সেখানে তো বহুৎ দিন হয়ে গেল আপনার।"

উষা খুব মিষ্টি করে হাসল, "হ্যাঁ।"

আগে কখনো মনে হয়নি, আজ হারকু সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার সময় উষার প্রথম মনে হল সার্কাসের তাঁবুতে তার জীবনের অনেক বছর কেটে গেছে। পুষ্পরাজ কোহিনুর সার্কাস থেকে তাকে যদি টেনে না নিয়ে আসত তাহলে এত সহজে সময়ের হিসেব করতে পারত না উষা।

জুয়েল সার্কাসের তাঁবুতে বসে উষার মন আস্তে আস্তে ভিজে উঠছিল। হঠাৎ এত কোমল ও ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা সার্কাসের মানুষের স্বভাব নয়। এক জায়গায় বেশিদিন সাজিয়ে-গুছিয়ে বসবাস করবার সুযোগ তাদের জীবনে নেই। ট্রাকে ঠাসাঠাসি করে তারা যাযাবরের মতন যেমন এখান থেকে সেখানে যায়, তেমন এক সার্কাস ছেড়ে আর এক সার্কাসে চাকরি নেয়া তাদের জীবনের খুব সাধারণ ঘটনা।

কোহিনুর সার্কাসের দলের সঙ্গে কোন কোন জায়গায় উষা গেছে, তার মনে নেই। তাঁবুর বাইরে ঘুরে বেড়াবার সময় তার হয়নি, ইচ্ছেও করেনি। কিছুদিন খেলবার পর যখন ভিড় কমে এসেছে তখন মালিক আর ম্যানেজারদের মতন তারও মেজাজ খারাপ হয়েছে—নতুন কোথাও যাবার জন্যে সে-ও অস্থির হয়েছে। এবং যে জায়গা ছেড়ে এসেছে তার কথা পরে আর কখনো উষার মনে পড়েনি।

হারকু সাহেব উষাকে আবার জিজ্ঞেস করল, "কোহিনুরে আপনি কয়টা নম্বর করতেন?"

উষা তার খেলার হিসেব করে হারকু সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগেই পুষ্পরাজ বলল, "ট্র্যাপিজ, ডেন্টেল অ্যাক্ট, রাইডিং, তার, সাইকেল আউর বেম্বু ব্যালান্স ছঠো নম্বর থা উষাকা।"

"বাঃ, বহুৎ আচ্ছা", হারকু সাহেবের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পরেই তার মনে হল, এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা ঠিক নয়। পুষ্পরাজ অতি চতুর। হারকু সাহেব উৎসাহ প্রকাশ করলেই অনেক মাইনে চেয়ে বসবে।

তাদের কিছু দমিয়ে দেবার জন্যে অল্প পরে হারকু সাহেব হেসে বলল, "জুয়েল সার্কাস বহুৎ ছোটা। রাইডিং নাই, ট্র্যাপিজ নাই—"

পুষ্পরাজের মুখে করুণ একটা ছায়া নামল। যদিও সে এমন জগতের

মানুষ যেখানে নিরাপত্তার কোন মানে নেই তাহলেও এখন ঊষার পাশে বসে সে একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছিল। টাকা-পয়সা তার কাছে কিছু নেই। কাজ পেতে দেরি হলে দিন চলবে না। ধর্মতলা স্ট্রীটে সুন্দরমের বাড়িতে দু'-এক দিনের বেশি আর থাকা যাবে না। জায়গা বড় কম।

পুষ্পরাজ ভীতুর মতন আস্তে বলল, "সুন্দরম বোলা আপ ট্র্যাপিজ শুরু করনেকা মতলব কিয়া—"

"জরুর! ট্র্যাপিজ বাদ দিয়ে সার্কাস বড় হতে পারে কি, বলেন?"

চা এসে গিয়েছিল। হারকু সাহেব নিজেই ঊষার হাতে কাপ তুলে দিতে দিতে পুষ্পরাজকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ট্রুপে লোক কত ছিল?"

পুষ্পরাজ বলল, "একঠো ক্লাউন থা। আউর তিন আদমী। সব লিয়ে হামলোগ ছ আর্টিস্ট থা। লেকিন হাম বাহারসে ট্রুপ লেকে কোহিনুরমে নেহি গিয়া। কোম্পানীকা সাথ উলগকো কনট্রাক্ট হ্যায়। হাম সবকো ট্রেনিং দিয়া। হামরা সাথ ভি কোম্পানীকা কনট্রাক্ট থা—"

"তার মেয়াদ কবে শেষ হল?"

"শেষ নেই হুয়া—"

"তবে?" এত পরে হারকু সাহেব হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকল পুষ্পরাজের দিকে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে একটা সুখকর স্বপ্নও গড়ে নিতে শুরু করেছিল।

ঊষা এসেছে, পুষ্পরাজ এসেছে। আর একটু পরেই টালিগঞ্জে পরের ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে ফিরে আসবে শিবনাথ। নতুন ক্যাম্প, নতুন খেলা। ট্র্যাপিজের নম্বর হবে জুয়েল সার্কাসে। এক-একটি ক্যাম্প ছেড়ে ছেড়ে যাবে হারকু সাহেব, নতুন-নতুন নম্বর বাড়িয়ে যাবে।

কিন্তু পুষ্পরাজের চুক্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি। কবে শেষ হবে, হারকু সাহেব বুঝল না। তার স্বপ্ন হারিয়ে গেল বলে সে ক্লান্ত হাতে চায়ের কাপ কাছে টেনে ঠোঁটে একটা উষ্ণ স্বাদ অনুভব করতে থাকল।

পুষ্পরাজ শব্দ করে চা খাচ্ছিল। কাপ হাতে থাকায় হারকু সাহেবের সামনে তার ঠিক মতন উত্তেজনা প্রকাশ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখন ঝম করে টেবিলের ওপর কাপ নামিয়ে রেখে মুখ যথাসম্ভব কঠিন করে তুলল পুষ্পরাজ, হাত মুঠো করে বলল, "হাম উসকো নামমে কেস করেগা—জেলমে ভেজেগা শালাকো। কনট্রাক্ট পাক্কা, রুপয়া ভি বহুৎ মিলেগা। তবভি হামারা খেলনে নেই দিয়া। হাম কেয়া, বুদ্ধু? ল নেই জানতা হাম?"

"কী হল?"

আবার আশার সঞ্চার হল হারকু সাহেবের মনে। তার স্বর সমবেদনা প্রকাশ করার মতন। সে একবার এদিক-ওদিক দেখল। কাছাকাছি কেউ নেই। এখুনি ঊষা আর পুষ্পরাজকে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে চুক্তি করে নিতে হবে। টাইপ করা কনট্রাক্ট ফর্মের কথা ভাবল হারকু সাহেব।

"সার্কাসমে খেলেগা তো কেয়া? হাম সাদি করনে নেই সেকেগা?" পুষ্পরাজ মুখ বিকৃত করে তার নিজের কথা বলবার চেষ্টা করল, "ঊষা থা কুন্দনলালকা ট্রুপমে, হাম উসকো ট্র্যাপিজ শিখলানে শুরু কিয়া—"

পুষ্পরাজের মেজাজ কিছু নরম করবার জন্যে হেসে উঠল হারকু সাহেব এবং তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে নিতে চাইল, "আপনি এনাকে সাধি করে নিলেন—এই তো বাত?"

"হাঁ। সাদি নেই করনেসে ইসকা জান একদম খতম হো যাতা।"

হারকু সাহেব কথা বলল না। উষার মুখ মলিন হয়ে এসেছে, তাকে একবার দেখে নিয়ে সে পুষ্পরাজের দিকে ফিরে তাকাল। তার চোখে কৌতূহল উপচে উঠছে।

পুষ্পরাজ বলতে লাগল তার নিজের অনুভূতির কথা। তার স্বর আক্রোশের তাপে কেটে কেটে যাচ্ছিল। উষার জন্যে যে সমবেদনা তাকে কোহিনূর সার্কাস থেকে বিতাড়িত করেছে তা হারকু সাহেবকে বলবার সময় তার মনের কোমল অনুভূতির চেয়ে অস্বাভাবিক দাহর প্রকাশ অনেক বেশি হল।

"কুন্দনলাল বহুৎ বদমাশ। উষাকো খারাপ-খারাপ বাত শুনাতাথা—বহুৎ মেহনতকা কামভি কারাতা থা। জুত্তি দেকে মারতা। ইসকা বহুৎ রুপায়া ভি মার দিয়া শালা।"

হারকু সাহেব উষাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার মা-বাপ নাই?"

উষা কথা বলল না। মাথা নেড়ে জানাল, আছে।

কিন্তু মা-বাবার কথা হারকু সাহেব কেন তাকে জিজ্ঞেস করল সে বুঝল না। যে বাপ-মা মেয়েকে অভাবের জন্যে সার্কাসে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তাদের ক্ষমতা কতটুকু! মাসে মাসে তারা শুধু একবারই আসে মেয়ের কাছে, তার মাইনের ভাগ নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চালায়।

শুধু মা-বাবা নয়, ভাইবোনও আছে উষার। তার দাদা ছোট একটা কারখানায় কাজ করে। উষার দুই দিদি। দু-জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দি'র বর লরীর ড্রাইভার। আর এক জামাইবাবু ট্রাম কণ্ডাক্টার। লোকটি খুব খারাপ। ছোড়দি'কে মার ধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে সে আবার ফিরে এসেছে তার মা-বাবার কাছে।

উষার ছোট দু' বোন। তাদেরও মা-বাবা সার্কাসে রেখে যেতে চায়। দিনে দিনে অভাব বাড়ছে। সংসারে উষার ছোট দু' বোন বেবি আর ডলির কোহিনূরেই আসবার কথা ছিল, কুন্দনলালের সঙ্গে কথা বলে গিয়েছিল তার মা। তারই ট্রুপে থাকত তারা, উষা তাদের দেখাশোনা করতে পারত।

কিন্তু বেবি আর ডলি কোহিনূরে আসবার আগেই পুষ্পরাজ সব গোলমাল করে দিল। উষাকে টেনে বের করে আনল কুন্দনলালের সংসার থেকে।

জুয়েল সার্কাসের তাঁবুতে বসে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে উষার মন ভেঙে পড়ছিল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে একটা সার্কাস এত ছোট হতে পারে। ছোট তাঁবু, লোকজন বড় কম। হারকু সাহেবের চেহারাও বড় অদ্ভুত, কোহিনূর সার্কাসের একটা সাধারণ রিং বয়ের মতন।

এসব কথা মনে হওয়ার পর-পরই উষা নিজেকে শাসন করল। যে-জায়গা ছেড়ে নিজের ইচ্ছায় সে চলে এসেছে এখন সেখানকার কথা ভেবে মন খারাপ করবার কোন মানে নেই। পুষ্পরাজ যেখানে নিয়ে যাবে, তাকে সেখানেই যেতে হবে—সে যা বলবে এখন তা-ই করতে হবে।

আরও মনে হল উষার, আজ সে যেমন একটা নতুন জায়গায় মানিয়ে নেয়ার কথা ভাবতে পারছে—অল্প বয়সে কোহিনূর সার্কাসে প্রথম এসে তেমন করে ভাববার ক্ষমতাও ছিল না তার।

মা-বাবা ভাইবোনের কাছ থেকে ঊষা চলে এসেছিল কোহিনূর সার্কাসে শুধু দু-বেলা ঠিক মতন খাবার আশায়। পূর্ববঙ্গে তার বাবার জমি ছিল, ঘর ছিল, কিছু টাকাপয়সাও ছিল। রাতারাতি হঠাৎ একদিন সব হুড়মুড় করে ধসে গেল। কলকাতায় এল ওরা ভিখিরির মতন। খাওয়া জোটে না, থাকবার জায়গাও নেই।

কোহিনূর সার্কাসে তাঁবুর নিচে আশ্রয় পেল ঊষা। মার খেতে-খেতে খেলা শিখল, বড় হল। যতদিন কুন্দনলালের স্ত্রী বেঁচে ছিল ততদিন বয়সের ভয় ছিল না ঊষার। মালিক তাকে আশ্বাস দিয়েছিল সময় মতন একটা চালাক-চতুর ছোকরার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবে। যদিও মালিক তখন তার বুকে পিঠে হাত দিত, রাতে ডাকাডাকিও করত।

কুন্দনলালের স্ত্রী মারা যেতে ঊষাও প্রথম প্রথম ভেবেছিল এবার সে তাকেই বিয়ে করবে। অনেক ছেলেমেয়ে তার। ঊষাকে বাধ্য হয়েই তাদের দেখাশোনা করতে হত। কুন্দনলালের পরিবারের সঙ্গে ছোট বয়স থেকে থাকতে থাকতে ঊষাও ধরে নিয়েছিল যে সে তাদেরই একজন। এবং সুধাদি'র মৃত্যুর পর তার এই বোধ আরও ঘন হয়ে উঠল।

পুষ্পরাজ কোহিনূর সার্কাসে এল অনেক পরে—এই তো সেদিন। পাকা খেলোয়াড়। বড় বড় সার্কাসে খেলে এসেছে। সার্কাসের সব মানুষই তাকে চেনে। কোহিনূরেও তার খুব খাতির। কুন্দনলাল, জেনারেল ম্যানেজার গোবর্ধনবাবু এবং মালিক নিজেও তাকে বেশ সমীহ করে চলে।

কম কথা বলে পুষ্পরাজ, নিজের তাঁবুতে একা-একা পড়ে থাকে চুপচাপ। কুন্দনলালই প্রথম তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে, তাকে নিজের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যায়, বোতল-বোতল মদ খাওয়ায়। ঊষাকে ট্র্যাপিজ শেখাবার কথাটা সে-ই বলে পুষ্পরাজকে।

ঊষাকে আগেই লক্ষ করেছিল পুষ্পরাজ। কুন্দনলালের রাউটিতে তাকে দেখতে দেখতে একটা করুণাও অনুভব করেছিল। প্র্যাকটিসের পরিশ্রম তো তার আছেই; তা ছাড়া কুন্দনলালের বাচ্চাদের দেখাশোনা করা, রান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা— এসব কাজও ছিল ঊষার।

প্রথম থেকেই কুন্দনলালকে ভাল লাগেনি পুষ্পরাজের। ঊষা কেন তার অত্যাচার সহ্য করে তা-ও তার কাছে একটা রহস্য হয়েই ছিল। যে মেয়ে বড় হয়েছে, অনেক নম্বর করে ভাল মাইনে পাচ্ছে সে কেন মুখ বুজে চুপচাপ কুন্দনলালের তাড়া খায়, একটু এদিক-ওদিক হলে তার কাছে পড়ে-পড়ে মার খায়!

কোহিনূর সার্কাসেই ঊষাকে ট্রাপিজ শেখাবার সময় অনেক উঁচুতে কাঠের একটা তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে পুষ্পরাজ হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, কুন্দনলালের সঙ্গে তোমার ভালবাসা আছে? সাধি করবে?

প্রশ্ন শুনে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল ঊষা। কেউ শুনল কি-না কে জানে। নিচে নেট ধরে রিং বয়রা দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পরাজের পা ঠেকছে তার পায়ে। সে ট্র্যাপিজের দড়ি খুব জোরে জোরে নাড়াচ্ছে। একটা শব্দ উঠছে। কাঠের প্ল্যাটফর্ম থরথর করছে।

দূরে অন্য ট্র্যাপিজে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ন। সে এদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ডাইভ দেয়ার আগে বেশ জোরে পুষ্পরাজ আবার জিজ্ঞেস করল, কুন্দন তোমার পেয়ারের লোক?

না, চাপা স্বর ঊষার। কথা বলবার সময় তার গলা ধরে এসেছিল, কেউ না।

তবে? ও তোমাকে বকে মারে জ্বালিয়ে লাগায়, ধরম নাশ করে—তুমি চুপ থাক কেন?

কী করব!

হুঃ, পুষ্পরাজের মুখ বড় কঠিন হয়ে উঠেছিল। এবং যেকথা একটু আগে তাকে জিজ্ঞেস করল হারকু সাহেব সেকথা সে-ও সেদিন জানতে চেয়েছিল, তোমার বাপ-মা নেই?

বাপ-মা কী করবে?

আর স্থির থাকতে পারেনি পুষ্পরাজ। মুখ বিকৃত করে বলে উঠেছিল, শালার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে, মালিকের কাছে সব ফাঁস করে দেবে—তোমাকে বের করে নিয়ে যাবে—

আমার বাপ-মা বড় গরিব, পুষ্পরাজ যেমন ভাবছিল তেমন কথা ভাববার সাধ্য ছিল না ঊষার, এসব তার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল।

গরিব তো কী, পুষ্পরাজ যেন ঊষাকে দুরূহ ট্র্যাপিজের কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছে—এমন ভঙ্গি করে সে তার মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলছিল, তোমার জান খতম হয়ে যাবে আর ও শালা মজা লুটবে? আমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে সব বলব।

ট্র্যাপিজের মাস্টার পুষ্পরাজ এমন সব কথা শুনিয়ে-শুনিয়ে ঊষার মন অল্প-অল্প করে একেবারে অন্য রকম করে দেয়। এসব কথা নতুন, বড় মধুর।

ঊষার ভয় ভাঙতে শুরু হয়, আর পুষ্পরাজকেও সে দেখে ভিন্ন চোখে, সে-দৃষ্টির সাধ আগে কখনো পায়নি ঊষা! তা না হলে রাত দুপুরে লুকিয়ে-লুকিয়ে পুষ্পরাজের অন্ধকার তাঁবুতে সে কেন যাবে তার কথা মতন!

প্রত্যেকের অলক্ষ্যে গভীর রাতে অন্য তাঁবুতে ভিন্ন দেশের এক অল্প চেনা মানুষের সঙ্গে ঊষার সম্পর্ক বড় নিবিড় হয়ে উঠেছিল। পুষ্পরাজের দাম আছে, জোর আছে। সে নতুন খেলা শিখিয়েছে ঊষাকে, তার নম্বর বাড়িয়েছে—তার জীবনে একটা নতুন স্বাদও এনে দিয়েছে। তার কাছে আসবে না কেন ঊষা!

কিন্তু তাহলেও পুষ্পরাজের দেহের মধ্যে নিজের শরীর কুঁকড়ে অনেক ছোট করে তুললেও কুন্দনলালের তাঁবু থেকে মাঝে মাঝে হাওয়া ঠেলে একটা ভয় ছুটে এসে ঊষার রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিত। তার মনে হত হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় কুন্দনলালের আর নেশার ঘোরে ডেকে ডেকে হাতড়ে হাতড়ে সে ঊষাকে না পায়, সে বাইরে গেছে মনে করে কিছু সময় অপেক্ষা করে, অধীর হয়—এবং পরে সন্দেহের বশে যদি রাউটির বাইরে বার হয় কুন্দনলাল আর তাকে দেখতে পায় পুষ্পরাজের বুকের মধ্যে—তাহলে কী হবে?

সেই সময় একদিন তার ভয়ের কথা খুব চাপা স্বরে ঊষা বলেছিল পুষ্পরাজকে, তোমার সাথে আমার ভালবাসার কথা টের পেলে কুন্দনলাল পাগলা হয়ে যাবে—আমাকে বেঁধে মারবে—

ওর কথা ছাড়, আমিও মারব শালাকে। আমি তোমাকে সাদি করব।

বিয়ের কথা শুনে মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল ঊষার, পুষ্পরাজের উষ্ণ নিশ্বাসে তার দেহ ঝিমঝিম করে উঠেছিল। ঊষার চোখ

বন্ধ, নিশ্বাস মৃদু। রাত ঠান্ডা হলেও তার বুক চিরে একটা তাপ বেরিয়ে আসছিল।

এমন সময় পুষ্পরাজের অন্ধকার তাঁবুর বাইরে পায়ের খস্ খস্ শব্দ হল। প্রথমে মনে হয়েছিল একটা কুকুর—পরে, মানুষের কাশির শব্দ শুনে ঊষার বুক ঠান্ডা হয়ে এল। পুষ্পরাজ খুব তাড়াতাড়ি উঠে দু-হাতে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে দেখবার চেষ্টা করছিল কে তার তাঁবুর কাছে এত রাতে ঘোরাঘুরি করছে।

পুষ্পরাজকে দেখে তার মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো ফেলল কুন্দনলাল। বড় অন্ধকার। ভারী শীত। আকাশে এক খন্ড কালো মেঘ। কোথাও কোন শব্দ ছিল না। ঠান্ডার চাপে খাঁচার মধ্যে জানোয়ারগুলোও ঝিমিয়ে ছিল।

নিজের বুকের ওপর ভারী একটা পাথরের চাপ অনুভব করছিল ঊষা। তার চোখ ভিজে, গলা শুকনো—মনের মধ্যে সরীসৃপের মতন আশঙ্কা কিল-বিল করে উঠছিল। ওঠবার ক্ষমতা ছিল না ঊষার। পুষ্পরাজের খাটিয়ায় সে মড়ার মতন পড়েছিল।

এক পা এক পা করে পুষ্পরাজের দিকে এগিয়ে আসছিল কুন্দনলাল, বেইমান!

কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল পুষ্পরাজ। এমন অপমান নিঃশব্দে সহ্য করবার মানুষ সে নয়। তার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল এবং বোধ হয় কুন্দন-লালকে রাতের অন্ধকারে শেষ করে দেয়ার-জন্যে সে-ও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল।

চোপ রও!

শক্ত হাতের ঝাপটায় পুষ্পরাজকে ঠেলে দিল কুন্দনলাল, হুড়মুড় করে তার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখানে ঊষাকে দেখে বিকৃত একটা শব্দ করে উঠল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ঊষার ওপর। এক হাতে চুল ধরে পাগলের মতন টর্চের বাড়ি মারতে লাগল তার গায়ে পিঠে মুখে মাথায়। কিন্তু তবুও ঊষা একেবারে চুপ, একটা কাতর শব্দও বার হল না তার মুখ দিয়ে।

এই! সে-দৃশ্য দেখতে দেখতে বীভৎস হয়ে উঠল পুষ্পরাজের মুখ, উসকো মৎ মার, হামরা রাউটিসে আভ্ভি নিকালো! হাম তুমরা জান লেগা—

উন্মত্ত অবস্থায় গলা ফাটিয়ে বলে উঠল কুন্দনলাল, হারামিকা বাচ্চা—

তুম হারামিকা বাচ্চা! বদমাশ! ঊষাকো বাপ-মাকো হাম তুমারা বাত শুনায় দিয়া—তুমকো জেলমে ভেজেগা শালা!

কুন্দন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, আমার রাউটি থেকে তুমি মেয়ে ভাগিয়ে আন, এত বড় শয়তান! মালিক জুত্তিসে মারে গা তুমকো, বাঁধকে মারে গা—

তুমকো ভি হাম দেখ লেগা। ঊষা কোন হ্যায় তুমারা? উসকা বাপ-মা আচ্ছা আদমি নেই হোনে সে—

উ তুমারা কৌন হ্যায়?

পুষ্পরাজ অল্প ইতস্তত করে কুন্দনলালের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ফস করে বলে বসল, হাম উসকো সাদি করে গা।

দাঁতে দাঁত চেপে কুন্দনলাল বলে উঠল, সাদি! তারপর সে টানতে-টানতে ঊষাকে নিয়ে গেল নিজের তাঁবুতে।

মাঝপথে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল ঊষা। কুন্দনের সঙ্গে তার তাঁবুতে

সে যায়নি। টিয়া পাখির খেলা দেখায় যে চীনে মেম-সাহেব, কুন্দনের হাত ছাড়িয়ে সে তার তাঁবুতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, আমাকে বাঁচাও, ও আমাকে মেরে ফেলবে।

পরদিন সকালে মালিক সব শুনল। যা-তা গালাগাল করল ঊষা আর পুষ্পরাজকে, তখুনি বেরিয়ে যেতে বলল তার সার্কাস ছেড়ে। মাইনে দিল না, চুক্তির কথা মানল না, গর্জন করে শুধু বলল, বেরিয়ে যাও!

হারকু সাহেবের ছোট একটা প্রশ্ন শুনে এই সব পুরনো কথা এলোমেলো বাতাসের মতন হু হু করে ঊষার মনে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছিল। তার চোখ মাটির দিকে, হারকু সাহেব কিম্বা পুষ্পরাজ—সে এখন কারুর দিকেই তাকাল না।

হারকু সাহেব ঊষা আর পুষ্পরাজের চায়ের কাপ দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খাবার দরকার আছে আপনাদের? রোটি, বিস্কুট—বলব?"

সকালে ঘুম থেকে উঠে চা ছাড়া আর কিছুই খায়নি ঊষা আর পুষ্পরাজ, এখন খিদেও বেশ পেয়েছিল তাদের কিন্তু কিছু খাবার আগে চাকরির কথাটা পাকা করে নিতে চাচ্ছিল পুষ্পরাজ, "হাঁ-হাঁ, হোগা", সে হেসে জিজ্ঞেস করল, "মালিক কভ আয়গা?"

"বাবু এখানে নাই", পুষ্পরাজের মুখে বিবর্ণ একটা আভা লক্ষ করে হারকু সাহেবও হাসল, "আরে, আপনাদের গোলামি করবার জন্যে আমি তো আছি পুষ্পরাজ সাহেব। বলেন, খেলতে রাজি আছেন আমার সার্কাসে?"

"জরুর।"

"রুপেয়া কত লিবেন?"

হারকু সাহেবের প্রশ্ন বড় কঠিন মনে হল পুষ্পরাজের। সে ঊষার দিকে দেখল। তার চোখ তখনো মাটির দিকে। কিছু পরে পুষ্পরাজ থেমে থেমে বলল, "ট্র্যাপিজ শুরু হোগা?"

"হাঁ-হাঁ, ওই জন্যে তো আপনাদের দরকার, উনি এখন পাঁচটা নম্বর করবেন। রাইডিং কিছু দেরি হবে, এখন দরকার নাই। ট্র্যাপিজ দোসরা ক্যাম্প থেকে চালু করে দেব।

পুষ্পরাজ খুশি হয়ে বলল, "বহুৎ আচ্ছা।"

"কোহিনুরে আপনার ট্রুপে যারা ছিল, তাদের লিয়ে আসুন—অনেক বেশি রুপেয়া দেব আমি।"

পুষ্পরাজ একটু ভেবে বলল, "দেখেগা।"

হারকু সাহেব আবার অস্থির হয়ে উঠল। যে ছোকরা চায়ের খালি কাপ নিয়ে যেতে এসেছিল তাকে বলল তাম্বু মাস্টার আর নবীনকে এখুনি ডেকে আনতে।

আপাতত ঊষা আর পুষ্পরাজের মাইনে ঠিক হল সাড়ে পাঁচ শো টাকা তা ছাড়া র‍্যাশন দেয়া হবে। এখন দু-শো টাকা তাদের অগ্রিম দিল হারকু সাহেব।

ঠিক হল আজই বিকেল বেলা এখানে চলে আসবে ঊষা আর পুষ্পরাজ। তাদের জন্যে খুব ভাল তাঁবু ঠিক করে রাখবে হারকু সাহেব। ট্র্যাপিজের জন্যে যা-যা দরকার, তার দড়ি তক্তা—সেসব তাম্বু মাস্টারকে বুঝিয়ে পরের ক্যাম্পে নতুন নম্বরের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকবে পুষ্পরাজ। যদি এখন কোহিনুর সার্কাসের আর কাউকে নিয়ে আসা সম্ভব না হয় তাহলে এখানকার দু-চারজন ছেলে-মেয়েকে মোটামুটি শিখিয়ে নিলেই চলবে।

"টালিগঞ্জ ক্যাম্প মে, পয়লা নম্বর—ট্র্যাপিজ!" খুশির বেগ ফেনিয়ে উঠছিল হারকু সাহেবের মনে তা সে দমন করতে পারল না বলেই খুব জোরে ঘুসি মারল টেবিলের ওপর। তার চোখ তখন উষার দিকে।

শাড়ি ব্লাউজ কিছু থাকবে না উষার গায়ে। আটসাট রঙীন ফ্রক, জরির জাঙিয়া, সুন্দর মুখ, উদ্ধত যৌবন। সে দোল খাবে শূন্যে, নিচে হাজার হাজার দর্শক—সব টিকিট শেষ!

হারকু সাহেব উষাকে দেখতে দেখতে এই রকম ভাবছিল।

॥ চার ॥

জুয়েল সার্কাসের চার পোলের তাঁবু এখন অবেলার বাজারের মতন রিক্ত, নিরাভরণ। অপরিষ্কার রিং। সব চেয়ার মুড়ে রাখা হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে গ্যালারি। এপাশে-ওপাশে এবং ওপরে নানা ধরনের ছোট বড় আলো ঝিমিয়ে আছে। থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। নৌকোর পালের মতন পত পত করছে তাঁবু।

মাচার মতন ব্যাণ্ডের উঁচু জায়গাও এখন শূন্য। মণিবাবুর ক্ল্যারিওনেটের সুর বাজছে না। হীরুর ট্রামপেট নেই। গীটারে মোহনলালও কোন বাংলা গানের সুর তুলে এক একটি নম্বরের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করছে না।

তাঁবু যেমন রিক্ত ও নিরাভরণ, তেমন যারা প্র্যাকটিস করছে তাদের মুখেও এখন প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই, পোশাকের বাহারও নেই। কারুর কারুর গায়ে ছেঁড়া ময়লা ফ্রক কিংবা ফুটো ফুটো গেঞ্জি।

যাদের বয়েস হয়েছে তারা খুশি মতন খেলা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে—সাধনার একাগ্রতায় তারা অন্ধ, বিভোর।

যারা নতুন, ছোট ছোট মেয়ে, তাদের শুকনো মুখ। বড় শীর্ণ তারা। বুকের হাড় স্পষ্ট দেখা যায়। এদের প্রথম পাঠ পীকক আর বোনলেস।

রিং-এর ভেতরে নয়, গ্যালারির কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় এরা পীকক হওয়ার কৌশল আয়ত্ত করছিল এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কানের পাশ দিয়ে দু হাত পিছনে চালিয়ে শরীর ভেঙে গোড়ালি স্পর্শ করবার চেষ্টা করে বোনলেস শিখছিল।

এরা কোম্পানীর মেয়ে। গরিব বাপ-মা সার্কাস পার্টির সঙ্গে বছর পাঁচেকের চুক্তি করে মেয়েকে রেখে যাবার সময় কিছু টাকা নিয়ে গেছে। প্রায় বিক্রি করে যাওয়ারই মতন। শিক্ষানবিশির মেয়াদ শেষ হলে এরা খেলা দেখাবে, মাইনেও পাবে তখন।

মেয়ে খেতে পাবে, জামা-কাপড় পাবে, অসুখ হলে ওষুধ পথ্যও পাবে। সব দায়িত্ব এখন কোম্পানীর। বাপ-মা বড় নিশ্চিন্ত হয়ে সার্কাসের তাঁবুতে রেখে গেছে তাদের ছোট ছোট মেয়েদের।

এদের খেলা শেখাচ্ছে রাজু মাস্টার নির্দয় গুরুর মতন। তার চোখে শাসন, কঠোর মুখ, হাতে বেত। গলার স্বর বড় কর্কশ।

বয়েস হয়েছে রাজু মাস্টারের। এক কালে খুব শক্তিশালী পুরুষ ছিল।

বারের খেলা, লোহার বলের খেলা দেখাত। এখন আর নিজে খেলতে পারে না, খেলা শেখায়।

বিষণ্ণ হয়ে ছিল কিশোরী। প্র্যাকটিসে মন দিতে পারছিল না। একটু আগে বোনলেস্ করতে গিয়ে পড়ে গেছে। বুকের একটা হাড় কট করে উঠেছিল। ব্যথা বাড়ছে। ঠোঁট কাঁপছে কিশোরীর। কাঁদবার সাহস নেই। কাঁদলেই মার খেতে হবে।

পায়ের তলায় ঠাণ্ডা মাটি, ধুলোমাখা দেহ কিশোরীর, হাতে তামার ছোট একটা মাদুলি বাঁধা। অনেকদিন আগে তার খুব অসুখ হয়েছিল, তখন মা এই মাদুলি পরিয়ে দিয়েছে। জীবনে আর অসুখ হবে না।

মনে মনে কেঁদে উঠল কিশোরী, "মাগো, আমাকে কেন এখানে রেখে গেলে মা! আমি তোমার সাথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাসন মাজতাম, কয়লা ভাঙতাম, ঘর ঝাঁট দিতাম! ও মা, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও! এখানে থাকলে আমি মরে যাব—ঠিক মরে যাব।"

"এই ছুঁড়ি, এই হচ্ছে কী?" একটু বেশি জোরেই কিশোরীর গালে চড় মারল রাজু মাস্টার, তার বুকে চিমটি কেটে বলল, "সেই থেকে দেখছি কিচ্ছু হচ্ছে না। হাজারবার বলে দিলেও বুঝতে পারিস না—ইয়ার্কি মারতে এসেছিস এখানে?"

কিশোরীর চোখ থেকে টপ টপ জল পড়ল, ভয়ে মুখ শুকিয়ে এসেছে। তার বুকে ব্যথা কনকন করছে। সে জানে মাস্টার কোন কথা শুনবে না, প্র্যাকটিস না করলে আরও মারবে তাকে। অসভ্যের মতন বুকেই আবার চিমটি কাটবে, খুব লাগিয়ে দেয় মাস্টার।

কিশোরীকে মার খেতে দেখে হাত-পা খুলে এলেও দুপ দুপ শব্দ করছে বাণী আর মঞ্জু। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, হাঁপাচ্ছে। ওদের তিনজনকেই কিছু সময় লক্ষ করল রাজু মাস্টার। তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বিরক্ত, অপ্রসন্ন।

"বেত মেরে পিঠ লাল করে দেব", বাণীকে মারল রাজু মাস্টার. মঞ্জুকেও, "মেরে মেরে ছুঁড়িগুলোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। কেবল ফাঁকি মারার মতলব!"

রিং-এর বাইরেই আর একদিকে খুব ছোট জায়গায় নোয়েল খানের নির্দেশ মতন মোটর বাইক নিয়ে ঘুরে যাচ্ছে ছোকরা যুগল। যুগলের কপালে ছোট একটা কাটা দাগ, মুখে অনেক ব্রণ। এক-একবার সে এক্সিলারেটার ঘোরাচ্ছে, কখনও আস্তে আস্তে ক্লাচ চাপছে আর ছাড়ছে।

মোটর বাইকের রঙ লাল। ব্রেক নেই। এটা নিয়েই যুগলকে মরণ গ্লোবে ঢুকে খেলা দেখাতে হবে। তাহলে দুটো নম্বর হবে তার। মোটর বাইক জাম্প আর কেজ অব ডেথ-এর খেলা।

যুগল নোয়েল খানকে ধরেই ঢুকেছে জুয়েল সার্কাসে। তাকে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে নেয়ার আগ্রহ তারই বেশী। মরণ গ্লোবে খেলা দেখাবার আর কেউ নেই। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই নম্বর বন্ধ।

আরও নম্বর করে বেশী টাকা রোজগার করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল যুগল। ছোট জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে মোটর বাইকের স্পীড অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছিল—নোয়েল খানকে অবাক করে দিতে চাচ্ছিল। অপেক্ষা করবার আর ধৈর্য ছিল না তার।

"এ যুগল, থাম থাম", বিরত হয়ে বলে উঠল নোয়েল খান, হাতের ইশারায় যুগলকে থামতে বলল, "পাগলা হয়ে গেলি? স্পীডের খেয়াল নেই?"

ভট ভট শব্দ করছে লাল মোটর বাইক। আস্তে আস্তে স্পীড কমে আসছে। যুগলের মুখে হাসি নেই। দুঃসাহসিক কাজের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। মরণ গ্লোবের খেলা নোয়েল তাকে আজ না শেখালে সে তাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়বে কেজ অব ডেথ-এ। তাঁবুর এক কোণে খাঁজ কাটা রুপোলি বিরাট গ্লোবের দিকে তাকাল যুগল।

"আজ গ্লোবের ভিতরে খেলব নোয়েল সাহেব", গলার স্বর বড় দৃঢ় যুগলের, মোটর বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে সে বলল, "বহুৎ দিন বাইরে প্র্যাকটিস হল। আর না—"

নোয়েল খান বাঙালী ক্যাথলিক। তার তাঁবুতে মেরীর নীল একটা ছবি আছে। তার বউ নদীয়ার চাপড়া গ্রামের মেয়ে। গোঁড়া ক্যাথলিক। তার নতুন নাম ক্রিশ্চিনা।

মাঝে মাঝে ক্রিশ্চিনা দুটো ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে নোয়েল খানের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হয়। তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেয় কোন ক্রিশ্চান মেয়ে এসেছে কি না সার্কাসে। যে ক'দিন ক্যাম্পে থাকে ক্রিশ্চিনা সে ক'দিন কড়া পাহারা দেয় নোয়েল খানকে, সব সময় চোখে চোখে রাখে। মদ খেতে দেয় না, তিন তাসের জুয়ো খেলাও বন্ধ, তার গা থেকে গাঁজার গন্ধ বার হচ্ছে কি না তাও বোঝবার চেষ্টা করে ক্রিশ্চিনা।

"খবরদার", নোয়েলকে সে শাসন করবার চেষ্টা করে, সতর্ক করে বলে, "হিঁদু মেয়েদের সাথে বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করবে না—মেরীর কসম!"

"আরে খৃষ্টানী", স্ত্রীর আসল নাম উচ্চারণ করতে পারে না নোয়েল খান, "সার্কাস আর্টিস্টের কোন জাত নেই। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—এখানে সব এক।"

"ওসব কথা বাদ দাও! বাচ্চা দুটো একটু বড় হোক না, তাঁবুতে আমিও এসে থাকব তখন—দেখো। হিন্দু মেয়েগুলোকে শায়েস্তা করে ছাড়ব। লাজ নেই ছুঁড়িদের—একটুকু শরম নেই।"

ক্রিশ্চিনার মেজাজ আগুনের কড়া আঁচের মতন গম গম করে, মুখ রুক্ষ, চোখও জ্বলতে থাকে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে নোয়েল খান, "এ খৃষ্টানী, আমি খালি আর্টিস্ট নাকি? আমি প্রোগ্রাম মাস্টার না? আমার কত কাজ। পীরিত করার টাইম আছে আমার?"

"বউ হাতের কাছে না থাকলে, পুরুষমানুষ মদ গাঁজা খেয়ে যার-তার সাথে পীরিত করতে পারে।"

তখনো হাসে নোয়েল, "তোমার মনে পাপ। গীর্জায় গিয়ে মন ঠিক রাখ।"

মেরীর নীল ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে তীক্ষ্ণ স্বরেই বলে ওঠে ক্রিশ্চিনা, "মেরী সব জানে!"

রিং-এর বাইরে ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে যুগলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্রিশ্চিনার কথা পলকে মনে পড়ে গেল নোয়েল খানের। কেননা সে লীলার দিকে তাকিয়ে ছিল।

রিং-এর মধ্যে একদিকে কাঠের তক্তার ওপর পায়ের তলায় বড় একটা বল

নিয়ে ব্যালেন্স করছে লীলা।

এখন বাইরের লোক একটিও নেই তাঁবুর ভেতরে। তা হলেও জাত-সার্কাসের মেয়ের মতন মুখে হাসি ফুটিয়ে লীলা তার নতুন দুরূহ খেলা পুরোপুরি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে করতে শূন্য গ্যালারি ও মুড়ে রাখা চেয়ারগুলোর দিকে এক-একবার তাকিয়ে অভ্যাস মতন হাত ঘুরিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিও করছিল।

যুগলের কথা শুনল না নোয়েল খান, সস্তা সিগ্রেটের হলদে প্যাকেট বের করে একটা চেয়ার টেনে নিল। কিছু পরে লীলার প্র্যাকটিস দেখতে দেখতে বলে উঠল, "আরে দেখ দেখ যুগল, লীলা এবার বড় জোর নম্বর করবে।"

রিং-এর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল যুগল। অন্যের খেলায় তার কোন কৌতূহল ছিল না। স্থির মোটর বাইকের হ্যাণ্ডেলে হাত ঘষতে ঘষতে সে আর একবার বড় অধীর হয়ে উঠল, "নোয়েল সাহেব, এবার কেজ অব ডেথ-এর খেল শুরু হোক। ওঠেন, চলেন! এ মাইলা—" মরণ গ্লোবের গ্লেট সরাবার জন্যে নোয়েল খানের অনুমতি না নিয়েই একটা রিং-বয়কে ডাকল যুগল।

"না", নোয়েল খানের গলার স্বর বড় ভারী, রাজু মাস্টারের মতন, "অত ধড়ফড়ানি ঠিক না যুগল। আরও প্র্যাকটিস করতে হবে, আর একটু সবুর কর—"

কথা বলবার সময় সাধারণত মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে যুগল। এখন মাথা তুলল, "আমি তৈয়ার নোয়েল সাহেব। আপনি শুধু শুধু আমাকে খেলতে দিচ্ছেন না—"

"তুই আমার চেয়ে বেশী বুঝিস? এখনো স্পীডের খেয়াল হয়নি তোর।"

"একটা চান্স দিয়ে দেখেন। দশ-বারো বছর মোটর বাইক নিয়ে ঘুরেছি, স্পীডের খেয়াল না থাকলে এত দিনে হাড্ডি ছাতু হয়ে যেত নোয়েল সাহেব!"

নোয়েল খান যুগলের আগ্রহ ও সাহস দেখে মনে মনে খুশি হল। কিন্তু আরও একটু সময় নিতে চাচ্ছিল সে। ছোকরা নতুন, বড় চঞ্চল। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে মাস্টার হিসেবে নাম খারাপ হবে তার।

সিগ্রেটের ধোঁয়া নোয়েল খানের মুখের সামনে কয়েক মুহূর্তের জাল বুনে হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল। রিং-এর মধ্যে আবার লীলার হাসি দেখল নোয়েল খান এবং তারই অনাবৃত উরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই গ্লোবের নাম জানিস যুগল?"

"হাঁ, জানি।"

"আমার কথা যদি না শুনিস, যদি খুশি মতন কেরামতি করতে যাস—"

যুগল মুখ তুলল না। লাজুক ছেলের মতন মাটির দিকে তাকিয়ে বড় উদ্ধত স্বরে বলে উঠল, "জানের পরোয়া আমি করি না নোয়েল সাহেব।"

নোয়েল খান হাসল, "সার্কাসের কোন আর্টিস্ট জানের পরোয়া করে না যুগল। তবে জান বাঁচিয়ে যে বেশী দিন খেলতে পারে সে-ই বাহাদুর—এক নম্বরের খেলোয়াড়।"

কিছু সময় চুপ করে থাকল যুগল। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল. এমন কী নোয়েল খানের সঙ্গে কথা বলবার সময়ও গলার স্বর যতই দৃঢ় শোনাক, তার দৃষ্টি ভীত, চোরের মতন। নোয়েল খান তার দৃষ্টি লক্ষ করল না।

রিং-এর ভেতরে অনেক ওপরে একটা দোলনা ঝুলছে। সেখানে একা একাই দোলনার তক্তায় মাথা ঠেকিয়ে পা ওপরে তুলে তাল রাখবার চেষ্টা করছে সুরযু সিং, নতুন খেলা শিখছে। তার কোমরে দাড়ি বাঁধা, নিচে পড়ে যাবার ভয় নেই।

অনেক উঁচুতে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে সুরযুর দেহ। মাথা নিচে, পা ওপরে —কঠিন যোগাভ্যাস করার মতন।

নিচে রিং-এর ভেতরেই হাই হুইল শিখছে রাধানাথবাবুর দুই মেয়ে—যমুনা আর হাসি। ঢলোঢলো মুখ যমুনার, স্বাস্থ্য উপচে উঠছে। এখন যদিও হাসছে না, খুব উঁচু স্ট্যাণ্ডের ওপর সীটে বসে বোনের হাত ধরে সাইকেল নিয়ে ঘুরছে রিং-এর মধ্যে তা হলেও হাসির আভা ফুটে উঠছে যমুনার ঠোঁটে। মুখই হাসি হাসি তার।

যমুনার চেয়ে বছর দু-একের ছোট হাসি। যমুনার মতন অত স্বাস্থ্য-বতী না হলেও, বেশ জীবন্ত। টানা-টানা চোখ, কিছু বিষণ্ণ। এখন খুব গম্ভীর হাসি, বড় সতর্ক। পায়ের সব জোর ঠেলে দিয়ে প্যাডেল করতে করতে দিদির সঙ্গে হাই হুইল রপ্ত করে নেয়ার চেষ্টায় বড় পরিশ্রম করছে।

দু বোনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে ক্লাউন করালীকান্ত। সজাগ, সতর্ক। এখন সে ক্লাউন নয়, ট্রেনার। কোম্পানীর যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, স্বাধীন হয়ে মাইনে পাচ্ছে, করালীকান্তর আর একটা কাজ তাদের খেলা শেখানো।

রাজু মাস্টারের মতন করালীকান্তরও বয়েস হয়েছে। শুধু ক্লাউন হয়ে থাকলে তার চলত না। একটু বেশী বয়েসে বিয়ে করেছে। বউ আছে, ছোট একটি মেয়ে আছে। মাসে মাসে তাদের টাকা পাঠাতে হয়।

বামন ক্লাউন গোপালের চেয়ে করালীকান্তর নাম অনেক বেশী—দামও। আগে, যখন তার বয়েস ছিল তখন সিংগল, ডবল এবং হাই হুইল—এই তিন রকম সাইকেলের খেলায় তার দক্ষতা সমান ছিল বলে এখনো মেয়েরা যখন এক চাকা কিংবা দু চাকার সাইকেলের নম্বর করে তখন করালীকান্ত ভাঁড়ামি করতে করতে হঠাৎ ঝপ করে একটা সাইকেল টেনে নিয়ে কয়েকটা খেলাও দেখিয়ে দেয়। সেই সময় গানও খেলে যায় করালীকান্তর গলায়। ভাঙা ভাঙা স্বর, ভুল সুর। দশ বারোজন মেয়ের সঙ্গে এলোমেলো সাইকেল চালাতে চালাতে সে গেয়ে ওঠে,

"আহা, রাই বিনোদিনী
ষোড়শ গোপিনী
মোর প্রাণে ব্যথা
দিও না আর!
আহা, যেওনা যেওনা যেওনা—"

করালীকান্তর দিকে হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গোলাপী সাটিনের পোশাক পরা মেয়েরা নম্বর শেষ করে রিং-এর বাইরে চলে যায়।

প্রথম যৌবনে যাত্রার দলেও কিছুকাল কাটিয়েছে করালীকান্ত, গানের চর্চাও করেছে তখন। বয়েস নেই এখন। গানও বেসুরো হয়ে গেছে। তাহলেও বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে হাসির হালকা একটা আবরণের মধ্যে করালীকান্ত ধরে রেখেছে তার খেলা, তার গান।

এই নিয়েই সে তৃপ্ত।

"ব্যস ব্যস", যমুনার সাইকেলের স্ট্যাণ্ড ধরে ফেলল করালীকান্ত, হাসিকেও থামিয়ে দিল, "আর দু-একদিন করলেই হয়ে যাবে। এই ক্যাম্পেই নম্বর করবি? বলে রাখব নাকি প্রোগ্রাম মাস্টারকে?"

হাসির আপত্তি ছিল না কিন্তু মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করল যমুনা, "উঃ! ভারী বয়ে গেছে আমার এই ভাঙা হাটে নতুন নম্বর করতে! দেখবে কে শুনি?"

করালীকান্ত খস খস করে গলা চুলকোতে চুলকোতে হাসল, "শেষ হয়ে আসার আগে একবার জ্বলে উঠতে হয় রে। নম্বরের রকমফের হলে যাবার মুখে আবার পিলপিল করে মানুষ আসবে তোদের দেখতে—জানলি?"

সাইকেল ঠেলে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে যমুনা কয়েক মুহূর্ত লীলার দিকে তাকিয়ে থাকল। দু চোখে ঈর্ষা ঠেলে উঠছে তার। মনের ঝাঁজ সে চেপে রাখতে পারল না। করালীকান্তকে বলল, "ওসব কথা ওকে বোঝাও না। ওই যে, তোমাদের সার্কাস কুইন গো!"

"হুঁ?" লীলাকে একবার দেখে নিয়ে করালীকান্ত যমুনার দিকে তাকিয়ে হাসল, "কুইনিন খেয়েছিলি নাকি যমুনা? মুখের ভাব অমন কেন গো? ও, হিংসে? তাই বল। যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই রেষারেষি।"

"বয়ে গেছে আমার যাকে-তাকে হিংসে করতে!"

যমুনা আর হাসি প্র্যাকটিস শেষ করে চলে যাবার পর লীলার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল করালীকান্ত। তার পায়ের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে সেও বলের সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক করতে লাগল।

"লীলা, অত জোরে বল চাপে না। একটু আলগা করে—এই!"

করালীকান্তর দিকে লীলা একটা হাত বাড়িয়ে দিল। পায়ে বল চেপে তাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আহ্লাদী মেয়ের মতন মুখের ভাব করে বলল, "এতক্ষণে সময় হল?"

"কেন গো? বলি, মান করেছ?" করালীকান্ত লীলার হাত জোরে চেপে ধরে হালকা গলায় বলল, "তোমাকে তালিম দেয়ার দরকার আছে কিছু?"

"তা থাকবে কেন?" করালীকান্তর হাত ছেড়ে তরতর করে সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার পিছনে চলে এল লীলা, "সার্কাস কুইন বানাবার জন্যে যে রেটে তালিম দিচ্ছ যমুনাকে—"

"আরে দুজনেই এক রকম কথা বলে যে! এক কোম্পানীতে অত সার্কাস কুইন গজালে নামই পালটে যাবে জুয়েল-এর। নাম হবে কুইন সার্কাস। হুঁ হুঁ!"

"ওসব কথা রাখ", হঠাৎ ঠোঁটে ঠোঁট চাপল লীলা, ছলাৎ করে একটা শব্দ করল, "আমিও দেখব কার নম্বর বেশি হাততালি পায়—"

এসব বলতে বলতে সে কিছু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বলে তার পায়ের তলা থেকে বল পিছলে গেল। করালীকান্তর কাঁধে হাত রাখল লীলা, পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে নিল।

তখন হি হি করে হাসল করালীকান্ত, লীলার গোটা দেহটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "হিংসেয় মানুষ ফেটে পড়ে আর তুমি পড়লে পা পিছলে! ওগো, লীলা কুইন, ক্রোধ বড় সাংঘাতিক রিপু—তোমার ওপর ভর করেছে তো ব্যস, খেল খতম", লীলার বলের ওপর করালীকান্ত পা রাখল, "আরে বল্ তো বল্—সব পিছলে যাবে। একেবারে হরি বোল হয়ে যাবে মাইরি!"

লীলাকে হাসাবার জন্যেই স্বরের বিভিন্ন খাদ গলায় খেলাবার চেষ্টা করছিল করালীকান্ত। কিন্তু তার কথা শুনে হাসল না লীলা। আক্রোশের একটা তীব্র দাহ তাকে হঠাৎ বিমূঢ় এবং অবসন্ন করে তুলেছিল।

কয়েক মুহূর্ত মূর্তির মতন লীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। প্র্যাকটিস করবারও তার আর কোন উৎসাহ ছিল না। কিছু পরে সে একটা রিং-বয়কে হাতের ইশারায় বল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল এবং মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে পা ফেলে নিজের তাঁবুতেই ফিরে চলল।

অনেক সময় নিয়ে স্নান করবার ইচ্ছে হচ্ছিল লীলার।

হয়তো তার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলত করালীকান্ত, এমন অপ্রসন্ন মুখে তাকে সার্কাসের রিং থেকে বেরিয়ে যেতে দিত না। হালকা হাসির কথা বলে বলে তার মনের যত জ্বালা, যত আক্রোশ জুড়িয়ে দিত কিন্তু কান্নার তীক্ষ্ণ একটা শব্দ শুনে সে চমকে উঠল এবং পিছন ফিরে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত রাঘবনকে দেখে সেও অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ট্রুপ মাস্টার রাঘবন। গম্ভীর, অমিশুক। স্থূল দেহ। বিকট গলার স্বর। কৈশোর থেকেই সার্কাসের তাঁবুতে-তাঁবুতে কাটিয়েছে। কঠিন-কঠিন খেলা দেখিয়ে নাম করেছে। এখন দিন ফুরিয়েছে তার, কিন্তু সার্কাসের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায়নি।

সার্কাসের এমন অভিজ্ঞ মানুষ গরিব বাপ-মার কাছে অদূর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল একটা ছবি ফুটিয়ে তোলে এবং তাদের ছেলেমেয়েদের টেনে নিয়ে আসে নিজের কাছে, খেলা শেখায়।

ট্রুপের ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব কোম্পানীর নয়, ট্রুপ মাস্টারের। কোম্পানীর চুক্তি ট্রুপ মাস্টারের সঙ্গে। সে যাকে যেমন খুশি দেবে, যা ইচ্ছে খাওয়াবে, বাপ-মার সঙ্গে যা হোক বোঝাপড়া করবে—সেসব খবর কোম্পানী রাখবে না।

টেলিচেরির চেরাক্কারা গ্রামের লোক রাঘবন। তার ট্রুপের ছেলেমেয়েরাও ওই প্রদেশেরই। আমিনা নলিনী হেমলতা রেবতী আর শ্রীধরন। সবচেয়ে কম বয়েস রেবতীর, একেবারে নতুন।

মেরে মেরে খেলা শেখায় রাঘবন। বড় তাড়াতাড়ি রেগে যায়। তার অহঙ্কার সে টেলিচারির লোক,- সার্কাসে খেলবার অধিকার সে-দেশের মানুষের জন্মগত। কেন তার ট্রুপের ছেলেমেয়েরা একটা সহজ খেলা আয়ত্ত করতে বেশী সময় নেবে।

দু-তিন মাস পর নলিনী চলে যাবে। তার বাপের সঙ্গে রাঘবনের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। খুব কড়া একটা চিঠি লিখেছে তার বাপ। ঠিক মতন কেন টাকা পয়সা পাঠানো হয় না তাকে? সে খবর নিয়ে জেনেছে যে অনেক দিন ধরেই তার মেয়ে জুয়েল সার্কাসে তিন-চারটে নম্বর করছে। নলিনীর টাকা এমন করে মেরে দেয়ার কী অধিকার আছে রাঘবনের!

নলিনী চলে গেলে মাইনে বেশ কমে যাবে বলে এখন থেকেই রাঘবন সতর্ক হচ্ছে, তার সব খেলা অমানুষের মতন পরিশ্রম করে শেখাচ্ছে হেমলতা আর রেবতীকে, শ্রীধরনের নম্বর বাড়াবারও খুব চেষ্টা করছে।

নলিনীর কাপ সসারের খেলাই সবচেয়ে কঠিন ও চমকপ্রদ। তারের ওপর দাঁড়িয়ে একটি একটি করে পর পর ছ'টি কাপ সসার পা দিয়ে ছুঁড়ে মাথায় সাজিয়ে রাখে নলিনী। সব শেষে একটি চামচও টুং করে গিয়ে পড়ে কাপের মধ্যে।

এ খেলাই কয়েকদিন ধরে হেমলতাকে শেখাচ্ছে রাঘবন। তারের ওপর না, আগে মাটিতে দাঁড়িয়েই প্র্যাকটিস করতে হবে। রিং-এর বাইরে গ্যালারির কাছাকাছি আর একটা ফাঁকা জায়গায় ট্রুপের ছেলেমেয়েদের নিয়ে রাঘবন তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

শ্রীধরনের হাতে জোরে একটা মোচড় দিল রাঘবন, "হাড় নেই তোর দেহে, প্লাস্টিক বডি—বুঝলি? নে, ঢুকে পড়—" একটা ছোট কাঠের ড্রাম পড়েছিল মাটিতে, সাদা রঙ, ঢোলের মতন দেখতে। জড়োসড়ো হয়ে শ্রীধরন তার মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছিল।

"এত দেরি লাগে? খুব কষ্ট হয়, না?" চুল ধরে শ্রীধরনের মাথা বেশ কিছু সময় ঝাঁকাতে থাকল রাঘবন, "খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছিস? হাড় গজাচ্ছে?" তার দেহ দুমড়ে মুচড়ে সেই ছোট ড্রামের মধ্যে রাঘবন জোর করে ঠেলে দিতে লাগল।

থেকে থেকে কাতর শব্দ করে উঠছিল শ্রীধরন। হেমলতা হাঁটু ভেঙে পা অল্প ওপরে তুলেছে। তার পায়ের ওপর কাচের একটা ভাঙা সসার। সূঁচে সুতো পরাবার সময় চোখের মণি যেমন স্থির হয়ে যায়, হেমলতার দৃষ্টি এখন ঠিক তেমন। একাগ্রতার ভারে তার মনও আহত পাখির মতন অবশ, নিশ্চল।

হেমলতা তাকিয়ে ছিল তার পায়ের ওপর রাখা ভাঙা সসারের দিকে।

একটু আগে মাথার ওপর দিয়ে সসার মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, হেমলতা লক্ষ ঠিক করতে পারেনি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, রেবতী, দরকার মতন কাপ কিংবা সসার তুলে দিচ্ছে হেমলতার হাতে।

"এ হেম", শ্রীধরনকে ছেড়ে রাঘবন হেমলতার কাছে এসে দাঁড়াল, তার পায়ে হাত রেখে আঙুলগুলো চেপে ধরে বলল, "আরও সামনে পা এগিয়ে দে, আঙুল অত ফাঁক করিস না। উঁহু, এখনো পা নড়ছে, সাবধান!"

চোখ বেঁকিয়ে রাঘবনকে দেখল হেমলতা। অনেকক্ষণ থেকেই তার শীত লাগছিল, এখন পায়ের হাড় কনকন করে উঠল। বিশ্বাস হারাল হেমলতা। পা ছোঁড়বার আগেই সে জানত এবারেও সসার মাথায় বসবে না।

রাঘবনের হাতের আওয়াজে গাল জ্বলে গেল হেমলতার, শুকনো চোখ ভিজে উঠল। সসার মাটি থেকে তুলে নিয়েছে রাঘবন, হেমলতার পাশে দাঁড়িয়ে উগ্র তামিল ভাষায় তাকে গালাগাল করছে, "পা ভেঙে দেব তোর! একটা সোজা খেলা—এতবার দেখিয়ে দিলাম! কেন আসিস তোরা সার্কাসে খেলতে!"

আবার আগের মতন ভঙ্গি করে দাঁড়াল হেমলতা। মাথা ঘুরছে, গাল জ্বলছে। আবার তার দৃষ্টি পড়ল পায়ের দিকে। এখন সে মনে মনে ভগবানকে ডাকছিল, একটা অলৌকিক কিছু ঘটুক! নলিনীর মতন এবার যেন আমি কাপ সসার মাথায় রেখে মাস্টারকে অবাক করে দিতে পারি!

"এই, পায়ের দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? মাথা সোজা করে না রাখলে কাপ সসার থাকবে মাথার ওপর?" মেজাজ গরম হয়ে উঠছিল রাঘবনের, সে হাত মুঠো করে হেমলতার মাথায় আঘাত করে বলল, "পাবলিকের দিকে দেখ! রেডি? এবার যেন মিস না হয়—"

ভগবানের ওপর নির্ভর করতে পারছিল বলে চোখে বিশ্বাস জ্বলছিল হেমলতার। রাঘবনের কথা শেষ হওয়ার আগে অলৌকিক সফলতার আশায়

যন্ত্রের মতন সে পা ছুঁড়ল এবং পরেই তার দেহ কাঠের স্ট্যাণ্ডের মতন শক্ত ও স্থির হয়ে গেল।

হেমলতার মাথায় না, সসার পড়ল রাঘবনের মাথায়, তারপর মাটিতে। বিকৃত হয়ে এসেছে রাঘবনের হিংস্র কুকুরের মতন বড় মুখ। রাগের গরর গরর শব্দ তার গলা ঠেলে উঠল। রেবতী সসার তুলে হেমলতাকে দেবার আগেই সে তা তুলে নিল এবং সসারের ভাঙা চোখা অংশ অনেকক্ষণ ঘষতে থাকল হেমলতার নরম তুলতুলে ঠোঁটের ওপর।

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কেঁদে উঠল হেমলতা। রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে তার ঠোঁট। মাথা ঘুরছে। সে হাত তুলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেই আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল রাঘবন বন্য ভয়ংকর একটা পশুর মতন।

তার হাত ধরে তাকে দূরে ঠেলে দিল করালীকান্ত, শাসন করার মতন চড়া গলায় বলল, "কেয়া করতা রাঘবন? হুঁশ নেহি হ্যায়? ছোটা লেড়কি—ইসিকো মার ডালেগা?"

বিস্ময় দমন করে নিতে কিছু সময় লাগল রাঘবনের। এমন বাধা পেতে সে অভ্যস্ত নয়। করালীকান্তকেও তার আঘাত করবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ভাঙা সসার দূরে ছুঁড়ে ফেলল রাঘবন, করালীকান্তর সামনে এসে রুখে দাঁড়াল।

"তুমরা কেয়া?"

"উ মর যানে সে ক্যায়া হোগা মালুম হ্যায়? পুলিস আয়েগা, শো বন্ধ্ কর দেগা—তব রুপেয়া মিলেগা তুম?"

"এ সার্কাস তুমরা—হাম তুমরা নোকর হ্যায়? আভভি হারকু সাহেবকো হাম বোলে গা—"

করালীকান্ত ঘুষি পাকিয়ে রূঢ়স্বরে বলল, "বেকার বাত ছোড় তুম, হামভি কিসিকো বাপকা নোকর নেহি হ্যায়। শুয়ার কাঁহাকা—"

"এই চোপ রও! অ্যায়সা গালি মৎ দেও—" রাঘবন করালীকান্তর গলা চেপে ধরবার জন্যে হাত তুলেছিল, তাকেও জোরে একটা ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল করালীকান্ত, কিন্তু সে বাধা পেল।

করালীকান্তর হাত ধরে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে রাজু মাস্টার, "কী ছেলেমানষী কর করালীদা বুড়ো বয়সে?"

"মেয়েটাকে মেরে ফেলবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? এমন করে খেলা শেখাবে শালা?"

"এই চোপ রও!"

"আঃ, করালীদা, হচ্ছে কী!" গলার স্বর যথাসাধ্য নরম করে তোলবার চেষ্টা করল রাজু মাস্টার, "এ রাঘবন সাহেব, কসুর মাপ কিজিয়ে। এ আদমী বিলকুল পাগল—" করালীকান্তকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে সে খড় অপ্রসন্ন হয়ে বলতে থাকল, "বলি, ও তোমার মেয়ে? শুধু শুধু ঝামেলা করতে যাও কেন? তার ট্রুপের মেয়েকে সে লাথি মারুক, চুমু খেয়ে খেলা শেখাক—তোমার অত দরদ জাগে কেন? দরদ দেখাবার জায়গা এটা?"

শেষ অবধি নোয়েল খানকে রাজী করিয়েছে যুগল—কেজ অব ডেথ-এর প্লেট সরিয়ে মোটরবাইক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তার একটা হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে নোয়েল খান। ইস্পাতের খাঁজে-খাঁজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বলে অনেক বেশি শব্দ তুলেছে মোটরবাইক।

"যুগল খবরদার, আমার হাত ছাড়বি না! চাকা স্লিপ করে যেতে পারে। পয়লা খেলা, রাউণ্ড অ্যাণ্ড রাউণ্ড। শুধু ঘুরে যাবি—বুঝলি?"

"হুঁ।"

"ক্লাচ ছাড় এবার, হুঁশিয়ার! দো-চারদিন পরে দেখাব জিগজ্যাগ—তখন এদিক-ওদিক ঘুরবি। তারপর উপর থেকে নিচে—প্লেট টু প্লেট—"

স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে যুগল, হাত ছেড়ে দিয়েছে নোয়েল খানের। শব্দের তরঙ্গ ছুটে বেড়াচ্ছে নোয়েল খানকে ঘিরে। সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি এ-খেলা আগে থেকেই জানত যুগল?

ঝড়ের মুখে মাটির শিকড় উপড়ে ভেঙে পড়ার ইচ্ছায় অস্থির গাছের মতন থরথর করছে জুয়েল সার্কাসের কেজ অব ডেথ।

॥ পাঁচ ॥

এক খণ্ড মেঘ অনেক সময় নিয়ে স্থির হয়ে আছে। আকাশ ঘন কালো। কিছু আগে ঝড়ের মতন হাওয়া উঠেছিল এবং তখন সম্ভবত বৃষ্টির কয়েকটা হালকা ফোঁটাও ঝরে পড়েছিল, হাওয়ার জোর ছিল বলে স্পষ্ট করে বোঝা যায়নি।

জুয়েল সার্কাসের তাঁবু এখন যুবতী পসারিনীর মতন উন্মুখ ও প্রগলভ। নানা রঙের অনেক ছোট ছোট বাল্ব জ্বলছে মালার মতন। মাইকে গান বাজছে। থেকে থেকে চিৎকার করে এ অঞ্চলের মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে পাবলিসিটি ম্যানেজার গোকুলবাবু।

কুয়াশা অন্ধকারকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে গভীর করে তুলেছে। হাওয়াও ধারালো, উচ্ছৃঙ্খল। যদিও সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁক, শীত হঠাৎ ভারী হয়ে উঠেছে বলেই অন্ধকার বড় তাড়াতাড়ি সিক্ত বিকেল মুছে নিয়েছে।

কুয়াশা অন্ধকার ও তীক্ষ্ম বাতাস কেটে কেটে গোকুলবাবুর গলার স্বর অনেক দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে—

"জুয়েল! জুয়েল! জুয়েল! দ্বিতীয় শো—বড়িয়া খেল! আইয়ে! আইয়ে! আইয়ে! আমার মা বোনেরা, ভাই ও বন্ধুগণ! আউর দো-চার রোজ বাদ খেল বিলকুল খতম হো যায় গা। শেষ রজনী আসন্ন! আপ কো লিয়ে সব আর্টিস্ট তৈয়ার! আর-দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে শো শুরু হয়ে যাবে! অবিলম্বে আসন সংগ্রহ করুন। বালিকা কিশোরী ও যুবতীর খেলা, স্ট্রং ম্যানের কসরৎ—বাঘ ভল্লু হাত্তি আউর উটকা তামাশা দেখিয়ে! আসুন! আসুন! আসুন!"

হারকু সাহেব যেমন বলে দিয়েছিল তেমন করেই হিন্দি বাংলা মিশিয়ে পাবলিসিটির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে গোকুলবাবু। এর আগে বাংলা রেকর্ড বাজিয়েছিল, এখন ফিলিমের হিন্দি গান চালাল—

> "আইও আইও—আইও মোরি রানী!
> কসম তুমারি, মুঝে সাথে গঙ্গা কী পার মিলে না—"

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং গ্যালারি—তিন রকম টিকিটের জন্যে পাশা-পাশি দুটি কাউন্টার খোলা। সহদেব আর বাহাদুর ছোট টিনের বাক্স নিয়ে

সোজা হয়ে টুলের ওপর বসেছে। বাক্সর মধ্যে টিকিট আর খুচরো টাকা-পয়সা।

নবীন আছে ওদের কাছে-কাছেই। এক-একবার টিনের বাক্সর ওপর ঝুঁকে পড়ছে, টিকিট ছিঁড়ে-ছিঁড়ে তুলে দিচ্ছে সহদেব কিম্বা বাহাদুরের হাতে। কত টাকা উঠছে তার একটা হিসেব সে প্রথম থেকেই মনে মনে রাখবার চেষ্টা করছে।

গোকুলবাবুর চিৎকার, তাঁবুর সাজসজ্জা, মালার মতন আলোর সারি ও কলরব শীতের সন্ধ্যায় একটা অদ্ভুত পরিবেশ রচনা করে তুলেছিল। ক্লান্ত শ্রমিক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার শিশুসুলভ কৌতূহলের বশেই ভিড় করেছিল বাহাদুরের সামনে—গ্যালারির টিকিটের কাউণ্টারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঠের হালকা চেয়ারেও কিছু-কিছু দর্শক ছিল। তারা পাড়ার মাতব্বর। জোর করে নিমন্ত্রণ আদায় করেছে। তাহলেও দুপুরের চেয়ে রাতের খেলার দর্শক অনেক বেশি। পুরোপুরি লোকসান না খেয়ে আর কয়েক দিন এ অঞ্চলে জুয়েল সার্কাস ক্যাম্প সাজিয়ে রাখতে পারবে ঠিক।

তাঁবুর প্রবেশ পথের মুখে লাল ভেলভেটের ভারী পর্দা ঝুলছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর এক ম্যানেজার সুবলবাবু। রোগা, খুব লম্বা। ফজলী আমের মতন মুখ। সারাদিন ছুটোছুটি করে সুবলবাবু এখন বড় ক্লান্ত। থেকে থেকে সে হাই তুলছে এবং শীতের জন্যে মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে কাতর শব্দ করছে।

কালো প্যাণ্ট আর সুতির সাদা কোট পরে প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছে সুবলবাবু। টিকিট পরীক্ষা করে স্রাক করে পর্দা সরাবে। তখন ভেতরে ঢুকবে দর্শক। সার্কাসের রিং দেখতে পাবে।

সুবলবাবু কালো প্যাণ্টের চামড়ার বেল্টে সরু চেইনে একটা হুইসেলও বাঁধা আছে। খেলার আগে-আগে এবং শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই খুব জোরে সে বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

"এ ভাইয়া টিকিট? হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়। যাও ভিত্তর—ডাহিনা—"

সুবলবাবুও এবার তাঁবুর ভেতরে উঁকি মারল। ব্যাণ্ডের সকলে মাচার মতন উঁচু জায়গায় এসে বসেছে। রিং-বয়রা ধরাধরি করে বড় একটা টেবিল বয়ে আনছে। খেলার কিছু অদল-বদল করেছে বোধহয় প্রোগ্রাম মাস্টার। রিং-এর ভেতর টেবিল দেখেই সুবলবাবু বুঝে নিল আজকের প্রথম খেলা প্লাস্টিক গার্ল কাঞ্চী রায়ের। টেবিলের মাঝখানে একটা ছোট ফুলদানীও ছিল, থুতনিতে ভর করে তার ওপর পীকক হবে কোম্পানীর কিশোরী মেয়ে কাঞ্চী।

ঘচ ঘচ টিকিট ছিঁড়ছে সুবলবাবু, পর্দা সরিয়ে দর্শকদের ভেতরে যেতে দিচ্ছে। এক-একবার অপ্রসন্ন মুখে ঘড়ি দেখছে এবং হাত দিয়ে ঠাণ্ডা হুইসেল চেপে ধরছে। খেলা শুরু হতে আরও কিছু সময় বাকি।

"আরে আরে, মশাই দাঁড়ান—" সুবলবাবু হাত মেলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে টিকিট গুনতে গুনতে বলে, "সাতটা টিকিট—ক'জন আপনারা? এক দুই তিন—"

সুবলবাবুর এই রকম জেরায় প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়,

তিনি শাসন করবার মতন গলায় বলে ওঠেন, "চুরি করে আপনার এই ছাতার সার্কাস দেখতে আসিনি। শুনলেন তো? হয়েছে?"

সুবলবাবু নিজেকে সংযত করে মধুর করে হাসে, "এই আমার কাজ কি-না! যান—ভেতরে যান—" পর্দা তুলে সে খুব মিষ্টি করেই বলবার চেষ্টা করে।

তাহলেও রাগ নিভে যায় না ভদ্রলোকের, কর্কশ স্বরে বলতে থাকেন, "ছেলেমেয়েগুলোও হয়েছে যেমন! একটুও দরদ নেই বাপ-মার ওপর। খাওয়া জোটাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, তা-ও সার্কাস দেখাতে হবে! ও মশাই, কবে বিদেয় হবেন এ তল্লাট থেকে বলুন তো?"

"এইবার চলে যাব স্যার, আর মোটে কয়েকটা দিন", আরও লোক এসে যায় বলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুবলবাবু, ক্ষিপ্র হাতে অন্যদের টিকিট পরীক্ষা করতে থাকে।

বাইরে থমথমে গভীর রাতের মতন ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া—তাঁবুর ভিতরে শীত নেই, প্রথম বসন্তের মতন মৃদু একটা উত্তাপ লেগে আছে। অনেক আলো, বিদ্যুতের এক-একটি প্রশস্ত রেখা ছিটকে পড়েছে রিং-এর ভেতরে ও বাইরে। দর্শকদের হাসি উত্তেজনা উচ্চস্বর এবং গোকুলবাবুর পুনঃপুনঃ ঘোষণা ও আমন্ত্রণে গোটা তাঁবুটাই এখন যৌবনের ভারে টলোমলো করছিল।

একটা কৌতূহলও আস্তে আস্তে ফেনিয়ে উঠছিল অত্যধিক উজ্জ্বল রিং-এর কেন্দ্রস্থলে—আর কত পরে আসবে আগুনের ফুলকির মতন মেয়েরা স্বল্প পোশাকে খেলা দেখাতে। কখন আসবে বাঘ হাতি উট ভাল্লুক। ক্লাউন হাসাবে কখন! দর্শকরা কখনো-কখনো ব্যাণ্ডের দলের দিকে তাকিয়ে আপাতত তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার চেষ্টাও করছিল।

শো আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই নিয়ম মতন ব্যাণ্ডমাস্টার মণিবাবু নিজের জায়গায় এসে বসেছে। তার ট্রুপের হীরু মোহনলাল শ্যামল—এরাও আছে। স্যাকস্ গীটার ট্রামপেট ক্ল্যারিওনেট আর জ্যাজ ড্রাম ম্যাটিনি শো'র আগে থেকেই এখানে রাখা আছে। রাতের খেলা হয়ে গেলে যে যার বাজনা সরিয়ে নিয়ে যাবে।

চুপচাপ বসে-বসে ঘুম এসে যাচ্ছিল মণিবাবুর। হীরু আর শ্যামলও ঢুলছে। একমাত্র মোহনলালই মনে মনে কাজ করে যাচ্ছিল। গীটার কোলে তুলে নিয়ে সে ভাবছিল, আজ সন্ধ্যায় হাসি যখন নম্বর করবে তখন কোন গানের সুর বাজাবে। তার খেলার সময় নতুন-নতুন সুর তোলে মোহনলাল। এক-একদিন এক-এক রকম। খেলতে খেলতে হাসি তার দিকে একবার চোখ ফেরাবেই। হাসবেও। যমুনার বোন, রাধানাথবাবুর ছোট মেয়ে হাসি।

দর্শকদের হৈ চৈ-এ চোখ পিট পিট করল মণিবাবু। জ্যাজ ড্রামে একটা থাবড়া মেরে উঠে দাঁড়িয়ে হাত ও পা টান-টান করে ঘুমের আমেজ কাটাতে-কাটাতে আপন মনেই বলে উঠল "খিদে পেয়েছে।"

হীরু বলল, "চা বিস্কুট আনিয়ে নাও না মণিদা, আরও দশ-বারো মিনিট তো আছে—"

"আরে দূর, ওসবে কী হবে! সেই কখন খেয়েছি, পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে! বাজার মাস্টারটাও হয়েছে যেমন! একের নম্বর হারামি—"

মণিবাবু আরও বিশেষণ প্রয়োগ করবার আগে, তার কথার মাঝেই শ্যামল

বলে উঠল, "বেটা বাজারে যায় বেলা বারোটার সময়, পচা-সড়া তরকারি কিনে কী পয়সাটাই মারে রোজ-রোজ!"

"তা মারে মারুক", গলার স্বর খুব নিচু মণিবাবুর, ক্ষুধার্ত মানুষের মতন করুণও, "টাকা করার সুযোগ-সুবিধে যখন পেয়েছে, করুক না—বেটার জামা-কাপড়ের জেল্লা দেখিসনি? হাতে আবার নতুন ঘড়ি—"

"সব আমাদের পেট মেরে। বেটার চেহারা দেখলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে মাইরি—মুখে লাথি মারতে ইচ্ছে করে।"

মণিবাবু একটা বিড়ি মুখের কাছে আনল, আঙুল দিয়ে সুড়সুড় করে ঘোরাল শুধু, দেশলাই বের করে এখন ধরাল না, "পচা-সড়া তরকারি হোক, তা-ও খেতে রাজি—কিন্তু আলু কুমড়ো বেগুনের ঘ্যাঁটটাও নুনে একেবারে পুড়িয়ে দেয় রে। খাই কেমন করে বল?"

হীরু রাগ-রাগ মুখ করে বলল, "একদিন হল্লা-টল্লা করলে হয় না? হারকু সাহেবের কাছে লাগাবে নাকি?"

মণিবাবু বিরস মুখে হাসল, "দেখ না লাগিয়ে! ঘোড়ার আন্ডা হবে। তোকেই দেবে তাড়িয়ে। ভেতর-ভেতর সাপ্লাই-এর ব্যাপার আছে, জানিস না?"

"কীসের সাপ্লাই?"

"তা-ও জানিস না বুদ্ধু?" এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাসতে গিয়েও মণিবাবু হাসল না, চাপা স্বরে হিস হিস করে উঠল, "কোম্পানীর ছুঁড়িদের খাবারের থালাগুলো লক্ষ করবি—উঃ, যেন বিয়ের তত্ত্ব যাচ্ছে! ওদের খাইয়ে-দাইয়ে তাজা করে, তারপর ঠেলে দেয় হারকু সাহেবের কাছে। ব্যস, মুরগীর মতন জবাই।"

গীটারের তারে দ্রুত আঙুল ঘষছিল মোহনলাল। এত সময় কিছু বলেনি, চুপচাপ থেকে এদের কথা শুনছিল। এখন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে নখ দিয়ে তারে খোঁচা মারল এবং প্রতিবাদের মতন বলল, "তেমন মেয়ের পাল্লায় পড়লে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে বদমাশকে।"

"আরে থাম! ওসব ঢের দেখা আছে। সার্কাসের মেয়ের আবার রোয়াব!" এত পরে ফস্ করে দেশলাই জেবলে বিড়ি ধরিয়ে নিল মণিবাবু। পেটে খিদে ছিল বলে টানতে ভাল লাগল না, কিছু পরে বিড়ি আপনিই নিভে গেল। তা হলেও সেটা ফেলে দিল না মণিবাবু, হাতে নিয়েই বলল, "বেচারি দুঃস্থ মেয়েরা করবেই বা কী বল? পেটের দায়ে এসেছে সার্কাসে, যে ভাল খেতে দেবে তার সাথে শুতে আর বাধা কী!"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মোহনলাল। মণিবাবুর এই উক্তি তার একেবারেই মিথ্যে বলে মনে হল। ভরা-ভরা গ্যালারি, দর্শকদের গোলমাল, থেকে থেকে সিংহর কাতর গর্জন—এসব দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে কিছু সময় ইতস্তত করে হঠাৎ বলে ফেলল মোহনলাল, "সব মেয়েই সমান নয়।"

তার কথা শুনে হীরু আর শ্যামল হেসে উঠল। মণিবাবু হাসল না, মোহনের গায়ে আস্তে হাত রেখে অভিভাবকের মতন খুব কোমল স্বরে বলল, "সব মেয়ে মানে—তুই হাসির কথা বলছিস তো?"

মোহনলাল গীটারের দিকে চোখ রেখে আবার কিছু সময় চুপ থাকল। এবং পরে হীরু ও শ্যামলের মুখে হাসি দেখে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "শুধু

হাসি কেন, যমুনাও তো আছে—ওদের কাছে যাক না একবার হারকু সাহেব—জুতোর বাড়ি খেয়ে ফিরে আসতে হবে।"

এত পরে মণিবাবু হাসল। তার হাসি বিদ্রূপের নয়, করুণার মতন। এখন থেমে থেমে খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল মণিবাবু। তার হাত তখনো মোহনলালের গায়েই ছিল, "দেখ মোহন, তুই হাসিকে নিয়ে বড় মজে গেছিস। মনটা বড় নরম তো তোর, নতুন এসেছিস—বয়সও অল্প। একটা কথা বলি শোন, সার্কাসের মেয়ে নিয়ে লটকে যাস না—মরবি।"

"সার্কাসে দায়ে পড়ে এসেছে বলে তারা কি মানুষ নয়?"

গলার স্বর বেশি সময় নিচু থাকল না মণিবাবুর, মোহনলালের গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে চড়া গলায় বলল, "বুঝবি—বুঝবি রে বুর্বক। রাধানাথবাবু ঝানু লোক, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।"

মণিবাবুর এসব কথা শুনতে ভাল লাগছিল না মোহনলালের। এত পরেও সে রাধানাথবাবুর হয়েই খুব জোরে বলে উঠল, "মানুষটার দোষের মধ্যে শুধু মদ খায়, তা কত লোকেই তো খায়—"

"টাকা ধার নেয়নি তোর কাছ থেকে?"

দোষ স্বীকার করার মতন ভঙ্গিতে মুখ নামিয়ে মোহনলাল খুব আস্তে বলল, "না-না।"

"নাঃ, নেয় নি, মেয়েকে অমনি ঠেলে দিচ্ছে তোর দিকে," পেটে খিদে ছিল বলে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল মণিবাবুর, "টাকা ফেরৎ চেয়ে দেখ না একবার, দুলালের মতন অবস্থা হবে।"

"কে দুলাল?"

"ফ্রগ অ্যাক্ট যে দেখাত রে। দুলালের কথা মনে নেই? ও হো, তুই তখন আসিসনি। রাধানাথবাবুকে টাকা ধার দিয়ে ফেরত চাইতে গেছিল বেচারি! ব্যস, যমুনা বলে, দুলাল তাকে রাতে রাউটিতে ডেকেছে। লাগাও হারকু সাহেবের কাছে। মেয়েমানুষ লাগিয়েছে, আর কী স্থির থাকে হারকু সাহেব? নিরীহ ছেলেটাকে মেরে তাড়িয়ে দিল মাইরি—"

গীটারটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। তারগুলো চোখা, নিষ্প্রাণ। মোহনলালের হাতও অবশ হয়ে এসেছিল। যে-সুর আজ সে হাসির নম্বরের সময় বাজাবার ইচ্ছায় মনে মনে একটা জাল বুনে চলেছিল এখানে এসে বসবার পর-পরই, এখন তা ছিঁড়ে গেছে। দাহর মতন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা তাকে বড় অস্থির করে তুলছে। চারপাশ ঝাপসা, নিষ্প্রভ। মণিবাবুর পাশে বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছিল মোহনলালের।

এখনো লোক আসছে। থেকে থেকে লাল ভেলভেটের পর্দা উঠছে নামছে। রিং-এর ভেতরে একটা স্ট্যাণ্ড ঠিক মতন বসাবার জন্যে জোরে জোরে হাতুড়ি পিটছে বয়রা। থেমে থেমে কর্কশ আওয়াজ উঠছে।

খেলার সময় হয়ে এল। কিন্তু মোহনলাল পক্ষাঘাত রুগীর মতন অসাড়--তার মাথার মধ্যে হাতুড়ির আওয়াজের যন্ত্রণাদায়ক প্রতিধ্বনি ছাড়া এখন আর কিছুই নেই।

ব্যাণ্ডমাস্টার মণিবাবু যেমন তার ট্রুপ নিয়ে তাঁবুর ভেতরে বসে আছে তেমন সার্কাসের আর সব ছেলেমেয়ে তৈরি হয়ে হয়তো বাইরে অপেক্ষা করছে। সুবলবাবু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক উল্টো দিকে, রিং-এর ওপারে আর্টিস্টদের প্রবেশ পথ। সেখানেও একটা ভারী লাল পর্দা ঝুলছে।

নম্বরের আগে-আগে পুজোর মতন ঘণ্টা বাজায় প্রোগ্রাম মাস্টারের সহকারী। রিং-বয়রা পর্দা সরিয়ে দেয়। জোরে বেজে ওঠে স্যাকস ক্ল্যারিওনেট ট্রামপেট কিম্বা জ্যাজ ড্রাম। আর্টিস্ট রিং-এ প্রবেশ করে ঠোঁটে হাসি খেলিয়ে ছুটতে ছুটতে।

কালির ভীম শিবনাথ ছাড়া আর কেউই আস্তে আস্তে হেঁটে রিং-এ প্রবেশ করে না। এমন কি, হাতি উট ও ভাল্লুক রিং মাস্টারের সঙ্গে দৌড়ে দৌড়েই আসে। বাঘ সিংহর খাঁচাও বড় তাড়াতাড়ি ঠেলে আনা হয়। মানুষের মতন জন্তু-জানোয়ারও সার্কাসের আর্টিস্ট। এবং সব আর্টিস্টদের প্রবেশ পথ ওই একটিই।

লাল ভারী পর্দার এদিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। কাঠের বেঞ্চ, ছোট ছোট টুল, কয়েকটা চেয়ার এপাশে-ওপাশে পড়ে আছে। কাছেই আর্টিস্টদের তাঁবু। এখন সব তাঁবুতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। রাত দশটার পর আলো নিভে যাবে, তখন দরকার মতন যে যার মোমবাতি কিম্বা কেরাসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে রান্না করবে, মদ-গাঁজা টানবে, জুয়ো খেলবে। এসবই করতে হবে লুকিয়ে-লুকিয়ে, তাঁবুর পর্দা ভাল করে টেনে। গোলমাল মারামারি হলে হারকু সাহেব তাড়া দেবে, শাসন করবে।

শেষ রজনী আসার আগে-আগে তাঁবু যখন ঝিম ঝিম করে এবং রিং-ও জুড়িয়ে আসে তখন খেলার কিছু কিছু পরিবর্তন করে প্রোগ্রাম মাস্টার। দু-একটা দুরূহ নম্বর বন্ধ করে আর্টিস্টদের বিশ্রাম করবার সুযোগ দেয়, কিছু খুব পুরনো খেলা চালিয়ে বুড়ো খেলোয়াড়দের আবার আসরে টেনে আনে।

রাঘবন আজ দুপুরে ড্যাগার থ্রো করেছিল। কাঠের একটা বোর্ড ঘুরছিল আস্তে আস্তে, সেখানে সেঁটে ছিল রেবতী। এক-একটি ধারালো ছোরা কাঠে বিঁধছিল। শব্দ হচ্ছিল খট খট। এখনো লক্ষ অব্যর্থ রাঘবনের। অক্ষত শরীরে কাঠের বোর্ড থেকে নেমে এসেছিল রেবতী, দর্শকদের অভিবাদন করেছিল।

পর্দার আড়ালে আর্টিস্টদের প্রবেশপথের মুখে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল রাঘবন। তার নীরস কঠিন চেহারাও এখন বড় তাঁবুর মতন ঝকমক করছে। রাঘবনের গায়ে টেরিলিনের দামী সাদা সার্ট, গাঢ় নীল কোট, গলায় বো। বুকপকেটে নিখুঁত ভাঁজ করা রুমাল। রাঘবন এখন তার মুখ হাসি হাসি করে তোলবার চেষ্টা করছিল কেননা আর কিছু পরেই তার ট্রুপের ছেলে-মেয়েদের খেলার সময় তাকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে রিং-এর মাঝখানে। স্পট লাইটের তীব্র আলো তার মুখেও ঝলসাবে। দর্শকরা তাকেও দেখবে।

রাঘবনের পাশেই ছিল হেমলতা আর শ্রীধরন। আমিনা রেবতী আর নলিনী কিছু দূরে নিচু হয়ে দু-চাকার সাইকেল নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। শুধু গোলাপী সাটিনের কাঁচুলি আর জাঙিয়া পরেছে বলে বয়েসের চেয়ে অনেক বড় লাগছে—প্রথম যৌবনের কিছু মাদকতা জোর করে যেন বুকে-পিঠে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের।

টুল বেঞ্চ ও চেয়ার খালি। আর কোন আর্টিস্ট এখানে নেই এখন। যদিও চুক্তিপত্রে লেখা থাকে খেলা আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছু আগে সকলকে তৈরি হয়ে তাঁবুর বাইরেই নম্বরের অপেক্ষা করতে হবে। তা হলেও এ সব নিয়ম-কানুন বেশি কেউ মানে না, সময় মতন চলে আসে ঠিক।

লীলা আসেনি এখনো। হাসি যমুনাও নেই। শিবনাথ সুরেষ্ সিং করালীকান্ত গোপাল—এরা কাছাকাছি তাদের তাঁবুতেই আছে। কোম্পানীর বড় মেয়েদেরও কোন ব্যস্ততা নেই। দুপুরের খেলার পোশাক তারা ছাড়েনি, শুয়ে-বসে তাঁবুতে বিশ্রাম করছে।

রাঘবন কড়া লোক। চুক্তিপত্রে যেসব নিয়ম-কানুন মেনে চলবে বলে সই করেছে তা পালন করে অক্ষরে অক্ষরে। তার কাজের কোন ত্রুটি রাখতে চায় না। ট্রুপের ছেলেমেয়েদের নম্বর অনেক দেরিতে হলেও রাঘবন তাদের তাঁবু থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে এসেছে হিম, ঠাণ্ডা, হাওয়া—সব অগ্রাহ্য করে।

"এ হেম", রাঘবন হেমলতার হাত ধরে তাকে একটা আলোর নিচে নিয়ে এল, তার থুতনিতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ফোলা ঠোঁট দেখতে দেখতে বড় কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল, "এখনো খুব ব্যথা করছে না কী রে?"

"না না মাস্টার", ভয়ে ভয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়ল হেমলতা, যদিও তার জ্বর-জ্বর লাগছিল—টলে পড়ে যাবার মতন মনে হচ্ছিল।

"ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছি, দু-একদিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে", একটু চুপ করে থেকে রাঘবন বলল, "দুপুরে নম্বর করবার সময় খুব কষ্ট হল তোর?"

রাঘবনের মুখের দিকে ভীত চোখ তুলে দেখল হেমলতা, অল্প ইতস্তত করে কিছু পরে বলল, "না মাস্টার।"

রাঘবনের কাছে স্বীকার না করলেও দুপুরে খেলবার সময় খুবই যন্ত্রণা হচ্ছিল হেমলতার। তার ঠোঁট জ্বলে যাচ্ছিল, এপাশে-ওপাশে ঘাড় ফেরাবার সময় মাথার মধ্যে টনটন করে উঠছিল। তাহলেও ফোলা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে যথা সময় বুকে হাত রেখে অনেক উঁচু থেকে জলে ডাইভ দেওয়ার মতন নেটের ওপর লাফিয়ে পড়েছিল হেমলতা।

দুপুরের শো'তে হেমলতা রিভলভিং ট্র্যাপিজ নম্বর করেছিল। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে গিয়েছিল অনেকটা ওপরে। নিচু হয়ে জুতোয় গাঁথা হুক টেনে সোজা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ট্র্যাপিজের লোহার রডের ফাঁকে। তারপর দু হাত সোজা করে সামারসলট খেয়ে তাকে পর পর অনেকবার ঘুরতে হয়েছিল।

হেমলতার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল রাঘবন। কিছু পরে বলল, "তোর শরীর ঠিক নেই। যা, রাউটিতে গিয়ে শুয়ে থাক—"

রাঘবনের কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না হেমলতা। বিমূঢ়ের মতন সে তাকিয়েছিল তার দিকে। হেমলতার মনে হচ্ছিল, মাস্টার বোধ হয় তার অক্ষমতার জন্যে রেগে আছে।"

"আমি ভুল করব না মাস্টার, আমি নম্বর করতে পারব—"

রাঘবন হাসল, "নিশ্চয়ই পারবি। টৌলিচারির মেয়ে না তুই! তবে আজ যা, চুপচাপ শুয়ে থাক—এ শ্রীধরন, তুইও যা, রিভলভিং ট্র্যাপিজের জুতো পরে আয়। হেমলতার ওই নম্বর আজ তুই করবি। যা যা, ছুটে যাবি আর আসবি। বেশি টাইম নেই রে। এখুনি সিটি পড়বে।"

কোম্পানীর ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে টুনি মাসি। আপনমনেই গজগজ করছে, "ঢ্যাঁটা মেয়েগুলোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। এদের নড়তে-চড়তে ঘণ্টা কাবার! ওরে ও মঞ্জু শুনলি, সাজ-পোশাক কাল থেকে নিজে নিজেই করবি। গোগ্রাসে গিলতে পারিস আর গালে-ঠোঁটে

একটু রঙ মাখতে গেলে হাত চলে না কেন তোদের, য়্যাঁ?...যত্ত ঝক্কি এই কিশোরীটার—" টুনি মাসি তার পিঠে হাত দিয়ে জোরে ঠেলে দেয় তাকে, "এই, একটু পা চালিয়ে চল না। রাতদিন শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর আর শরীর খারাপ—"

তাঁবুর বাইরে বেঞ্চের ওপর বসে থাকে টুনি মাসি, কোম্পানীর ছোট ছোট মেয়েদের আগলে রাখে। রিং-এ কখনো যেতে হয় না তাকে। তাহলেও ঠোঁটে গালে বেশ ঘন করে রঙ বুলিয়েছে টুনি মাসি। পুরো হাতা গরম ব্লাউজ পরেছে। তার ওপর সাদা শাড়ি, নক্সা কাটা সবুজ পাড়। নকল মুক্তোর একটা মালাও চিকচিক করছে তার গলায়।

টুনি মাসির আগে আগে দু-চাকার সাইকেলে আস্তে আস্তে ঘুরছিল বেলা আর শান্তা। কোম্পানীর পনের-ষোল বছরের দুজন মেয়ে। দুপুরের শো'র পর কিছু সময় ঘুমিয়ে নিয়েছে, এখনো ঘোর কাটেনি।

দু-একবার হাই তুলল শান্তা। আর এক ভাঁড় চা এ সময় পেলে বড় ভাল হত। কিন্তু সার্কাসের ড্রেস পরে রসড়ার দিকে যাওয়া চলে না, বাজার-মাস্টার ঠাট্টা তামাশা করে, টিটকিরি দেয়।

টুনি মাসির পিছনে আছে গোপাল আর করালীকান্ত। দুজনেই ঘাড়ে গলায় মুখে সাদা-কালো রঙের পোঁচ বুলিয়েছে। ঢলঢলে পোশাক। হাতে ক্লাউনের বিশেষ ছড়ি। বাড়ি মারলেই চরর্-চরর্ শব্দ হয়। বামন গোপাল পুরু গোঁফ সেঁটেছে, পাগড়িও বেঁধেছে। করালীকান্তর মাথায় পরচুলা, গলায় একটা সবুজ রুমাল বাঁধা। মুখ বড় গম্ভীর তার, মন হালকা করবার জন্যে সে ঘন ঘন বিড়ি টানছিল।

"একটা বিড়ি পাব স্যার?" করালীকান্তর সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে মাঝে মাঝে ছুটতে হচ্ছিল গোপালকে।

করালীকান্ত গোপালের কথার উত্তর দিল না। বিড়ি ঠোঁটে চেপে হাত দিয়ে পরচুলা মাথায় ঠিক করে বসিয়ে নিল। বড় শীত লাগছিল তার। ঢলঢলে পোশাকের নিচে পুরনো ছেঁড়া সোয়েটার গেঞ্জির মতন মনে হচ্ছিল।

"ও করালীদা—"

"থাম! পরের পকেট মেরে বিড়ি ফুঁকতে লজ্জা করে না তোর? আমার ক'টা বিড়ি মেরেছিস আজ সারাদিনে বল?"

"কালীর দিব্যি—"

"থাম থাম! দেব না বিড়ি, যাঃ—" কিছু পরেই টুনি মাসির সামনে টুলের ওপর বসে গোপালকেই খোঁজে করালী, "গোপাল, ও গোপাল! রিং-এ যাবার আগে অভিশাপ দিসনি বাপ আমার! এই নে বিড়ি। দেশলাই আছে, না চাঁদমুখে আগুনও দিতে হবে?"

গোপাল হেসে বলে, "তোমার মতন মানুষ হয় না করালীদা—এক্কেবারে ঝুনো নারকেলের মতন। বাইরে কাঠখোট্টা, অন্তরে মধু—" করালীকান্তর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে তার মুখের কাছে মুখ এনে সে আঙুল নাড়ে, "এ পোড়ার মুখে আগুন তুমিই দাও করালীদা—"

গোপালের কপালে দেশলাই দিয়ে মৃদু আঘাত করে চড়া স্বরে করালী-কান্ত বলে ওঠে, "ভাগ!"

তাঁবু থেকে বার হওয়ার আগে আয়নায় আর একবার মুখ দেখল লীলা। ঘন পাউডারের পাফ বুলোল হাতে, গলায়। ফুলের মতন করে মাথায় লাল

রিবন বাঁধল। ক্যাম্প খাটে একটু গড়িয়ে নিয়েছিল বলে ফাঁস খুলে এসেছিল রিবনের।

বড় তাঁবুর কাছাকাছি আসতেই লীলা হাসি আর যমুনাকে দেখে অন্য দিকে তাকিয়ে না দেখার ভান করল। যমুনা কিন্তু দূর থেকেই অনেক সময় চোখ রাখল লীলার মুখ ও বুকের ওপর।

কোন দরকার না থাকলেও পায়ের কাছে রাখা একটা বড় মই-এ একটু বেশি শব্দ করে কয়েকবার চাপ দিল যমুনা। একা একাই সে উষ্মা প্রকাশ করল। ইচ্ছে হলেও সে তার মুখ দেখতে পারল না, চোখ নিচু করে বুক দেখল। এবং মনে মনে গাল দিল রাধানাথবাবুকে। যমুনার সব পয়সা মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয় তার বাবা। পছন্দ মতন একটা জিনিসও তার কেনা হয় না। হঠাৎ মুখ বড় করুণ হয়ে এল যমুনার।

খুব জোরে হুইসেলে ফুঁ দিয়েছে সুবলবাবু। এখন খেলার সময়।

॥ ছয় ॥

প্রোগ্রাম মাস্টার নোয়েল খান। সে শুধু মোটর বাইকের নম্বর করে না, খেলা শেখায় সার্কাসে যারা নতুন আসে তাদের—প্রোগ্রাম পরিবেশনের গুরু-দায়িত্বও বহন করে। দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে-করে আস্তে আস্তে সে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে একটা সুন্দর পরিবেশ। ধীর বুদ্ধির দায়িত্বশীল মানুষ জুয়েল সার্কাসের প্রোগ্রাম মাস্টার নোয়েল খান। তার আর এক নাম নোয়েল সাহেব।

সার্কাস থিয়েটার কি সিনেমা নয়, যে একটা কাহিনী ঠিক হয়ে থাকবে প্রথম থেকেই এবং তারই সূত্র ধরে সাজান হবে এক-একটি দৃশ্য। সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীদের রুটিন মতন আসা-যাওয়া অল্প-অল্প করে সেই কাহিনী শুনিয়ে দেয় দর্শকদের। জীবনের কোন বিশেষ দিকের ইঙ্গিতও দিয়ে যায়;

সার্কাসের শিল্পীদের তেমন কোন ইঙ্গিত দেয়ার অবকাশ নেই। কোন সূক্ষ্ম অনুভূতির তারে সিনেমা-থিয়েটারের শিল্পীদের মতন তারা নাড়া দিতে পারে না। কথা থাকে না তাদের মুখে, দু' নয়নে বিলোল কটাক্ষ ছুঁড়ে মেরে দর্শক সাধারণের চিত্ত জয় করে নিতেও পারে না। মান অভিমান মিলন বিরহ চুম্বন আলিঙ্গন—মনের এমন টুকরো-টুকরো প্রকাশ সার্কাসের রিং-এর ভেতরে ফুটে ওঠে না বলেই সীমিত সেই বিশেষ শিল্পীদের জগৎ—অবহেলিতও।

মুখের কথা দিয়ে না, চোখের ভাষা দিয়ে না, মনের কোন অনুভূতির অস্ফুট প্রকাশ দিয়েও না, শুধু দেহকে ভেঙে বেঁকিয়ে খেলিয়ে-খেলিয়ে ভরে তুলতে হবে দর্শকদের চিত্ত রাতের পর রাত—দিনের পর দিন।

কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে দেহকে সবল ও সুন্দর করে তোলে সার্কাসের যে শত শত মানুষ—মৃত্যুকে পায়ে চেপে খুশি মতন যারা খেলা দেখিয়ে জীবনকে করে তোলে দুঃসাহসী, বে-পরোয়া—তারা কি সত্যিই আর্টিস্ট?

বস্তুত, সার্কাসের কোন খেলাই স্বচ্ছন্দ ও বিপদমুক্ত নয়। যে-কোন

মুহূর্তে যে-কোন মানুষের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে—জন্মের মতন পঙ্গু অক্ষম হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেকথা রিং-এর মধ্যে এসে কখনো মনে হয় না সার্কাস-আর্টিস্টের। কেননা তাদের খেলা জীবনেরই খেলা, মৃত্যুর খেলা নয়।

মূলত দেহসৌষ্ঠবের ওপর নির্ভর করলেও প্রোগ্রাম মাস্টার নোয়েল খান স্পষ্ট করেই জানে যে সার্কাস শুধু ব্যায়ামের প্রদর্শনীও নয়। কোন কাহিনী না থাকলেও, ভূমিকার প্রয়োজন আছে সার্কাসেও। শুরু আছে, মধ্য পথ আছে এবং শেষ তো আছেই।

প্রোগ্রাম পরিবেশনের কাজ বড়ই কঠিন। এক-এক সময় এক-এক অনুভূতি জাগাতে হবে দর্শকদের মনে। তাদের নয়ন ক্লান্ত হবে না। শেষ অবধি এমন একটি স্বাদ গ্রহণ করবে দর্শক যা ঠিক সিনেমা-থিয়েটারের কাহিনীর মতন না, কিন্তু একেবারেই ভিন্ন, অদ্ভুত—তা একটি নতুন কাহিনীই।

নোয়েল খান বড় সতর্ক, ঈষৎ শঙ্কিতও। কে আসবে প্রথমে? তারপর কে? এবং তারও পরে? মানুষ না জানোয়ার? হাতি না উট? বাঘ না সিংহ? ক্লাউনরা কি আরও বেশি আসবে? না কম? কতদিন পর কিছু-কিছু পরিবর্তনের দরকার প্রোগ্রামের?

সকালবেলা তাঁবুতে বসে অনেক সময় কলম দাঁতে কামড়ে রাখে নোয়েল খান। সাদা একটা কাগজ সামনে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খসখস করে লেখে আর কাটে। মোটামুটি প্রোগ্রাম সাজানো হলে সেই কাগজ সে পাঠিয়ে দেয় আর্টিস্ট-দের তাঁবুতে-তাঁবুতে—সই করিয়ে নেয়।

"প্লাস্টিক গার্ল কাঞ্চী রায়! তাঁবুর ভিতরে উপস্থিত লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা! কুমারী কাঞ্চীর অত্যাশ্চর্য ক্রীড়া কৌশল দেখুন! এই খেলা এতদিন আপনারা দেখতে পেতেন কেবলমাত্র পৃথিবীবিখ্যাত রাশিয়ান সার্কাসে। কাঞ্চী রায় রাশিয়ান সার্কাসের সে-অহঙ্কার ভেঙে দিয়েছে।

জুয়েল সার্কাসের অত্যাশ্চর্য প্লাস্টিক গার্ল কুমারী কাঞ্চী রায়!"

মাইকের খুব কাছে মুখ এনে যাকে লক্ষ করে এত কথা বলে যাচ্ছিল গোকুলবাবু সে এসব শুনল না। চিৎকারের মতন কিছু-কিছু তার কানে ভেসে এলেও গোকুলবাবুর বিজ্ঞাপনের অর্থ বুঝল না কাঞ্চী—তার বোঝবার কথাও নয়।

সুবলবাবুর বাঁশির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘণ্টা বেজে উঠল এবং আর্টিস্টদের প্রবেশ পথের মুখে যে লাল ভারী পর্দা এত সময় স্থির হয়ে ছিল, একটা প্রবল ঝাপটায় তা সরে গেল। কাঞ্চী তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখন ছুটে-ছুটে এগিয়ে যেতে লাগল রিং-এর দিকে। খালি গা। রুপোলি জরির কাজ করা ঘন নীল রঙের জাঙিয়া তার পেটের নিচে সেঁটে আছে। মাথায় নীল রিবন, টুনি মাসি বেঁধে দিয়েছে।

দর্শকরা কিছু চঞ্চল। স্পষ্ট করে কাঞ্চীর মুখ দেখবার জন্যে কেউ-কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তাদের চোখ ও মন খেলা দেখার আগ্রহে উৎসুক। তারা চিৎকার করছিল, রিং-এর দিকে তাকিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করছিল।

ক্লারিওনেট বাজছে এখন। ড্রামের আওয়াজ কতকটা মাদলের মতন। রিং-এর মাঝখানে যে টেবিল ছিল তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পালটি খাওয়ার

আগে শুকনো হাসল কাঞ্চী, হাতের মুদ্রা করে অভিবাদনের ভঙ্গি করল। তার হাসি দর্শকদের জন্যে ফুটে উঠলেও একটি মানুষের মুখও স্পষ্ট করে দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল না কাঞ্চী রায়ের। সে বড় সতর্ক হয়ে ছিল—পর-পর কোন কোন খেলা দেখাতে হবে তা ভাবতে-ভাবতে বাজনার তালে তালে পালটি খেয়ে যাচ্ছিল। ভুল করলে মাস্টার বকবে, বেত মারবে।

খেলা শেখবার সময় কাঞ্চীই বোধহয় মার খেয়েছে সব চেয়ে কম। রিং-এর মধ্যে এসে খেলা দেখানোর আগ্রহ তার প্রথম থেকেই খুব বেশি। রাজু মাস্টার যেমন দেখিয়েছে, শিখিয়েছে, নির্ভীক মেয়ের মতন একটা জেদের বশে কাঞ্চী তেমন করেছে—খুব অল্প সময়ের মধ্যে খেলা শিখে নিয়েছে।

রাজু মাস্টার বলেছে, "সাবাস!"

কাঞ্চীকে কাছে টেনে নিয়ে তার হাত টিপতে-টিপতে হারকু সাহেবও প্রশংসা করেছে, "বহুৎ আচ্ছা! বড় হলে এ সার্কাস আমি লিখাপড়া করে তোর নামেই দিয়ে দেব কাঞ্চী। তিমিলাই রামরো ছোকরী ছ!"

হারকু সাহেবের মেজাজ ভাল থাকলে উঠতি বয়সের মেয়েদের সঙ্গে বড় মধুর স্বরে কথা বলে। তাদের নামে গোটা জুয়েল সার্কাসটাই লিখে দিতে চায়। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হয়, মালিক রঘুনাথ দাস কেউই নয়, হারকু সাহেব তার খুশি মতন যাকে ইচ্ছে তাকেই সার্কাসের মালিকানা স্বত্ব লিখে দিতে পারে।

সার্কাস কাঞ্চীর নামে লিখে দিলে তার কী লাভ হবে তা বুঝে হারকু সাহেবকে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করার মতন বয়েস তার হয়নি। বয়সের চেয়ে তাকে ছোটই দেখায়। বোনলেস্ করে-করে টান-টান বুক। থুতনি বেশ ঝুলে পড়েছে, হয়তো ফুলদানের ওপর ভর করে পীকক হওয়ার জন্যেই। তাহলেও একটা শ্রী আছে কাঞ্চীর চেহারায়। টানা-টানা চোখ, তীক্ষ্ন মুখ। এ সার্কাসে টিকে থাকলে আর বছর দু-এক পরই তৈরি হয়ে উঠবে। ওর নম্বর দেখবার জন্যেই ভিড় করবে মানুষ। সেসব দিনের কথা ভেবেই তো অল্প বয়েসের মেয়েদের ভার এক কথায় নিয়ে নেয় কোম্পানী।

তবে মালিক পক্ষ বলে, সার্কাসের ছেলেমেয়েরা নাকি বড় অকৃতজ্ঞ। সময় মতন নাম এবং দাম হলে সব আদর-যত্ন উপকার ভুলে সরে পড়ে—অন্য সার্কাসে গিয়ে খেলা দেখায়।

এখন কথা ছিল না কাঞ্চীর মুখে। তার চোখে ভয় উত্তেজনা ক্রীড়া প্রদর্শনের কঠিন সঙ্কল্প কিম্বা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের উচ্চাভিলাষ—এসব অনুভূতির কোন প্রকাশও ছিল না। কাঞ্চীর মুখের ভাব পাঠরত এক মনোযোগী ছাত্রীর মতন।

টেবিলের ওপর উঠে পড়েছে কাঞ্চী। রিং বয় সরিয়ে নিয়েছে ফুলদান, তার হাতে তুলে দিয়েছে জল-ভরা কাচের একটা গেলাস। কাঞ্চী পিছনে ঘাড় হেলিয়ে তা কপালের ওপরে রাখল, হাত ঝুলিয়ে নিচু হতে-হতে শুয়ে পড়ল এবং মাছের মতন পিছলে টেবিলের এক প্রান্তে সরে এল। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। তার কপালের ওপর তখনো জলের গেলাস যেমনকার তেমন। সে এবার ছলাৎ করে সব জল ফেলে দিল মাটিতে।

আরও কিছু সময় কাঞ্চীকে থাকতে হবে রিং-এর মধ্যে। শূন্য চোখে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাস্টারের নির্দেশ মতন সে আর একবার হাত ঘুরিয়ে

হাসল। এখনো আসর ঠিক জমে ওঠেনি। কিছু-কিছু লোক আসছে। গোলমাল হচ্ছে। পর্দা উঠছে-নামছে।

সার্কাসের আসর প্রথম থেকেই জমে ওঠে না। খেলা শুরু হয়ে গেলেও লোক আসে। বারবার পর্দা তুলতে হয় সুবলবাবুকে। পরিবেশ তৈরি হয় আস্তে আস্তে, শো আরম্ভ-হওয়ার অনেক পরে। তখন স্থির হয়ে বসে মানুষ, তাদের অস্থিরতাও কমে আসে।

পরিবেশ রচনা করবার আশায় প্রথম নম্বর করবার সুযোগ নোয়েল খান দেয় না কোম্পানীর ছোট ছোট মেয়েদের, সে তাদের রিং-এর মধ্যে পাঠায় বিশৃংখল অবস্থা জুড়িয়ে দেয়ার জন্যে—দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে যে খেলা শুরু হয়েছে। এখন চুপ থাক। খুশি মতন হাততালি দাও। একে একে দেখ ছোট বড় মেয়ে, বাঘ সিংহ হাতি উট ভাল্লুক পালোয়ান! ব্যস, তোমাদের টিকিটের দাম উঠে যাবে।

কয়েকদিন আগে প্রথম খেলা ছিল অন্য রকম। রাজু মাস্টার টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ে দু-পা তুলে কাঠের বড় একটা ড্রাম ঘোরাত। তার ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসত বাণী আর মঞ্জু ঝকমকে দুটো পুতুলের মতন। রাজু মাস্টারের পায়ে রাখা স্থির ড্রামের ওপরেই তারা খেলা দেখাত কাঞ্চীর মতন। কচি নিষ্পাপ মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হত একটা দীপ্তি, যা সার্কাসের জোরালো কৃত্রিম আলোর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। স্নেহময় দৃষ্টিতে দর্শকদল দেখত বাণী আর মঞ্জুকে। হাততালির শব্দ বাজত অনেক সময়।

একবালপুর রোডের দিন ফুরিয়ে আসছে বলে লোক টানবার জন্যে প্রোগ্রামের পরিবর্তন করেছে নোয়েল খান। বাণী মঞ্জুর বদলে কাঞ্চী।

এবং তারপর?

দর্শকদের মন জানে নোয়েল। সে তাদের ক্লান্ত ও বিরক্ত হওয়ার অবকাশ দেয় না বলেই একমাত্র তারই ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভর করতে পারে হারকু সাহেব।

"তাঁবুর ভিতরে উপস্থিত লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন! এবার অসামান্য সুন্দরী লীলা আদকের অতি কঠিন ব্যালেন্সের খেলা দেখুন! এই ভয়ঙ্কর বিপদের খেলা একমাত্র জুয়েল সার্কাসেই দেখতে পাবেন।

অসামান্য সুন্দরী...সার্কাস-কুইন লীলা আদক!"

কিন্তু কোথায় সার্কাস কুইন! একটু আগেই কর্কশ ভাঙা-ভাঙা স্বরে লীলার নাম ঘোষণা করল গোকুলবাবু। এখন রিং-বয়রা ছুটোছুটি করছে—টেবিল সরিয়ে কাঠের বড় স্ট্যান্ড বয়ে আনছে।

এ সময় হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করে দর্শকদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে আসে ক্লাউন। বন্দুকের মতন লাঠি কাঁধে ফেলে এঁকে-বেঁকে রিং-এর দিকেই এগিয়ে আসছিল গোপাল আর করালীকান্ত।

"জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ! লেফট রাইট লেফট! লেফট রাইট লেফট—" রিং-এর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে করালীকান্ত, "হে—ই, হল্ট! হুকুমদার! টেন—সান! ঠন্ঠন ইজ! এই-এই-এই, ছারপোকা. সিং?"

করালীকান্তর কথা শোনে না গোপাল। বন্দুক ঘাড়ে সৈনিকের মতন রিং-এর মধ্যে ঘুরতে থাকে। করালীকান্ত তার দিকে তাকিয়ে মুখের নানা-রকম ভঙ্গি করে এবং কিছু পরে চিৎকার করে বলে ওঠে, "ডিশমিশ! নোকরি

ফট!" সে গোপালের কাছে এসে তার লাঠি কেড়ে নেয়, পিঠে ঠুকে-ঠুকে শব্দ করে, চরর্ চরর্!

এবার দর্শকদের দিকে তাকায় করালীকান্ত। গোপালের হাত শক্ত করে ধরে কয়েক পা এগিয়ে যায় এবং জোরে-জোরে বলতে থাকে, "আমার নাম জানেন আপনারা? জানেন না? ছি-ছি, কী লজ্জার কথা—মা গো!"

চরর্ চরর্ করালীকান্তর লাঠি পড়ে গোপালের পিঠের ওপর, "আমার নামটা বলে দে না রে ভাই!"

খুব মিহি গলায় গোপাল বলে, "ছারপোকা সিং—"

"এই এই এই—না না না, ওর কথা শুনবেন না। ও ক্ষুদ্র বালক—একেবারে দুধের বাছারে আমার! আমার নাম রোজ পেপারে আউট হচ্ছে। হুঁ হুঁ, আমিই সেই ইয়ে—মস্ত বড় ইয়ে—কী বলে—ভীম সিং।"

গোপালকে আদর করতে থাকে করালীকান্ত, চুমু খাওয়ার শব্দ করে বলে, "এ আমার ছোট ভাই। ছারপোকা সিং। আমার বাবার আগে হয়েছে—"

ট্রামপেট ও জ্যাজ ড্রাম এক সঙ্গে বেজে উঠল। তার আগেই নতুন নম্বরের ঘণ্টা বেজেছিল। লীলার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনির মতন একটা রোলও ছুটে ছুটে আসছে। মুখ নামিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গি করল গোপাল আর করালীকান্ত।

হাসি উছলে উঠছে লীলার চোখেমুখে। কাঠের উঁচু স্ট্যাণ্ডের একদিকে বাঁ হাতের কনুই ঠেকিয়ে অন্য হাতে সে-ও নাচের মতন মুদ্রা করল। তারপর কাঠের স্ট্যাণ্ডের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আরও ভাল করে হাসল লীলা। প্রথমে ছোট রবারের বল, পরে পিঁড়ির মতন একটা তক্তা ছুঁড়ে দেয়া হল তাকে। সে দু-হাতে পর পর দুটো জিনিসই লুফে নিল।

করালীকান্ত স্ট্যাণ্ডের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা তুলে লীলাকে দেখতে দেখতে বলছে, "এক তলা দোতলা তিন তলা! পড়ে গেলে নিমতলা ক্যাওড়াতলা।"

শুধু বাইরের দর্শকরা নয়, এই সার্কাসেরই আরও দুজন মানুষ লুকিয়ে-লুকিয়ে লীলাকে দেখছিল। গ্যালারির কাছ ঘেঁষে তাঁবুর এক প্রান্তে চোরের মতন দাঁড়িয়েছিল নবীন। কিছু চুরি না করলেও একটা উৎকট অপরাধ-বোধ তাকে বড় অস্থির এবং হিংস্র করে তুলছিল।

বেশি সময় লীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না নবীন। তাঁবুর অন্য প্রান্তে যেখানে আলো কিছু নিষ্প্রভ, অল্প অল্প অন্ধকার পিছলে আছে সেখানে লোভী শয়তানের মতন দাঁড়িয়ে আছে হারকু সাহেব। নবীন দূর থেকে তার দিকেই তাকিয়ে থাকল।

এখান থেকে অত দূরে স্পষ্ট দৃষ্টি যায় না, কিন্তু নবীন কল্পনা করে নিতে পারল হারকু সাহেবের চোখ দুটো লীলার প্রায় অনাবৃত দেহের ওপর জানোয়ারের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেননা তার দেহের এক-একটি খাঁজ বড় উগ্র ঝাঁজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল, যা মাতাল করে দেয়ারই মতন।

হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একটা নেশার ঘোরেই মনে মনে বাঘের মতন হয়ে উঠছিল নবীন এবং লীলার দেহের খাঁজগুলোর ওপর খুব মোটা একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখতে চাচ্ছিল। উত্তেজনা দমন করবার ইচ্ছায় নিজেরই পেটের কাছে কাপড়ের ওপর সে ঘন ঘন

নখের আঁচড় টানছিল।

এখনো হাসি লেগে আছে লীলার মুখে। সে রবারের ছোট বলের ওপর তক্তা রেখে তার ওপর উঠে দাঁড়াল। স্থির হয়ে দাঁড়ান যায় না, বলের সঙ্গে সঙ্গে তক্তাও এদিক-ওদিক হেলছে। তার খেলা অদ্ভুত ব্যালেন্সের। চার-পাঁচটা বল হাতে নিয়ে জাগল করল লীলা। আগুন-লাগা ছোরা নিয়ে খেলল। এক-এক খেলার পর টকটক করে এসব জিনিস ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে। বলের ওপর তক্তা, তার ওপর লীলা এদিক-ওদিক হেলছে ফনা তোলা সাপের মতন। তার দু-হাত উঁচু। পিছনে ভেঙে পড়ল লীলা। পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে তক্তার ওপর থেকে লাল একটা রুমাল তুলে নিল মুখ দিয়ে এবং পলকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাততালির আওয়াজে তাঁবু টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

লীলা সার্কাস জমিয়ে দিয়ে গেল।

চটাস্ চটাস্ চাবুকের শব্দ!

রিং-মাস্টার মদনমোহনের মেজাজ সব সময়ই রুক্ষ। তোবড়ানো গাল, অপ্রসন্ন মুখ। কারণে-অকারণে সব জানোয়ারের ওপর চামড়ার লম্বা চাবুক চালাবার জন্যে তার হাত ব্যগ্র, ক্ষিপ্ত।

রিং-এর মধ্যে ছুটে ছুটে ঘুরতে থাকে উট। কিছু অস্বস্তি অনুভব করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শক। তারা রিং-এর বড় কাছাকাছি বসেছে। হুড়মুড় করে বিরাট উট তাদের ঘাড়ের ওপর এসে না পড়ে।

চটাস্!

চাবুকের শব্দ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উট! উদাস করুণ চোখ। নাক ফুলে-ফুলে ওঠে তার। মরুভূমির রুক্ষ বালুঝড়ের ঘ্রাণ নেই কোথাও। অসহায় উট রিং-মাস্টার মদনমোহনের নির্দেশে লম্বা লম্বা পা টেনে-টেনে কিম্ভূত দেহকে কিছু হ্রস্ব করবার চেষ্টা করে এবং অন্ধের মতন পিছু হটে-হটে একটা ছোট টুলের ওপর উঠে দাঁড়ায়। শঙ্কিত চোখ উটের, তার গায়ের চামড়া সির সির করে ওঠে। চাবুক পড়বার আগেই সে হুড়মুড় করে নেমে পড়ে, আবার ঘুরতে থাকে।

চটাস্! চটাস্! চটাস্!

রিং-মাস্টার মদনমোহন উটকে লক্ষ করে চাবুক চালায় কি না কে জানে, কেন না উট ছুটে চলেছে মুখ তুলে নির্ভুল ভাবে। কিন্তু চাবুক চালাবার সময় মদনমোহনের চোখ-মুখ বড় নির্দয় ও কঠোর হয়ে ওঠে—যেন একটা মারাত্মক ভুল ঘটে গেছে এবং তা এই মুহূর্তেই সংশোধন করে নিতে হবে।

চটাস্! চটাস্! চটাস্!

কার কোন ভুলের জন্যে একটা অন্ধ আক্রোশে অত বেশি শব্দ করে চাবুক চালিয়ে যায় রিং-মাস্টার মদনমোহন তা হয়তো শুধু সে একাই জানে।

সুরযু সিং-এর ভারী-ভারী লোহার বলের খেলা, জীবনকুমার মজুমদারের সাত ফলা বর্শার খেলা এবং মেয়েদের তারের খেলা হয়ে যাবার পর হঠাৎ সুর খুঁজে পেল মোহনলাল।

রিং-এর মধ্যে একটা মই-এর ওপর দাঁড়িয়ে যমুনা খেলা দেখাচ্ছে। হাসি তার কাঁধের ওপর পাকক হচ্ছে, ডিগবাজি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কখনো চিৎ হয়ে এবং কখনো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে।

মোহনলালের মুখ খুব স্পষ্ট করে দেখতে না পেলেও, হঠাৎ এক-একবার

চোখ তুলে ব্যাণ্ডের উঁচু জায়গার দিকে তাকিয়ে হাসি আরও বেশি হাসছে।

যমুনার মুখ কিছু ম্লান। সে খেলা দেখাচ্ছে যন্ত্রের মতন। কোন বিশেষণ যমুনার নামের আগে প্রয়োগ করে না গোকুলবাবু, খুব সংক্ষেপে শুধু তার খেলার বিবরণ দর্শকদের শুনিয়ে দেয়।

মই-এর ওপর হাসিকে নিয়ে ব্যালেন্স রাখতে-রাখতে একটা জ্বালা অনুভব করে যমুনা। সে কি সুন্দরী নয়? তাকে কি লোকে বেশি সময় চোখের সামনে রাখতে চায় না? তাহলে কে গোকুলবাবুকে শিখিয়ে দেয় মুখ বুজে থাকতে?

ভরা মুখ যমুনার। ভারী নিতম্ব। তার খোঁপায় গোলাপী রিবন জড়ানো। চোখে সুর্মার ঘন রেখা।

ভারত সার্কাসে থাকলে এতদিনে সে সার্কাস-কুইন হয়ে যেত ঠিকই।

যমুনার আর হাসির খেলা, তাদের দেহের জলুস এবং কাঁচুলি ও জাঙিয়ার জরীর ঝিকিমিকি উপভোগ করছে নানা শ্রেণীর দর্শক। জিব ও মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে-করে তাদের দেখছে, কৌতুক করছে।

অল্প অল্প হাসে যমুনা। দর্শকদের এমন উক্তি কানে যায় না গোকুল-বাবুর! কোথায় হারকু সাহেব? আরও হাসে যমুনা। আরও বেশি ব্যালেন্স করে। দর্শকদের সে তার খেলা দেখিয়ে মজিয়ে দিতে চায়।

আর সব যন্ত্র পড়ে আছে এখন। থেকে থেকে বিভোর হয়ে যাচ্ছে মোহনলাল। হাসির দেহ, তার এক-এক ভঙ্গি, এই সব দৃশ্য মনে ধরে রাখবার জন্যে সে কখনো-কখনো চোখ বন্ধ করছে। জলে সাঁতার দেয়ার সময় হাঁসের পায়ের মতন তার আঙুল ইলেকট্রিক গীটারের তারে খেলে বেড়াচ্ছে—

"আমি ভয় করব না
ভয় করব না
দু-বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না—"

"উনিশ শো বাষট্টি সালের ইউনিভারসিটি ইনিস্টিটিউট ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়ন কলির ভীম শিবনাথ দাস!"

বড় মন্থর গতি শিবনাথের। বাঘছাল তার গায়ে লটপট করছে। বড় বড় রুপোলি তারা বসানো চামড়ার ব্যাণ্ড তার হাতে বাঁধা। লাল কাপড়ের টুকরো শক্ত করে কপালে জড়ানো।

যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনের মতন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলেছে ব্যাণ্ড মাস্টার। শিবনাথ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে রিং-এর দিকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অতিকায় দানবের মতন। অসীম শক্তিশালী, বিক্রমের প্রতীক কলির ভীম শিবনাথ দাস!

"উনকো মুসে কোই ভা-ও ব্যাকত নেহি হোতা। উনকো আঁখসে কোই ইশারা নেহি হোতা। উনকো হাত-পাও পেশী—ইয়ানে পুরা শরীরসে ভা-ও ব্যাকত্ হোতা হ্যায়!"

বাজনায় যে প্রবল ঝড় উঠেছিল, শিবনাথ রিং-এর মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শককুলকে তার দিকে ঠেলে দিয়ে তা হঠাৎ যেন এক ফুৎকারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাজনা বেজে উঠেছে এখন শিবনাথের পাথুরে পেশীতে, তার দেহের হাড়ে হাড়ে, মনের মধ্যেও।

আমি শিবনাথ দাস। আমার জন্ম উনিশ শো আটত্রিশ সালে, তারকেশ্বরে। খুব কম বয়সে হরিপার্লের এক ব্যায়াম প্রদর্শনী আমাকে আমার পথের সন্ধান দেয়। জয় গুরু! জয় গুরু!

আমি আমার বাপ-মায়ের অপদার্থ সন্তান ছিলাম। আমার জন্যে শ্রীরামপুরে তাদের মনিহারী দোকান প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। ব্যবসায় আমার মন একেবারেই ছিল না।

শ্রীরামপুরের মনিহারী দোকানে বসে থাকতে থাকতে নির্জন দুপুরে আমি আমার শক্তির পরীক্ষা করতাম। দাঁতে কামড়ে প্রথমে তুলতাম লজেঞ্জস চকলেটের ছোট ছোট বাক্স, পরে ঘিয়ের বড় বড় টিন।

জয় গুরু! জয় গুরু!...এখন আপনারা দেখুন আমার দাঁতের জোর—

"হি-উ-উ—" বীরত্বসূচক একটা দ্রুত ধ্বনি ছিটকে আসে শিবনাথের মুখ দিয়ে। কাঠের বড় এবং ভারী বেঞ্চ সে দাঁতে কামড়ে তুলে নিয়েছে।

থামুন! অত হাততালি দেবেন না। এখনো আমার শক্তির কোন পরিচয় আপনারা পাননি। আপনাদের হাত জ্বলে যাবে, ফেটে যাবে। কত হাততালি দিতে পারেন আপনারা!

জয় গুরু! জয় গুরু!

বাচ্চা একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছে রিং-বয়রা। তার পেট ও পিঠ চেইন দিয়ে বাঁধা। শিবনাথ একটা টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে, হাত বাড়িয়ে চেইন নিয়ে আসে তার মুখের কাছে। চেইন ও দাঁতের ঘর্ষণে একটা শব্দ ওঠে।

"হি-উ-উ—" অনড় অশ্বশাবককে অনেকটা ওপরে তুলে নেয় শিবনাথ, কিছু পরে আবার আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে দেয়।

আমার দুর্ভাগ্য, আমার অসীম ক্ষমতার পুরো পরিচয় আমি আপনাদের দিতে পারব না। মাত্র একটি হাতি আছে এই সার্কাসে। তার ওজন মোটে ষাট মন। পর-পর আঠারো-কুড়িটা বড় বড় হাতি আমি দু-মিনিট বুকের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি। গুরুর কৃপায় আমি প্রাণায়াম চর্চা করেছি... জয় গুরু! জয় গুরু!

সার্কাস রিং-এর মধ্যে পুরু গদির ওপর শুয়ে পড়ে শিবনাথ। একটু বেশি পা ফাঁক্ করে তিনশো চল্লিশ পাউণ্ডের বারবেল তোলে—তার ওপর আট-দশজন লোক।

"সাবাস মোটকা!" লাঠির চরর্ চরর্ শব্দ করতে করতে করালীকান্ত এগিয়ে আসে শিবনাথের কাছে, "কোন দোকানের চাল খাও বাবা?"

"এই ভাগ!" হাতি বুকে তোলবার আগে শিবনাথ কপালে লাল কাপড়ের টুকরোটা ভাল করে জড়িয়ে নেয়। হাতি যদি সঙ্কেত না বুঝে কিছু বেশি সময় বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে রক্তের চাপে হঠাৎ নাকি কপাল ফেটে যেতে পারে।

প্রাণের ভয়ে নয়, গুরুর আদেশ অমান্য করবে না বলেই লাল কাপড়ে কপাল বেঁধে রাখে শিবনাথ!

জয় গুরু! জয় গুরু!

এইবার, আর একটি হাতি বুকে তুলবেন অসামান্য শক্তিশালী পুরুষ— আমার ভাই, এই শ্রীশ্রীছারপোকা সিং—"

শিবনাথ রিং থেকে চলে যাবার পর গোপালের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণার মতন বলতে থাকে করালীকান্ত, "যে বৃহদাকার হাতিটি তিনি বুকে তুলবেন তার ওজন হল, আ—ড়া—ই কিলো!"

নম্বর করবার ঘণ্টা বাজল। যে-গদির ওপর শুয়েছিল শিবনাথ, এখন সেখানে গড়িয়ে পড়েছে বামন ক্লাউন গোপাল। তার আগে কয়েকটা ডন-বৈঠক দিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করেছে।

আর্টিস্টদের প্রবেশ পথের পর্দা আবার দুলে উঠেছে। রিং-বয় একটা ছোট দিশি কালো কুকুর চেইনে বেঁধে ছুটে ছুটে আসছে গোপালের কাছে। তার বুকের ওপর কুকুর উঠল, দু-মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল হাতির মতন। করালীকান্ত জোরে-জোরে হাততালি দিচ্ছে।

"হি-উ-উ—" উঠে দাঁড়াল গোপাল, শিবনাথের গলার স্বর ও ভঙ্গি অনুকরণ করে ঢেকুর তোলার মতন শব্দ করল। কিন্তু দর্শকরা শুধু তার ভঙ্গিই দেখল, হাসির আওয়াজে স্বর শুনল না।

"দিদি আপনাকে রাউটিতে ডাকে শিবুদা", তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসার পরপরই শিবনাথকে একা পেয়ে খুব সাবধানে হাসি মৃদু স্বরে বলল।

হাসির কথা শুনে কিছু সময় ভীতুর মতন বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শিবনাথ। তার বাঘছাল, অর্ধনগ্ন দেহ এখন তাকে বড় লজ্জা দিচ্ছিল। তার মনে হল, এমন অবস্থায় যমুনার সামনে যাওয়া যায় না।

"হাসি, যমুনাকে বল যে আমি একটু পরেই যাচ্ছি", শিবনাথ বড় আস্তে কথা বলল।

আগে নিজের তাঁবুতেই যাবে শিবনাথ। মুখ হাত-পা ধুয়ে সে প্যান্ট সার্ট পরবে। ভাল করে চুল আঁচড়াবে। এবং ভদ্রলোক হয়ে যমুনার কাছে যাবে। অনেক রাত অবধি তার কাছে সে বসে থাকবে। রাধানাথবাবু ফিরে এলে তখন সে-ও তার তাঁবুতে ফিরবে।

অনেক রাতে মাতাল হয়ে ফিরে আসে রাধানাথবাবু।

॥ সাত ॥

কালো মেঘের খণ্ড এখন সরে গেছে। শীতের বিষণ্ণ আকাশ ভিজে একটা আভা ফেলেছিল উটের দেহের ওপর। নির্জনতা রাতের মরুভূমির মতন প্রকট হয়ে উঠেছে। চার পোলের তাঁবু তুষার স্তূপের মতন, ভিতরে অন্ধকার। সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হলেও আকাশে চাঁদের টুকরো ছিল বলে অল্প আলো ও অন্ধকারে জীবন্ত এক-একটি প্রাণীকেও স্থির ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল

হঠাৎ খুব জোরে কাশতে গিয়ে সতর্ক হল করালীকান্ত। তার গলার ভিতরে কাশির যে-বেগ খুসখুস করে উঠছিল তা চাপবার চেষ্টা করে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েরা ঘুমোয়নি?"

"হুঃ, এখন ঘুমবে! পাকা-পাকা ছুঁড়ি না এক-একটা", টুনিমাসির গলার স্বর বেশ উঁচুই, সে প্রত্যেক মেয়ের নাম ধরে জোরে জোরে ডাকল,

দু-একজনের গায়ে হাত দিয়ে নাড়াও দিল, "ওরে কাঞ্চী, বেলা শান্তা ও কিশোরী? শুনছিস বাণী মঞ্জু?"

করালীকান্ত হাসল, "টুনি, ওরা এবার সত্যি ঘুমিয়েছে", এখন নিশ্চিন্ত হয়ে সে কাশতে পারল।

"কে জানে মটকা মেরে পড়ে আছে কি না। হাড় জ্বালিয়ে খেলে আমার! তোমার সাথে রাতের বেলা যে সুখ-দুঃখের দুটো কথা কইব—তাও কইতে দেবে না ছুঁড়িগুলো। একটু পরেই চোখ পিটপিট করে বলবে, জল খাব, বাইরে যাব—" মুখ বিকৃত করে অল্পবয়েসী মেয়ের মতন গলায় কথা বলল টুনি মাসি।

করালীকান্ত আবার হাসল। টুনি মাসির তাঁবুতে লোক বেশি বলে জায়গা কম। খাটিয়া কিংবা ক্যাম্প খাট নেই। মাটিতে ঢালা বিছানা পাতা। বিছানা বলতে একটা অপরিচ্ছন্ন শতরঞ্চি আর কয়েকটা তোবড়ানো বালিশ। তার ওপর গড়িয়ে পড়েছে মেয়েরা। বালিশের চেয়ে মাথার সংখ্যা বেশি। কেউ কেউ হাতের ওপর মাথা দিয়ে শুয়েছে।

ভিজে মাটি। ঠান্ডা, স্যাঁতসেঁতে।

বিকেলে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ঘ্রাণ পেয়ে কয়েকটা উচ্চিংড়ে তাঁবুর মধ্যে এসে পড়েছিল, এখন মেয়েদের মুখে-পিঠে, টুনি মাসির শাড়িতে ও করালী-কান্তর গায়ের ওপর খরর্ খরর্ করছিল।

উচ্চিংড়ে হাতের মুঠোয় এনে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে ঘুমন্ত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখল করালীকান্ত। বড় অন্ধকার। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। কারুর কারুর গা থেকে কম্বল সরে গেছে বলে মশা উপদ্রব করছিল। করালীকান্ত ওদের গা চুলকোবার খসখস শব্দ শুনল।

কম্বল একটাই। খুব পাতলা। অনেক পুরনো। জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়েছে। মেয়েরা সেটাই ভাগাভাগি করে নিয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিল। ওদের নিশ্বাস ঘুমন্ত মানুষের মতনই। করালীকান্ত ভাবল, জেগে আছে বলে টুনি মাসি ওদের মিছেই সন্দেহ করছে।

কিছু দূরে নরম একটা তোশকের ওপর টুনি মাসির পাশেই বসেছিল করালীকান্ত। রাত হয়েছে। মাহুত, রিং-বয় আর সব চাকর-বাকরেরাও রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে। কেননা, টুনি মাসির তাঁবুতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসবার সময় বাজার মাস্টারকে করালীকান্ত বাইরে বেরুতে দেখেছিল। রসড়ার সব কাজ চুকিয়ে রোজ রাতে বাজার মাস্টার শ্যামসুন্দর কোথায় যায় কে জানে।

শেষ খেলার পর ক্লান্তিতে শরীর কটকট করতে থাকলেও অন্ধকারে পা টিপে টিপে টুনি মাসির তাঁবুতে তার সুখ-দুঃখের কথা শুনতে করালী-কান্ত কেন এমন করে চলে আসে তা সে এখনো স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। এখন তার বিশ্রাম করবার বয়েস, বেশি ঘুমের দরকার। রাত জাগলে পেটে ব্যথা হয়, পরদিন সকালে শরীর ম্যাজম্যাজ করে, মেজাজ ভাল্ থাকে না। তাও টুনি মাসির কাছে করালীকান্ত আসবেই।

মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ করল করালীকান্ত। এত সময় পা ছড়িয়ে ছিল, এখন ঠান্ডার চাপে গুটিয়ে নিয়ে টুনি মাসির কথাই সে থেমে থেমে উচ্চারণ করল, "সুখ-দুঃখের কথা? বল টুনি, কী বলবে? আমি পরান ভরে শুনি।"

বাপের কথা মনে করে আপন মনে কী সব বলতে থাকে।

বীরভূমে এবার খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। চালেরও দর বেশি। যা টাকা করালীকান্ত পাঠায় তার বেশির ভাগ সুদ দিতেই খরচ হয়ে যায়। মেয়ে হওয়ার সময় শান্তির সরু একটা হার বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করতে হয়েছিল করালীকান্তকে। এখনো ছাড়াতে পারেনি।

মেয়েকে নিয়ে একা একা খুবই মুশকিলে আছে শান্তি। শুধু অভাব না, আরও অনেক উপদ্রব শুরু হয়েছে। সিউড়িতে কয়েকদিন আগে একটা বড় রকমের ডাকাতি হয়ে গেছে। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে রেখে গেছে ডাকাতরা।

করালীকান্তর মার চোখে ছানি পড়েছিল, এখন একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। কানেও শোনে না। তাকে সামলে রাখা বড় কঠিন। সব সময় শান্তিকে অভিশাপ দেয়। একদিন মেয়েটার গলা টিপে ধরেছিল। বুড়ির মাথাই খারাপ হয়েছে বোধ হয়।

করালীকান্ত লিখেছিল, পৌষ-পার্বণের সময় মেয়েকে দেখতে যাবে, কেন যায়নি শান্তি তাও জানতে চেয়েছে। তার শরীর ভাল আছে তো? সার্কাস ছেড়ে দেশে একটা দোকান খোলবার কথা ছিল করালীকান্তর—তার কী হল?

তেমন একটা কিছু করতে পারলেই ভাল হত। যাত্রা আর সার্কাসে অনেক দিন তো কেটে গেল করালীকান্তর, এখন মা আর মেয়ের কাছে না থাকলে চলবে কেন। এ বয়সে অত পরিশ্রম সয় না, দশ জায়গায় ঘুরে অনিয়ম অত্যাচার করলে শরীরের আর থাকবে কী!

শান্তির চিঠি একবারই পড়েছে করালীকান্ত। ছোট বড় বাঁকা চোরা অক্ষর। যার কাছে তার হার বাঁধা আছে, তাকে দিয়েই শান্তি এ চিঠি লিখিয়েছে, করালীকান্ত তা জানে।

চিঠিটা সে রাখেনি, একবার পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছে। রাখলেই বারবার পড়তে ইচ্ছে হত এবং তাহলে সে আরও অসহায় বোধ করত—একটা ব্যথা কনকন করে উঠত তার বুকের মধ্যে।

ইচ্ছে থাকলেও পৌষ মাসের শেষে মা বউ আর মেয়ের কাছে যেতে পারেনি করালীকান্ত। ছুটি হয়তো পাওয়া যেত কেননা খিদিরপুরে খেলা শুরু হতে তখনো দু-একদিন বাকি ছিল। কিন্তু একটি পয়সাও তাকে দিত না হারকু সাহেব। প্রথমত, তার কিছুই পাওনা নেই, আর তা ছাড়া আগে অনেকবার করালীকান্ত অগ্রিম টাকা নিয়েছে, এখন কোন সাংঘাতিক কারণ না দেখিয়ে আর টাকা চাওয়া চলে না। হারকু সাহেবকে সে তাই তাকে শুধু শুধু কটু কথা শোনাবার কোন সুযোগ দেয়নি। হয়তো বয়েস হয়েছে বলেই আজকাল থেকে থেকে আত্মসম্মান জ্ঞান বড় প্রবল হয়ে ওঠে করালীকান্তর।

বর্ধমান ক্যাম্প থেকে সে যখন দেশে গিয়েছিল তখন ছোট একটা দোকান খুলে সার্কাসের চাকরি ছেড়ে দেয়ার তার ইচ্ছে হয়েছিল। মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে তার ইচ্ছার কথা করালীকান্ত বলেছিল শান্তিকে। সেকথাই সে তাকে এখন মনে করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু টাকা কোথায়! অনেক ইচ্ছাই তো মনে পাখির মত ডানা ঝাপটায়। বউ আর মেয়ের কাছে ঝুপ করে উড়ে গিয়ে একত্রে শান্তিতে বসবাস করা যেন বড়ই সহজ। এ বয়সে এমন ইচ্ছা নিয়ে কেন খেলা করবার সাধ হয় করালীকান্তর—আশ্চর্য! ভগবানের যেখানে কোন হাত নেই, ক্ষমতা নেই—

সেখানে সে আর করবে কী! তাই টুনি মাসিকে ভগবানের কথা করালীকান্ত শোনায় একটা ঘুমপাড়ানি গল্পের মতন।

তা হলেও যা বলল করালীকান্ত এবং নিজে গ্রহণ করতে পারল না, তা ধাতবপদার্থের এক একটি ছোট ছোট উজ্জ্বল জিনিসের মতন টুনি মাসির মনে গাঁথা হয়ে থাকল। একটা নিভে আসা দেহ হঠাৎ ঐশ্বরিক দীপ্তিতেই ঈষৎ ভিজে-ভিজে কচি কলাগাছের মতন ঝকমক করে উঠল।

করালীকান্তর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল টুনি মাসি, অনেক সময় তার মুখে মুখ রাখল। কিছু পরে অলৌকিক এক আলোড়নে আপন মনে দোল খেতে খেতে বলল, "ভাল হয়েছে বটে—ভাল তো হয়েইছে!"

"হবে না?" রাতের নিস্তব্ধতা, টুনি মাসির দেহের মেয়েলী ঘ্রাণ, বিকল বাঁশির মতন মেয়েদের নিশ্বাসের শব্দ করালীকান্তকে বড় তৃপ্তি দিচ্ছিল। দু-হাত দিয়ে সে যেমন করে টুনি মাসির পিঠ চেপে রেখেছে তেমন করে এই অন্ধকারকেও চিরকালের মতন ধরে রাখতে চাচ্ছিল।

"কত কী তো হতে পারত!" নিজের জীবনের দুর্ঘটনা, যা এতদিন বড় বেদনা দিয়ে এসেছে টুনি মাসিকে, পীড়া দিয়ে এসেছে তা এখন রোজকার এক সাধারণ ঘটনার মতনই মনে হচ্ছিল তার, "মরে যেতে পারতাম, মুখ থেঁতলে যেতে পারত, কানা হয়ে যেতে পারতাম—"

"বলেছি না, ভগবান যা করে তা মঙ্গলের জন্যে—" টুনি মাসির মন থেকে তার অক্ষমতার যন্ত্রণা আরও লাঘব করার কথা ভেবেই করালীকান্ত জিজ্ঞেস করল, "কোন সার্কাসে তখন ছিলে যেন তুমি টুনি?"

"এবার গিরিন সার্কাস গো। নামটা বড্ড খটমট। মালিক ছিল বাঙালী। হেমন্ত দাস—"

"যে মোটর জাম্প দেখাত—সেই হেমন্ত দাস?"

"আরে না না," পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে টুনি মাসি আবার তার যৌবনের দিনগুলো মনে মনে ফিরে পাচ্ছিল বলে করালীকান্তর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে সে এখন বেশ কিছু সময় হাসল, "মোটর জাম্প দেখাত মহেন্দ্র দাস। তার নিজের ছিল ভিন্ন সার্কাস। কী নাম ছিল যেন—"

টুনি মাসি ভেবে ভেবে মহেন্দ্র দাসের সার্কাসের নাম বলবার আগেই তার কোল থেকে মাথা তুলে করালীকান্ত একটা উৎসাহের ঝোঁকে বেশ জোরে বসে উঠল, "তাক লাগিয়ে দিয়েছিল মানুষকে। বাঘের মতন নম্বর করত বটে", একটা নিশ্বাস ফেলল সে, এবার বড় আস্তে বলল, "এখন বয়স হয়েছে তো—কোন সার্কাসে ক্লাউন হয়ে পড়ে আছে কে জানে!"

"না গো, ভগবান তাকে ডেকে নিয়েছে। দু-এক বছর আগে মহেন্দ্রবাবু মারা গেছে," কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টুনি মাসি বলল, "আমাদের সার্কাসের মালিক হেমন্ত মাস্টারের খুব বন্ধু ছিল। মাঝে মাঝে তার কাছে আসত তখন তার পায়ের ধুলো নিয়েছি। হেমন্ত মাস্টার ছিল মস্ত বড় জমিদারের ছেলে। সার্কাস খুলে সব টাকা পয়সা ফুঁকে দিয়েছিল।"

টুনি মাসির কথা শুনতে শুনতে উঠে বসল করালীকান্ত। পকেট থেকে বিড়ি বের করে দেশলাই-এর বাক্সর ওপর ঠুক ঠুক করতে করতে বড় করুণ স্বরে বলল, "তখন বড় মানুষরাই সার্কাসের ডাকে সাড়া দিত গো—লেখাপড়া জানা ভদ্দর লোক ছিল সব! তাদের সাথে কাজ করেও সুখ ছিল। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝত তারা—মানুষকে ভালবাসত।"

"ভাল বাসবে না?" এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেলল টুনি মাসি। যেন এখনো পুলিশের ভয় আছে,—করালীকান্তর কানের কাছে মুখ এনে সে ফিসফিস করে উঠল, "দেশের জন্যে তারা সব ছেড়েছিল গো। যুদ্ধ করার জন্যে ব্যায়াম করে-করে শরীর তাজা রাখত। পুলিশ চোখে চোখে রাখত তাদের, সাহেবরা কাজ দিতে ভয় পেত। তেমন সব মানুষকে কাজ দিয়েছিল একবার গিরিন সার্কাসের মালিক হেমন্ত দাস—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁবুতে লুকিয়ে রেখেছিল।"

"হুঁ হুঁ, নাম শুনেছি বটে তার," দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নিল করালীকান্ত। ছোট একটা কাঠির ক্ষণিক আলোয় টুনি মাসির মুখ, ঘুমন্ত মেয়েদের জড়োসড়ো শরীর, স্বল্পপরিসর তাঁবুর বাসি অপরিচ্ছন্ন সব জিনিস ছায়ার মতন কাঁপল। করালীকান্ত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে টুনি মাসির আরও কাছে সরে এসে বড় নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, "এখনো বেঁচে আছে নাকি হেমন্ত মাস্টার, তার কোন খবর রাখ টুনি?"

"ক—বে মরে গেছে!"

টুনি মাসির বুক নিঙড়ে ভারী নিশ্বাস উঠছিল, গলার স্বর খেলছিল শীতের বাতাসের মতন—ঠাণ্ডা, এলোমেলো, "সে বেঁচে থাকলে আজ আমার এমন দশা হয়!" চোখ বন্ধ হয়ে এল টুনি মাসির। একটা আবেশ ও যন্ত্রণা তার মনে এক সঙ্গে স্বপ্ন এবং জাগরণের বিচিত্র অনুভূতি এনে দিচ্ছিল, "জান গো, কী বলেছিল হেমন্ত মাস্টার আমাকে?"

"কী?"

"বলেছিল, আমি তোকে দ্বিতীয় তারাবাঈ বানিয়ে ছাড়ব টুনি," করালীকান্তর গালে হাত রেখে তার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে টুনি মাসি জিজ্ঞেস করল, "বলি হ্যাঁ গো, নাম শুনেছ তারাবাঈ-এর?"

টুনি মাসির গায়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে এবং তার গালে মুখ ঘষতে ঘষতে কিছু সময় খুব হাসল করালীকান্ত, "নাম শুনব না কেন টুনি! আমি তার নম্বর দেখেছি যে!"

"আমার ভাগ্য মন্দ, তার খেলা দেখার সুযোগ হয়নি। তুমি কোথায় দেখলে গো, বল না?" একটা কৌতূহলের বশে টুনি মাসি তাকিয়ে থাকল করালীকান্তর মুখের দিকে ছোট মেয়ের মতন।

"সেই যে জলপাইগুড়িতে জলপেশ্বরের মেলায় তাদের সার্কাস গেছিল সে-বছর—আমি তখন ছিলাম যাত্রার দলে। চেহারাখানা তখন ছিল জব্বর। জোয়ান বয়েস। কেষ্ট সাজতাম গো! মাথায় মুকুট, হাতে বাঁশি—" করালীকান্ত গুন গুন করে উঠল, "রাধার পীরিতি লয়ে বুকে—"

টুনি মাসি মৃদু স্বরে বাধা দিয়ে বলল, "আহা, আগে তারাবাঈ-এর কথা বল না শুনি? তোমার যাত্রা পার্টির কথা পরে শুনব 'খন?"

করালীকান্ত লজ্জা পেয়ে থামল। যৌবনের যে-আবেগ তাকে মেঘের মতন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অতীতের আর এক জীবনে, স্মৃতির বিদ্যুৎ চমকে বিহ্বল করে তুলেছিল, হঠাৎ সচেতন হয়ে তা মন থেকে তাড়াতাড়ি সে মুছে ফেলল এবং দু-হাত প্রসারিত করে তারাবাঈ-এর দেহের বহর দেখাল টুনি মাসিকে, "এই এত্ত লম্বা-চওড়া! উঃ, গায়ে শক্তি কত! দশ-বারোটা জোয়ান পুরুষকে দু-হাতে তুলে ধাঁই-ধাঁই আছাড় মারতে পারে! তারাবাঈ-এর খেলা যারা দেখেছে, বুঝলে টুনি, ও শিবনাথ-টিবনাথ তাদের কাছে

ফাড়িং মাস্টার—তার এক হুমকিতেই ভুঁয়ে শুয়ে পড়তে হত আজকালকার ফক্কিকারী করনেওয়ালা খুদে-খুদে স্ট্রং ম্যানদের—"

"কী নম্বর করল গো তারাবাঈ?"

কিন্তু নম্বরের কথায় অত সহজে আসতে চাইল না করালীকান্ত। সে থেমে থেমে ভূমিকায় অনেক সময় ব্যয় করে অতীত যুগের স্বাদ বড় তৃপ্তির সঙ্গে পান করতে চাচ্ছিল। তখনো তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায়নি।

"এখনকার মেয়েদের মতন আধা ন্যাংটা হয়ে নম্বর করে লোকের মন মজায়নি তারাবাঈ, জানলে টুনি? তারা সব জাত-খেলনেওয়ালী ছিল তো! তারা মানুষের মন জয় করত শক্তি দেখিয়ে, সাহস দেখিয়ে—আগুনের মতন তেজের সঙ্গে বিপদের সব খেলা দেখিয়ে—"

"ঠিক ঠিক, বড় সত্যি কথা বলেছ", শাড়ি টেনে পা ঢাকতে-ঢাকতে টুনি মাসি বলল, "আজকালকার ছুঁড়িদের মতন আধা ন্যাংটা হয়ে নম্বর করার রেওয়াজ আমাদের কালে ছিল না। পুরো হাতা ফ্রক পরেছি, বুক বগল ঢেকে তবে নম্বর করেছি বাপু—"

"তা আর আমি জানি না," হাত বাড়িয়ে টুনি মাসিকে বুকের বড় কাছে টেনে আনল করালীকান্ত, "পাঞ্জাবী মেয়ের মতন পায়জামা পরেছিল তারাবাঈ, সবুজ কোর্তা। গলায় মেডেলের মালা। চোখে সুর্মা। এলো চুল। শুনলে টুনি? সেই চুল দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সে বাঁধল তিন মণ পাথরের বিরাট এক চাঁই। হুঁ, বুঝলে, চুল দিয়ে সেই পাথরের চাঁই টেনে তুলল তারাবাঈ—"

"হেমন্ত মাস্টারের কাছে শুনেছিলাম বটে।"

"আরে, আর একদিন কী হল শোন। সাহেবের বাচ্চা বড় জব্দ হয়ে গেছিল সেদিন। আর একটা নম্বর করত তারাবাঈ—দড়িতে বেঁধে মোটর গাড়ি রুখে রাখত। যতই ভর্‌ভর্‌ শব্দ হোক, গাড়ি চালাতে পারত না ড্রাইভার।"

এসব কথা বলতে বলতে শীতের জড়তা কাটিয়ে উঠছিল করালীকান্ত, তার চোখের সামনে প্রথম বয়েসের একটা অভাবনীয় দৃশ্য ভাসছিল। অন্ধকারে টুনি মাসির মুগ্ধ মুখ দেখতে দেখতে সে বলতে থাকল, "সেকালের কালো রঙের একটা ফোর্ড গাড়ি ইয়া মোটা দড়ি টেনে রুখে দাঁড়িয়েছে তারাবাঈ। তার শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেছে মানুষ! সে কী হাততালি! বাপরে বাপ!"

"এমন সময় লাল মুখো পুলিশ সাহেব গট গট করে রিং-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে তারাবাঈকে বলল, আমি আমার গাড়ি চালাব। তুমি রুখতে পারবে?... পারব সাহেব—তাকে সেলাম করে বলল তারাবাঈ।

পুলিশ সাহেব তার গাড়ি নিয়ে এল রিং-এর মধ্যে, স্টার্ট দিল। পিছনে দড়ি টেনে দাঁড়িয়ে আছে তারাবাঈ। বুঝলে টুনি, মজা করবার জন্যে সে একটু ঢিল দিয়েছিল। সাহেবের গাড়ি চলছিল, খুব হাসছিল সাহেব। ওমা, কিছু পরে দড়িই টেনে হুড়হুড় করে গাড়ি পিছনে টেনে আনল তারাবাঈ। সাহেবের লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠেছিল গো। কত চেষ্টা করল, গাড়ি আর চলল না।"

কিছু সময় দুজনেই চুপচাপ থাকল। শুধু তাদের নিশ্বাসের শব্দ উঠছে। হিম ঝরছে তাঁবুর ওপর। বাইরে ঘন কুয়াশা ভারী পর্দার মতন সব দূরের জিনিস ঢেকে রেখেছে। কিছু দূরে খাঁচার মধ্যে যন্ত্রণায় সিংহ কাতরাচ্ছে থেকে থেকে।

টুনি মাসি ও করালীকান্ত এসব কিছু দেখল না, শুনল না। ভিন্ন আর এক নয়ন মেলে অনেক দূরের সব ঝাপসা টুকরো-টুকরো দৃশ্য তারা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

নিজের কথা করালীকান্তকে অনেকবার শোনালেও আজ আবার পুরনো একটা মানুষের কাছে সব নতুন করে বলছিল টুনি মাসি—একমাত্র তার কাছ থেকেই এখনো সে প্রশংসা পাবে বলে অতীতের কৃতিত্ব ও দুর্ঘটনার কথাও একে-একে তাকে শুনিয়ে যাচ্ছিল।

“মেয়ে আর ক'টা ছিল তখন সার্কাসে! আমাকে দিয়ে কত নম্বর করাত হেমন্ত মাস্টার—বড় ভালবাসত গো!”

টুনি মাসির গা টিপে হাসল করালীকান্ত, “তোমাকে বড্ড মনে ধরেছিল মাস্টারের—কী বল টুনি?”

টুনি মাসি অস্ফুট একটা শব্দ করে দাঁত দিয়ে জিব চাপল, করালী-কান্তর পিঠে চিমটি কেটে বলল, “তাকে বাবা বলে ডাকতাম গো। মাস্টারের পীরিত ছিল আমার মায়ের সাথে। মা ছিল বড় গাইয়ে—নগেন্দ্রবালা দাসী। তার গান শুনেই তো মন মজল মাস্টারের—সার্কাসে এনে রাখল। আমার তখন কম বয়েস। তাঁবুতেই বড় হয়েছি, খেলা শিখেছি, মাজা ভেঙেছি নিজের দোষেই।”

“দোষ তোমার না টুনি,” করালীকান্ত টুনি মাসির ভিজে গলার আভাস পেয়ে তাকে আদর করতে-করতে বলল, “দোষ তো সেই লক্ষ্মীকান্তবাবুর। শক্ত নম্বরের সময় অমন করে মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করলে বিপদ হবে না?”

“জাঁদরেল রিং মাস্টার ছিল সে, ছ'টা বাঘ নিয়ে খেলত—” বিপদের কথা ভাবল না টুনি মাসি, লক্ষ্মীকান্তবাবুর কথাই ভাবল।

“পরে কী করল সে? সেই নেপালী ছুঁড়িটার সাথে কেটে পড়ল তো?”

“পড়বে না? আমার তো তখন মাজা ভেঙে গেছে, চাটগাঁ-এর হাসপাতালে পড়ে আছি। আমার সাথে কোন জোয়ান মানুষ ঘর করতে পারে আর?”

“হুঃ,” এ প্রসঙ্গ তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যাবার জন্যে করালীকান্ত বলল, “তোমার নম্বরের কথা বল টুনি। সেই একটা চেয়ারের ওপর আর একটা চেয়ার?”

“হ্যাঁ গো। ষোলখানা কাঠের ভারী-ভারী চেয়ার রাখা হত। ভয়-ডর মোটেই ছিল না আমার। মাস্টার কি শুধু-শুধু ভালবাসত গো! ছুটে-ছুটে আসতাম। পিঠে দুলত বেণী। শুয়ে পড়তাম চেয়ারের তলায়। একটার থেকে আর একটার উপরে উঠতাম সাপের মতন এঁকে-বেঁকে। অনেক সময় লাগত। ঘাম ঝরত দরদর করে। কথা সরত না লোকের মুখে—হাত-পা সিঁটিয়ে গুম হয়ে বসে থাকত—”

“থাকবে না? এমন খেলা দেখাতে পারে ক'জন!”

টুনি মাসি বলতে থাকল, “একেবারে উপরের চেয়ারে বসে লোকের দিকে তাকিয়ে হাসতাম, পা নাচাতাম। তারপর ফের আবার যেমন করে উঠেছিলাম না, তেমন করেই নিচে নেমে আসতাম।”

করালীকান্ত আস্তে হাত তালি দিয়ে বলে উঠল, “বাঃ! এমন খেলা একবার যেন দেখেছিলাম টুনি! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই বুঝি দেখেছিলাম!”

টুনি মাসি করালীকান্তর কথা শুনল না। দুর্ঘটনার কথা ভাবতে-ভাবতে

আস্তে বলল, “সেই খেলার সময় তো একসিডেন্ হল গো। হুড়মুড় করে চেয়ারগুলো পড়ল, পিঠে বড় চোট লাগল। বে-কায়দায় পড়ে গেলাম—”

করালীকান্ত বলল, “সার্কাসে অমন হয়েই থাকে টুনি। ও কিছু না। তবে তোমার বেলায় মনে হয়, লক্ষ্মীকান্তবাবুর জন্যেই—”

“আরে না না,” হাত দিয়ে করালীকান্তর মুখ চেপে ধরে লাজুক মেয়ের মতন টুনি মাসি বলল, “তার কী দোষ! সার্কাসের নতুন নেপালী ছুঁড়িটা বড় নজর ফেলছিল তার ওপর বলেই না আমার নম্বরের সময় আমি তাকে আমার চোখের সুমুখে থাকতে বলেছিলাম—”

“বেশ করেছিলে টুনি—ভাল করেছিলে! মাজা ভেঙেছে তো কী হয়েছে! প্রাণটা তো আছে!”

“হাত-পা, মুখ—তা-ও আছে গো। চলতে পারছি, কথা কইতে পারছি—”

“আদর-সোহাগও করতে পারছ,” করালীকান্ত সুর করে বলল, “আমার টুনটুনিতে টুনটুনালো—”

“যাঃ. তুমি ভারী অসভ্য মাইরী!”

করালীকান্তর হাত ও মুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতন টুনি মাসির ভগ্ন অক্ষম দেহে এক অদ্ভুত উত্তাপ সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল। এখন জেগে থাকার সময় না, কিন্তু প্রথম বয়সের দুজন মানুষের মতন ঘুমের কথা তাদেরও মনে এল না।

॥ আট ॥

লণ্ঠনের নরম আলোয় যমুনার রং-মাখা গাল দপদপ করছিল। সার্কাসের পোশাক সে ছেড়ে ফেলেছে। খেলার পর শুধু ঢিলে একটা সেমিজের ওপর ঘুরে শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছে। অনেক সময় ছিল, ইচ্ছে করলে রোজকার মতন আজও সে সাবান ঘষে ঘষে মুখ ধুয়ে তারপর রান্না শুরু করতে পারত। হঠাৎ যমুনার মনে হল, এখন থাক, আরও পরে, শোবার আগে আগে মুখ ধুয়ে নিলেই চলবে।

একটা ছোট ক্যাম্প-খাটের ওপর বসে এক-একবার শিবনাথ যমুনার রং-মাখা গাল, ঢিলে সেমিজ ও এলোমেলো শাড়ি এবং তার ভরা দেহের দিকে কাঙালের মতন চোখ ফেলছিল। খুব পরিচ্ছন্ন হয়ে যমুনার তাঁবুতে এসেছে শিবনাথ। দু হাতে সারা গায়ে পাউডার ঘষেছে. কোট-প্যাণ্ট পরেছে, অনেক সময় নিয়ে চুলে চিরুনি চালিয়ে পুরোপুরি ভদ্রলোক সেজেছে।

শিবনাথের ওজন একটু বেশী বলে যমুনার ছোট ক্যাম্প-খাট অনেকটা ঝুলে পড়েছিল। খাটের একদিকে এখনো যমুনার সার্কাসের পোশাক পড়ে আছে। মধুর একটা গন্ধ উঠছিল। সেসবের ওপর কখনো কখনো হাত ঘষছিল শিবনাথ।

তাঁবুর মধ্যেই বালতির উনুনে ভাত ফুটছে। সে গন্ধও নাকে যাচ্ছিল শিবনাথের। তার ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছিল। শিবনাথ এখন কাঙালের মতন ক্ষুধার্ত এবং আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত এক অতি সাধারণ মানুষ। খেলার সময় রিং-এর মধ্যে যে অসম্ভব তার আয়ত্তের মধ্যে ছিল, যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তি-

মত্ততা অতিমানুষের পর্যায়ে তাকে উত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছিল—এখন তেমন কোন মনোভাব শিবনাথের ছিল না।

সে এখন ঈষৎ ভীত, শঙ্কাকাতর, দ্বিধা ও সংশয়জর্জরিত। মনের এমন অবস্থায় শিবনাথ যমুনার সার্কাসের পোশাকে তার অলক্ষ্যে হাত ঘষে ঘষে একটা তৃপ্তি অনুভব করছিল।

"শিববাবু, দুটি খেয়ে যাবেন?" শিবনাথের সামনাসামনি আর একটা খাটের ওপর বসল যমুনা, খোঁপা ভেঙে ক্লান্ত হাতে চুলের কাঁটা খুলতে খুলতে অল্প একটা ভঙ্গি করে কথা বলল।

"বলছ?" লণ্ঠনের নরম আলোয় শিবনাথের উঁচু দাঁত ঝকমক করে উঠল, "কী খাওয়াবে যমুনা?"

"মাছ আছে, মাংস আছে—খান না!"

শিবনাথ জিব দিয়ে চকচক শব্দ করে বলল, "টেণ্টে রান্না করে খাওয়ার সুখ আছে, রসড়ার ধারে-কাছে না গিয়ে তোমরা ভাল কর যমুনা—"

"বাবার আবার পিটপিটানি আছে না, খাওয়া-দাওয়ায় বড় বাছ-বিচার—সকলের রান্না মুখে দিতে পারে না।"

"হবে না? বড় ঘরের ছেলে তো!"

শিবনাথের কথা শুনে এখন খুশী হল না যমুনা, অপ্রসন্ন হয়ে বলে উঠল, "থাক থাক, বাবার কথা আর বলবেন না, তার জন্যেই তো আজ আমাদের এমন দশা!"

রাধানাথবাবুর কথা কিছু কিছু শুনেছে শিবনাথ। মদ আর রেস একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে উলুবেড়িয়ার পাকা বাড়ি থেকে সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে। পাকা বাড়িতেই মা মারা গিয়েছিল যমুনার। তার আকস্মিক মৃত্যুর কারণ রাধানাথবাবু।

মত্ত অবস্থায় একদিন অনেক রাতে রাধানাথবাবু বাড়ি ফিরে এসেছিল। হাসি আর যমুনা ঘুমচ্ছিল, তাদের মা তখনো জেগে। ভাবনায় ভাবনায় শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল মা-র, রাধানাথবাবুর হাতে মার খেতে খেতে আর বেঁচে থাকতে চাইত না। হাসি আর যমুনাকে জড়িয়ে ধরে কতদিন কেঁদেছে, "তোদের কী হবে, তোরা যে ভেসে যাবি!"

"ভেসে তো গেছিই শিববাবু," একদিন অন্য কোন ক্যাম্পে তাঁবুর মধ্যে বসে এইরকম অল্প অল্প অন্ধকারে যমুনা বলেছিল শিবনাথকে, "ভেসে যাইনি. বলুন?" বয়েস কম হলেও বয়স্ক মেয়ের মতনই কথা বলছিল যমুনা, "আব্রু নেই, মানসম্মান নেই—এমন খোলামেলা জায়গায় থাকতে পারে আমাদের মতন মেয়েরা? কে কখন মাতাল হয়ে হাত ধরে টানে. হাসিকে ভুলিয়ে নিয়ে কী করে—উঃ, বাপটা যে কী আমার!"

আর একদিন তার মা-র কথা বলবার সময়ও যমুনা বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল—শিবনাথকে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে. রাধানাথবাবুর ওপর তার কোন টানই নেই। দিনের পর দিন যে মেয়েদের পয়সায় মদ খাচ্ছে, ফুর্তি করছে, তার বেঁচে থাকবার কী মানে হয়!

"বাবা ফিরে এল অনেক রাতে—শুনলেন শিববাবু? খুব চীৎকার করছিল সেদিন—আবোল-তাবোল বকছিল। মাকে দেখেই দমাস-দমাস মারতে শুরু করে দিল। এমন মানুষ আমার বাপ—লজ্জায় মরে যাই!

"উলুবেড়িয়ার বাড়িতেই একদিন মরল মা। বাবার অত্যাচারের জন্যেই

আর টিকে থাকতে পারল না বুঝি! জানলেন শিববাবু, তবুও বলব, মার খাক আর যা-ই হোক—পুণ্যির জোর ছিল বটে আমার মায়ের, পাকা বাড়িতেই মরল তো", চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিবে এসেছিল যমুনার মুখ, স্বরও ভিজে-ভিজে, বড় করুণ করে সে বলেছিল, "মা-ও গেল, পাকা বাড়িও গেল। ঘোড়া আর মদ—বুঝলেন শিববাবু, মানুষ নাকি আমার বাপ! শ্মশানে নিয়ে এসে তুলল আমাদের—"

ঘৃণা এবং যন্ত্রণায় তাঁবুর ভিতরে ও বাইরে এক-একটি জিনিস দেখতে দেখতে যমুনা বলে উঠেছিল, "শ্মশানই তো! যেমন করে পড়ে আছি, শ্মশান ছাড়া আর কী!"

শুধু রাধানাথবাবুর ওপরেই নয়, এক-এক দিন এক-এক ক্যাম্প ছেড়ে সার্কাসের দলের সঙ্গে নতুন জায়গায় যায় যমুনা আর সে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে সব মানুষের ওপর। একটা বিতৃষ্ণা তাকে বড় নিস্তেজ করে তোলে—অন্ধের মতন, বধিরের মতন। প্রত্যেকটি মানুষ তাকে যেন ছোট করবার জন্যে, তার খেলা চেপে রেখে অবহেলা করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। যমুনার খেলার আগে আগে মাইকের সামনে মুখ আনলে গলা বুজে আসে গোকুলবাবুর, ব্যাণ্ড মাস্টারও হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। এই সার্কাসে আর বেশী দিন থাকতে চায় না যমুনা। এর চেয়ে ভারত সার্কাস অনেক বড় ছিল, ভালও ছিল।

কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে যমুনার মনে যেমন ফুটন্ত জলের মতন ধকধক করে ওঠে তেমন হঠাৎ আবার জুড়িয়েও যায়। খুশিমতন কাজ করা সহজ নয়। অনেক বাধা—অনেক অসুবিধা। মোহনলালকে ছেড়ে যাওয়ার কথা তুললেই মুখ শুকিয়ে আসবে হাসির। পাওনাদাররা একসঙ্গে এসে টাকা ফেরত চাইবে রাধানাথবাবুর কাছে, হাসি আর যমুনার সামনেই তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করবে—তাদেরও অপমান করতে ছাড়বে না। তখন লীলাও হাসাহাসি করবে, প্রত্যেকের কাছে আরও বেশী করে বলবে তাদের নামে।

অন্য সার্কাসে চাকরি নিয়ে এখান থেকে হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা এখন আর ভাবে না যমুনা। এই সার্কাসে থেকেই এইসব মানুষগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে সে সকলের চেয়ে বেশী নাম করার আকাঙ্ক্ষায় একটা বাঘিনীর মতন জেদী ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

হারকু সাহেব যতই টানুক লীলাকে, আর সকলকে চেপে রেখে তাকে যতই শক্ত শক্ত খেলা শেখবার সুযোগ করে দিক, যমুনা আরও কঠিন নম্বর করে একদিন তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, তার খেলার ক্ষমতা লীলার চেয়ে অনেক বেশী।

একমাত্র শিবনাথের ভাবনাই এখনো যমুনার মন কিছু নরম করে তোলে। এইসব নিয়ে তার সঙ্গে আজ একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার ইচ্ছে হয়েছিল যমুনার। এবং সে-ই কারণেই সে হাসিকে বলেছিল, খেলার পর আজই যেন শিবনাথ তার কাছে একবার আসে। তাকে নিজেও ডাকতে পারত যমুনা—কিন্তু শিবনাথের বাঘছাল এবং পাথুরে পেশী দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় তার মনে হয়েছিল, ওই শক্তিশালী পুরুষই সে যা চায় তা দিতে পারে। তখন শিবনাথের মতন মানুষের সামনে দাঁড়াতে সঙ্কোচ জেগেছিল যমুনার—একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধ তার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল।

শিবনাথ সামনে ঝুঁকে পড়ে যমুনার খাটের আরও কাছে এল, তার গালের কাছে ব্যগ্র হাত এগিয়ে নিয়ে হঠাৎ সতর্ক হয়ে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "হাসি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"উঁহু", আর একটা খাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল হাসি, এখন শিবনাথের কথা শুনে মুখ বের করে বলল, "বড় শীত করছে শিবুদা—"

"হাসি, একটু ওঠ না, দেখ ভাত ফুটতে আর কত বাকি—শিববাবুর খুব খিদে পেয়ে গেছে।"

"আরে না না", শিবনাথ বলল, "হোক না আস্তে আস্তে, কোন তাড়া নেই আমার।"

হাসি উঠল না। আবার কম্বল দিয়ে মুখ ঢাকল। তাকে দেখতে দেখতে হাসছিল শিবনাথ। ডেকচির ঢাকনা তুলে যমুনা দেখল আরও কিছু সময় ভাত ফুটবে। লণ্ঠনের শিখা একটু বাড়িয়ে দিয়ে সে একটা ট্রাঙ্কের ওপর রাখল।

"কী দোষ করেছি", যমুনা শিবনাথকে শুনিয়ে শুনিয়ে হালকা গলায় বলল, "না ডাকলে যে আসা হয় না শিববাবু, অত দেমাক কিসের?"

"আরে না না, দেমাক-টেমাক—কী যে বল", অপ্রস্তুতের মতন শিবনাথ বলে যাচ্ছিল, "বড় ছুটোছুটি গেল ক'দিন! নতুন ক্যাম্প ঠিক করে এলাম আজ। কাছেই—টালিগঞ্জে। বায়নাও করে এসেছি।"

নতুন ক্যাম্প সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না যমুনা। একটু আগে সে খোঁপা খুলে ফেলেছিল, এখন এক দিকে মাথা হেলিয়ে বিনুনি বাঁধতে বাঁধতে বলল, "কাজের মানুষ আপনি, কাজ করেছেন—বুঝেছি! আপনি কাজ না করলে আর কে করবে শিববাবু? এ সার্কাসে আর মানুষ আছে নাকি?"

যমুনার মুখ নিচু, চুলে তার আঙুল চলছে। তার দিকে তাকিয়ে নিজের উরুর কাছে প্যান্টের ওপর শিবনাথ জোরে জোরে হাত ঘষল, "এসব কাজ করতে আমার ইচ্ছে করে না যমুনা, এসব আমার কাজ না। আমি আর্টিস্ট, আমি আরও খেলা বাড়াতে চাই—আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাই।"

"তবে কেন এমন ছুটোছুটি করেন?"

"আরে, বাবুই তো জোর করে দায়িত্ব চাপাল ঘাড়ে। এখন ছুটোছুটি না করে উপায় আছে?"

"বাবু আপনাকে খুব ভালবাসেন, না?"

শিবনাথ হাসল, "জান না? বাবু ভালবাসে, বিশ্বাস করে বলেই তো এত ছুটোছুটি করি। আমি এ সার্কাসে বাবুর জন্যেই পড়ে আছি যমুনা।"

মুখ ফিরিয়ে যমুনা উনুন দেখল, ফুটন্ত চালের ভকভক শব্দ শুনল এবং কিছু পরে চুলে খুব তাড়াতাড়ি আঙুল চালাতে চালাতে বলল, "হারকু সাহেবের কাজ আপনার চেয়ে কত বেশী!"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল যমুনা, পরে শিবনাথ কিছু বলবার আগেই সে আবার অন্যমনস্কের মতন বলল, "জেনারেল ম্যানেজার তো, কাজ বেশী হবে না?"

যমুনার স্বর নিচু হলেও তার কথা শিবনাথের মুখের ওপর ভারী পাথরের মতন পড়ল। তার মনে হল, যমুনাও যেন হারকু সাহেবের বড় অনুগত। একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল শিবনাথের মনে। সে সামনে ঝুঁকে পড়েছিল,

এখন পিছিয়ে এল। যমুনার যে সার্কাসের পোশাক খাটের ওপর ছিল তা অবলম্বনের মতন খুব জোরে চেপে হাত মুঠো করে থাকল শিবনাথ।

"কী কাজ করে হারকু সাহেব? একটা বাজে লোক, থার্ড কেলাশ লোক—"

যমুনা উঠে দাঁড়াল, হাত দিয়ে শিবনাথের মুখ চেপে ধরল, "চুপ শিববাবু, আস্তে। এত জোর গলায় হারকু সাহেবের নামে এসব কথা বলবেন না।"

যমুনার কথা শুনল না শিবনাথ, মুখ সরিয়ে নিয়ে তার হাত ধরে আরও জোরে বলল, "কেন? আমি ভয় করি তাকে?"

"আমি, আপনি—সকলেই তার অধীনে চাকরি করি তো", শিবনাথের পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায় যমুনা বলল।

"ওই লম্পটটাকেই আর বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না", শিবনাথ হাসির খাটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে একটু আস্তে বলল, "বাবু অনেক আগেই ওকে ভাগিয়ে দিত—কেন দেয়নি জান?"

শিবনাথের এক-একটি কথা এখন উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল যমুনা, সে তার কাঁধে মাথা রেখে বলল, "কেমন করে জানব বলুন?"

শিবনাথ বলল, "মোটা টাকা ধার পাইয়ে দিয়েছে সে বাবুকে—জানোয়ার যন্ত্রপাতি কিনিয়েছে। এখন লোকসান দেখিয়ে দেখিয়ে বাবুকে আসল টাকা শোধ করতে দেয় না। ওকে তাড়িয়ে দিলেই পাওনাদারকে শিখিয়ে দেবে একবারে সব টাকার জন্যে চাপ দিতে —বুঝলে না?"

"আমি অতশত বুঝি না বাপু", শিবনাথের খুব কাছে সরে বসল যমুনা, চাপা স্বরে বলল, "তা বাবু যখন আপনাকে এত ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, তখন আপনি তো তাকে সব বুঝিয়ে বললেই পারেন—"

"অনেকবার ভেবেছিলাম, বলব। চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দিতেও চেয়েছিলাম—" যমুনার অত কাছে বসে থাকতে থাকতে গরম নিশ্বাস পড়ছিল শিবনাথের, তার গলা শুকিয়ে আসছিল, "কিন্তু ওসব অনেক ঝামেলার ব্যাপার যমুনা। বাবু আমারই ঘাড়ে এত বড় সার্কাসের ভার চাপিয়ে দেবে—"

"দিক না", একটা উচ্ছ্বাসের ঘোরে শিবনাথের হাত টিপতে টিপতে যমুনা বলল, "ভালই তো হবে তা হলে! আপনি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে যাবেন—" কথা বলতে বলতে সে খুব হাসল, "আমরা সকলে আপনার ভয়ে জুজু হয়ে থাকব। হারকু সাহেবের মতন আপনি যাকে খুশি তাকে ধমক দিয়ে বলবেন, চোপ রও! নিকালো!"

এই তাঁবুতেই আর একটা খাটে যে হাসি শুয়ে আছে সে কথা মনে থাকল না শিবনাথের। সে ঘুরে বসল যমুনার দিকে। দুজনের ভারে খাটের ক্যানভাস আরও ঝুলে পড়েছিল। মাঝখানে গর্তের মতন মনে হচ্ছিল। শিবনাথ দু হাতে যমুনাকে জড়িয়ে ধরে তার দেহে প্রবল চাপ দিল। সে তার মনের দৃঢ় শপথ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না বলে এইরকম আচরণ করে যমুনাকে তার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে চাচ্ছিল।

"আঃ, কী হচ্ছে শিববাবু, যাঃ—" যমুনা তার কানের কাছে মুখ এনে মিনতি করার মতন বলল, "হাসি সব বুঝতে পারছে—অমন করলে আমি বসতে পারব না এখানে—"

শিবনাথ যমুনার গা থেকে হাত তুলে নিয়ে হাসল, কিছু পরে তার হাঁটু

চেপে ধরে বলল, "তোমাদের সর্দার ওই হারকু সাহেবকে আমি অমন তম্বি করেই কথা বলি যমুনা—"

"তা তো জানি। আপনি কাউকে গ্রাহ্য করেন না।"

কিছু সময় চুপ করে থাকল শিবনাথ। বাইরে হাওয়া উঠেছে। ঝড়ের মতন একটা শব্দ খেলছিল। যেটুকু আব্রু ছিল তাঁবুর, বাতাসের এক-এক ঝাপটায় তা-ও উড়ে যাচ্ছিল। রাত বেশী এবং জনবিরল বলে ট্রাম, বাস ইত্যাদি যাবতীয় পরিবহণ বড় রাস্তার ওপর থেকে থেকে হাওয়ার মতন হু হু করে ছুটছিল।

শিবনাথ বাতাসের সনসন শুনল, কিছু সময়ের জন্যে শীতের রোমাঞ্চ অনুভব করল। এবং পরিবহণের শব্দে গতির যে আবেগ তার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল তা গ্রহণ করতে করতে সে হাসির কম্বলমোড়া দেহ দেখল, টলো-মলো যমুনাকে আবার স্পর্শ করল। এসব দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে এবং অনুভব করতে করতে হঠাৎ অভিভূতের মতন হয়ে উঠল শিবনাথ।

"এত বড় সার্কাসের ভার, এসব দায়-দায়িত্ব আমি নিতে চাই না যমুনা—আমার মন সায় দেয় না।"

"কেন শিববাবু?"

"আমার গুরু বলেছিলেন, তুই বড় হবি শিবনাথ—জগৎ তোর ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাবে", জগদ্বিখ্যাত এক পুরুষের মতন যমুনার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বলল, "ব্যায়াম—শরীরচর্চা—আমি এই নিয়েই সারা জীবন থাকতে চাই। কোন ঝামেলা-গোলমালে জড়িয়ে পড়ে শরীর ক্ষয় করতে চাই না—ওসব আমার কাজ নয়।"

এত সময় শিবনাথের পাশে বসে থাকতে থাকতে উৎসাহের একটা শিখা যমুনার মনে পাতার মতন দুলে উঠছিল। এখন শিবনাথের কথায় তা দপ করে নিবে গেল। সে কিছু সময় স্থির ও নীরব থাকল, পরে আস্তে আস্তে উঠে উনুন থেকে ডেকচি নামিয়ে ভাতের ফেন গালবার জন্যে তাঁবুর বাইরে গেল। তখন শীতের ভিজে হাওয়া যমুনার চোখে-মুখে আছড়ে পড়ে তার মনে কান্নার মতন অনুভূতি এনে দিচ্ছিল।

যমুনা উঠে যাবার পর নিচু হয়ে লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দিল শিবনাথ, একটা বালিশ কাছে টানল, অন্য হাত দিয়ে তার ওপর ভর করে চুপচাপ বসে থাকল। তার মন বুঝতে পেরেছে যমুনা, নীরব থেকে তাকে সমর্থনও করেছে—শিবনাথের এমন ধারণা হয়েছিল বলে যমুনার খাটে তার শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছিল।

বাসন টানাটানি করছিল যমুনা। ভাত ফুটে গেছে। শীতকাল বলে মাছ মাংস দুপুর বেলায় রান্না করে রাখা হয়েছিল। এখন সেসব গরম করবার জন্যে যমুনা উনুনের কাছে নিয়ে এল। আলো বড় কম। ভাল করে কিছু দেখা যায় না। যমুনা মাথা তুলে লণ্ঠন দেখল। চিমনির ভেতর আলো থেকে থেকে লাফাচ্ছিল।

শিবনাথ হেসে বলল, "আমি কমিয়ে দিয়েছি।"

"একটু বাড়িয়ে দিন, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কত দেরি হয়ে গেল, খাবেন না?" হাসিকে একটা নাড়া দিয়ে যমুনা বলল, "এই হাসি, ওঠ!"

"এত তাড়া কিসের যমুনা? আর একটু পরে হবে 'খন", খুব খিদে পেলেও হঠাৎ খাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিল শিবনাথের, "তোমার ঘুম পেয়েছে নাকি?"

"বাবার জন্যে বসে থাকতে হবে না?" উনুনের কাছ থেকে সরে এল যমুনা। শিবনাথের পাশে সে আর বসল না, তার আগের জায়গায় রাধানাথবাবুর খাটের ওপর বসল, "সার্কাস-ফার্কাস বাপ-বোন—দুত্তোর! আর ভাল লাগে না। আমারই হয়েছে মরণ", মাথার কয়েকটা কাঁটা পড়েছিল যমুনার হাতের কাছে, সেগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে সে আপন মনে বলে উঠল।

ঘড়ি না থাকলেও সময় বুঝতে পারে যমুনা। রাধানাথবাবুর ফিরতে এখনো অনেক দেরি। তার জন্যে জেগে বসে থাকতে হবে যমুনাকে। ঘুম পেলেও সে ঘুমুতে পারে না, ঘুমিয়ে পড়লে শীতের রাতে আবার উঠে মাতাল বাপকে খাওয়াতে তার বড় কষ্ট হয়।

দিশী মদের উৎকট গন্ধ বার হয় রাধানাথবাবুর গা থেকে। তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না যমুনা, ঘৃণায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তাকে যন্ত্রের মতন করে তোলে—অশুচি অপবিত্র নোংরা একটা জীবের মতন মনে হয় রাধানাথবাবুকে। যমুনা তার সঙ্গে কোন কথা বলে না।

খেতে বসে রাধানাথবাবু ভয়ে ভয়ে এক-একবার চোখ তুলে যমুনার অপ্রসন্ন মুখ দেখবেই। অসংলগ্ন কথা বলে বলে তার দেরি করে ফেরার একটা ব্যাখ্যা শোনাবার চেষ্টা করবে তাকে। কখনো হাসবে, কখনো মুখ বড় করুণ করে তুলবে। রাধানাথবাবুর স্বর, তার কথা এবং উপস্থিতি যমুনার অস্বস্তিকর অনুভূতি আরও ফেনিয়ে তুলবে। তখন খাটে বসে কম্বল টেনে নেবে যমুনা, কান মাথা মুখ চোখ—সব ঢেকে শুয়ে পড়বে।

"যমুনা?" শিবনাথ যমুনার পাশে এসে বসল এবং বসে বড় মধুর করে তার নাম ধরে ডাকল।

"উঁ?"

"এবার যেখানে নতুন ক্যাম্প হবে—বড় ফাস্ট কেলাশ জায়গা। খেলা দেখিয়ে সুখ পাবে। বড়লোকের পাড়া।"

যমুনা ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে শিবনাথকে বিদ্রূপ করার মতন শুধু বলল, "হুঁ?"

"জুয়েল সার্কাসও বড় হয়ে যাবে। টালিগঞ্জের ক্যাম্প থেকেই ট্র্যাপিজ শুরু হবে। কোহিনুর থেকে ঊষা আর পুষ্পরাজ এসে জুটেছে যে—দেখ নি?"

"দেখেছি।"

"তুমি ট্র্যাপিজ শিখবে না?"

মাথার একটা কাঁটা দিয়ে নিজের আঙুলে সুঁচের মতন খোঁচা দিল যমুনা এবং শিবনাথকে আঘাত করবার স্বরে উষ্মা প্রকাশ করল, "কে শেখাবে. আপনি?"

যমুনার অসন্তোষের কারণ শিবনাথের কাছে স্পষ্ট হল না বলে সে বিব্রত হয়ে বলে উঠল, "ঊষা পুষ্পরাজ—এরাই শেখাবে—"

"নাকি?" যমুনার চোখ অবজ্ঞা ও হতাশার ভারে ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। মাথার কাঁটা আরও জোরে আঙুলে চাপতে চাপতে সে বলল, "এমন করে কথা বলছেন শিববাবু, যেন আপনিই এই সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার। কে আমাকে ট্র্যাপিজ শিখতে দিচ্ছে, আরও কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে না সার্কাসে?"

"তোমাকে শিখতে দেবে না মানে? ইয়ার্কি নাকি?" যমুনার গলায় একটা

বিষণ্ন সুর কাঁপছিল বলে উত্তেজিত হয়ে পড়ল শিবনাথ—খুব জোরে জোরে কথা বলল।

"আমি সব জানি শিববাবু! যে এই সার্কাস চালাবার মালিক, সে আমাকে বাদ দিয়ে ঠিকই চালিয়ে নেবে—"

"কে, হারকু সাহেব?"

"তা ছাড়া আর কে", একটা ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলল যমুনা, অন্য দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলল, "সে-ই তো সব!"

"না যমুনা, সে-ই সব নয়", যমুনার দু হাত শক্ত করে ধরে শিবনাথ তাকে তার শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল, "কী জানে হারকু সাহেব? থানা, মিউনিসিপ্যালিটি, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট—আমিই তো যাই সব জায়গায়। আমি না থাকলে দেখতাম সে কেমন করে সর্দারি করে—"

যমুনা শিবনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যার সর্দারি করবার সে তা করে যাবেই—ওসব বলে কী হবে শিববাবু? বুঝলেন, হারকু সাহেবকে মাথার ওপর থেকে নামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের কারুর নেই—"

যমুনা তার শক্তির ওপর আস্থা রাখে না মনে করে শিবনাথ ক্ষিপ্তের মতন চীৎকার করল, "আলবত আছে!"

তাকে কাছে টানল যমুনা, তার মাথা বুকে চেপে ধরল এবং কানের কাছে মুখ এনে পরিহাস করার মতন বলল, "পারেন আপনি জুয়েল সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার হতে?"

শিবনাথের এখন বিশ্ববিজয়ের কথা মনে থাকল না। যমুনার নিশ্বাস, তার ঘ্রাণ ও সান্নিধ্য তাকে ভিতরে ভিতরে বড় দুর্বল এবং অসহায় করে তুলছিল। এইসব কাতর ও ভয়ঙ্কর মুহূর্তে একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃতপ্রায় মানুষের মতন শিবনাথ বলল, "হ্যাঁ যমুনা, আমি ইচ্ছে করলেই জুয়েল সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার হতে পারি!"

"আমি মানত করব শিববাবু—পুজো দেব। সত্যি আপনি জেনারেল ম্যানেজার হবেন?"

"শিবনাথ দাস বাজে কথা বলবার মানুষ নয় যমুনা! এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি—"

খুশিতে উপচে উঠে যমুনা বলল, থাক থাক, আপনার মুখের কথার দাম কত! আমি দিন গুনব শিববাবু, আপনি জেনারেল ম্যানেজার হলে বাঁচব", একটু থেমে শিবনাথের গালে গাল ঘষতে ঘষতে সে ছাড়া ছাড়া স্বরে অনুযোগ করার মতন বলল, "অপমান আর সইতে পারি না!"

"কে তোমাকে অপমান করল? হারকু সাহেব?"

যমুনা ভেবে ভেবে শিবনাথের কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তখন মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলল হাসি—অন্ধকারে যমুনা ও শিবনাথকে দেখতে দেখতে বলল, "খেতে দিবি না দিদি? বড্ড খিদে পেয়েছে যে!"

শিবনাথের কাছ থেকে ছিটকে এল যমুনা। আপন মনে একটা ঘোর কাটিয়ে নিতে নিতে বলল, "কী শিববাবু, খাবেন না? উঠুন, রাত ভোর হয়ে গেল যে!"

"হোক না", যমুনার বালিশ কোলের ওপর চেপে ধরে হাসির দিকে তাকিয়েছিল শিবনাথ—হাসছিল।

"শিববাবু, খাড়া হোন!"

খাওয়ার পর যমুনার তাঁবু থেকে বেরিয়ে শিবনাথ একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়েছিল। একটু বেশী খাওয়া হয়ে গেছে। এখন সিগ্রেটের স্বাদ তার নতুন মনে হচ্ছিল। আর কিছু সময় হয়তো থাকা যেত যমুনার কাছে—তবে রাধানাথবাবুর ফেরবার সময় হয়েছে—যমুনার কথা ভেবেই সে বেরিয়ে পড়েছে।

আদেশের মতন হারকু সাহেবের রূঢ় স্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবনাথ। এত সময় যে আবেশ-স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, একটা কঠিন নাড়া খেয়ে তা হঠাৎ খসে পড়ল।

শিবনাথ নড়ল না। বড় তাঁবুর প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে একটা উত্তেজনার বশে সে ঘন ঘন সিগ্রেট টানতে থাকল। তাকে লক্ষ করেই এগিয়ে আসছিল হারকু সাহেব।

"কী শিববাবু, আমাকে আউট করবার শলা-পরামর্শ ফিনিশ হল?"

ত্রস্ত একটা ছায়া কয়েক মুহূর্তের জন্যে শিবনাথের মুখ বিবর্ণ করে রাখল। নাকের কাছে আঙুল নিয়ে এল সে—সিগ্রেট ঘুরিয়ে জ্বলন্ত বিন্দুর তাপ উপভোগ করবার চেষ্টা করল।

"কী বলছেন?"

গলার স্বর অনেক তুলল হারকু সাহেব, "কেন আপনি রাতের বেলা আওরতের তাম্বুতে গিয়েছিলেন, বলেন?"

সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলল শিবনাথ। ঝপ করে পায়ের শব্দ করল এবং সে-ও হারকু সাহেবের মতন উঁচু স্বরে বলল, "আমার খুশি!"

"আপনি ঝুটমুট আমাকে আউট করবার ফিকির করছেন শিববাবু", হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিল হারকু সাহেব, "আমার সার্কাসের সব মানুষ আউর জানোয়ার আমার লিয়ে জান দিতে তৈয়ার। তবে হাঁ শিববাবু, আমার সার্কাসে কুত্তি ভি আছে—ওই কুত্তি পিছন থেকে কামড় মারলে আমি তার মাথায় জুত্তি লাগাই—"

হারকু সাহেবের কথা শুনতে শুনতে শিবনাথের মনে হল তার শরীরের সব রক্ত মাথায় জমাট বেঁধে দপদপ করছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে চীৎকার করে উঠল, "হারকু সাহেব, একদম চুপ!"

"আপনি চুপ থাকবেন শিববাবু! রোয়াব দেখলাবেন কুত্তির তাম্বুর ভিত্রে—আমার সামনে না। আপনি বাবুর লোক, আপনাকে আমি বহুত খাতির করেছি। এখন আপনি যদি চাক্কু চালাবার মতলব করেন তবে আমিও গোলি মেরে দিব—খেয়াল রাখবেন!"

হারকু সাহেবকে প্রহার করার ইচ্ছায় একটা হাত তুলেছিল শিবনাথ, কিন্তু কথা শেষ করেই সে তার সামনে থেকে সরে গেছে—নিজের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঠাণ্ডা রাত গ্রীষ্মের দুপুরের মতন মনে হচ্ছিল শিবনাথের। সে মাতালের মতন পা ফেলছিল।

॥ নয় ॥

যে ঋতু সার্কাসের মানুষের সবচেয়ে প্রিয় তার খেলা হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেল। বাতাস এখন হালকা, মৃদু একটা উত্তাপে ভর করে যখন-তখন ছুটছে। ঝোপের মতন গাছের উঁচু-উঁচু শাখায় থেকে থেকে পিছলে পড়ছে পাখির স্বর।

কিন্তু ঋতুর এই পরিবর্তন সার্কাসের মানুষের কাছে সুখকর নয়। কেননা যেমন করে শীত চলে গেল, এরপর তেমন করেই আসবে গ্রীষ্ম। তারপর বর্ষা।

সেই সব সময় বড় অবসন্ন হয়ে পড়বে জন্তু-জানোয়ার, গরম হয়ে থাকবে খেলার সব সরঞ্জাম। খেলতে-খেলতে হাত জ্বলে যাবে, পিছলে যাবে।

এবং একপাল হিংস্র জন্তুর মতন বর্ষার হাওয়া ছুটে আসবে খেলার সময়। কতবার খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। বৃষ্টির জল কাঁদাবে তাঁবুর মানুষদের। সাপ ব্যাঙ—আরও কতরকম পোকা-মাকড় তাদের গা ঘেঁষে থাকবে। কখনো-কখনো ঝড়ের দাপটে ধসে পড়বে তাঁবু তখন তাদের পায়ের তলায় শুধু ভিজে মাটি আর মাথার ওপর আকাশ। তা-ও ঝড়ে-জলে ঝাপসা।

জুয়েল সার্কাসের মালিক রঘুনাথ দাস কিছুদিন আগে আরও কয়েকটা জানোয়ার কিনতে বেরিয়ে পড়েছিল, ফিরে এল শীতের পর-পর। তার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছল বাঘের একটা বড় খাঁচা—তার মধ্যে দুটো রয়েল বেঙ্গল।

অন্য সার্কাসের বাঘ নয়, এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জোড়ে কিনেছে রঘুনাথ দাস। হয়তো দাম একটু বেশীই পড়েছে। এক জোড়া রয়েল বেঙ্গল আট হাজার টাকা। সব টাকা দেওয়া হয়নি, আরও তিন হাজার টাকা বাকি। পরে, আস্তে আস্তে শোধ করে দিলেই চলবে। তাড়াতাড়ি খেলা শিখিয়ে রিং-এ নামাতে পারলে তিন চারটে ক্যাম্পে দাম উঠে যাবে বাঘের।

রঘুনাথ দাস শুধু বাঘ নিয়ে আসেনি একবালপুর রোডের ভাঙা ভাঙা ক্যাম্পে, আসবার সময় লিলুয়া হয়ে তার বাঙালী বউ যশোদা আর সব ছেলে-মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

মেজাজ এখন বড় প্রসন্ন রঘুনাথ দাসের। দুটো রয়েল বেঙ্গল এক সঙ্গে কেনা সহজ কথা নয়। তার কোম্পানী বড় হচ্ছে। ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে আর কিছু পরে জুয়েল সার্কাস ভারতবর্ষের সব বড় বড় শহরে খেলা দেখাতে পারবে।

হারকু সাহেবের মতন রঘুনাথও স্বপ্ন দেখতে পারে এখন। এবং দেখেও। অল্পে অল্পে বাড়ছে জুয়েল সার্কাস, আস্তে আস্তে নাম করছে। অন্যান্য সার্কাসের যেসব মালিক একদিন তুচ্ছ করেছে রঘুনাথকে—আমল দিতে চায়নি, আজ তারাই তাকে ঈর্ষা করে।

পুজো কিংবা শীতের সময় কোন বিখ্যাত অঞ্চলে জুয়েল ক্যাম্প ফেলবার চেষ্টা করছে জানতে পারলে অন্য সার্কাসের মালিক এখন আরও বেশী টাকা দিয়ে জুয়েল-এর ঠিক করা জমি নিজের জন্যে ধরে রাখে। রঘুনাথের সার্কাস সে-জায়গা আর পায় না।

এই সব কারণে উত্তেজিত হয়ে হারকু সাহেব অন্য সার্কাসের মালিককে

গালাগালি করলেও রঘুনাথ রাগে না। হাসে। এবং মনে মনে একটা অহঙ্কারেরই স্বাদ পায়। কেননা কোন সার্কাসের মালিকের কাছে অন্যান্য কোম্পানীর মতন কখনো সাহায্য নিতে যায়নি রঘুনাথ দাস—এক রাতের জন্যেও কোন আর্টিস্ট কিম্বা জানোয়ার ভাড়া করে নিয়ে আসেনি।

যা আছে জুয়েল সার্কাসে—মানুষ জানোয়ার খেলার সরঞ্জাম—সবই রঘুনাথের নিজের। তা-ই দেখে যদি খুশী হয় মানুষ—হোক। না হলে গরিব হয়েই থাকবে রঘুনাথ। পরের সার্কাস থেকে খেলোয়াড় কিংবা জানোয়ার ধার করে লোক ঠকাবে না—পরের জিনিসকে নিজের বলে চালাবার কোন চেষ্টাই সে করবে না কখনো।

রঘুনাথ বড় তৃপ্ত স্বরে বলে, "ভগবান দিল তো বটে আমাকে! দিল না? আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেছিল, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। কে আবার আমাকে টেনে তুলল গো! ওই ভগবান!"

"ভগবান না ছাই," রঘুনাথের ভক্তি গদগদ চেহারা দেখতে দেখতে যশোদার স্থূল দেহের ওপর বসানো গোল মুখ কাটা মুণ্ডুর খেলার মতন নড়ে ওঠে, "বলি, এর মধ্যেই সব গুলে খেয়ে বসে আছ? দাদা বাঁচিয়ে দিল না তোমাকে? উঃ, যা ব্যারাম হয়েছিল, মুখের সামনে আমার ভাই দেড় শো টাকা তখন ধরে না দিলে দেখতাম কেমন হেঁটে-চলে বেড়াও তুমি—কেমন করে সার্কাসের মালিক হও!"

"কথাটা ঠিক বলেছ বটে তুমি যশো", রঘুনাথ আঙুল দিয়ে তার ঘন গোঁফ চটকাতে চটকাতে গভীর কৃতজ্ঞতার কথাই প্রকাশ করতে চায়, "তবে তোমার ভাইকে আমার খাটিয়ার কাছে সেই সময় পাঠিয়ে দিল কে গো? সে তো ভগবানই বটে!"

যে-ই পাঠাক যশোদার ভাইকে রঘুনাথের অসুখের সময় তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে, যশোদার চাল-চলন তাঁবুতে এলেই এমন হয়ে ওঠে যেন এ সার্কাস তার দাদার এবং সেকথা ভেবেই সে খুশী মতন কথা শোনায় সার্কাসের মেয়েদের—তাদের দিয়ে নিজের ও বাচ্চাদের সব কাজও করিয়ে নেয়। রঘুনাথ ভগবানের কথা তুললেই যশোদা ধরে নেয় সে কৌশল করে তার দাদার ঋণ অস্বীকার করতে চায়।

জুয়েল সার্কাসের বয়স অনেক হল। আট-দশ বছর তো বটেই। এখনো সেই সব পুরনো কথা মনে করে সুখ পায় রঘুনাথ। এক-একটি পিছল ধাপ পার হয়ে আজ সে বড় হয়েছে, সফল হয়েছে—তা ভেবে ভগবানের ওপর তার বিশ্বাস আরও গভীর হয়।

রঘুনাথের বাবা দুটো অজগর সাপ রেখে গিয়েছিল তার জন্যে। বলেছিল, "এ দু'টা সাপকে যত্ন করবি রঘু, ভক্তি করে পালবি—এরাই তোকে খাওয়াবে—শুনলি, এ রঘুয়া?"

ঠিক কথাই বলে গিয়েছিল রঘুনাথের বাপ। অজগর সাপ রঘুনাথকে অন্ন জুগিয়েছে অনেক দিন। তার শেরপুরের ঘরে মানুষ এসেছে, কাচের বাক্সে সাপ দেখে প্রণাম করেছে—পয়সা রেখে গেছে।

একটা অজগর মরেছে, আর একটাকে আজও যত্ন করে লিলুয়ার বাড়িতে রেখেছে রঘুনাথ দাস। লোক ডেকে ডেকে দেখিয়ে আজও সে বলে, "এই দেখ আমার অন্নদাতা। বড় পুণ্যবান অজগর আছে হে!"

বাংলা দেশের গ্রামে শহরে মেলায় মেলায় অজগরের বাক্স নিয়ে দিনের

পর দিন বসেছে রঘুনাথ দাস। শুধু সাপ না, পরে তার সঙ্গে কাটা মুণ্ডুর খেলাও সে দেখিয়েছে—ছোট তাঁবু কিনেছে, এই জন্যে কিছু কিছু সরঞ্জামও যোগাড় করেছে, দু'-একজন লোকও রাখতে হয়েছে তাকে।

তখন রঘুনাথের খেলার নাম ছিল জুয়েল ম্যাজিক শো। তা থেকেই আজ দি গ্রেট জুয়েল সার্কাস। রিং-এর মধ্যে এখন সাপের বাক্স বসিয়ে রাখা চলে না, কাটা মুণ্ডু আর বড় বড় কাচের প্রয়োজনও আজ ফুরিয়েছে—সে সবের বদলে কোন কোন খেলা এখন দেখিয়ে চলেছে রঘুনাথের সার্কাস—সে তার জন্তু-জানোয়ার ও মানুষের সংখ্যার হিসেব করে। এবং সব শেষে রঘুনাথ তার সফলতার কথা ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্নের মতন ভগবানের নাম নেয়।

কিন্তু এত বড় হতে পারত না রঘুনাথ। এত জানোয়ার, তার অধীনে এত মানুষ দেখবার ভাগ্য হয় তো তার হত না। আর দু-একটা রাত গেলেই সে-বছর অণ্ডালের কাছাকাছি উখড়ার ঝুলনের মেলায় শ্রাবণ মাসে রঘুনাথ দাসের জুয়েল ম্যাজিক শো'র শেষ খেলা হয়ে যেত!

নানা জায়গায় ঘুরতে হত রঘুনাথকে—থাকা এবং খাওয়ার অনেক কষ্ট সহ্য করতে হত। এমন অনিয়ম আর অত্যাচার করে-করে ভিতরে-ভিতরে তার শরীর ভেঙে এসেছিল। এক-একবার বুক জ্বালা করত, কাশির বেগ ঠেলে উঠত। লাল-লাল থুতু—রক্তের মতন।

উখড়ার মেলায় হঠাৎ একদিন রঘুনাথ সকালবেলা আর উঠতে পারল না। অনেক জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা। মাথার কাছে কাটা মুণ্ডু, সাপের বাক্স—এসব খোলা চোখে ঝাপসা দেখল রঘুনাথ। সে মরে যাচ্ছিল।

মেলা চলছে তখনো। তেলে ভাজার গন্ধ উঠছে। বাঁশি বাজছে। বাজি পুড়ছে। রঘুনাথ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। তার লোকজন কেউ নেই। তার জ্বর বাড়তে দেখে তারা ধরে নিয়েছিল যে সে আর বাঁচবে না। রঘুনাথকে একা রেখে টাকা-পয়সা চুরি করে তার দুজন লোক উখড়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

একা একা পড়েছিল রঘুনাথ। তাঁবুর ভিতরে আবছা অন্ধকার। কাছেই সার্কাস বসেছে, বাঘ গর্জন করছে থেকে থেকে। যারা পয়সা করতে এসেছিল—তারা পয়সা করে নিচ্ছে। শুধু রঘুনাথ পড়েছিল—নিঃস্ব, অসুস্থ।

"কই গো, কাটামুণ্ডুর খেলা হবে না?"

চোখ মেলে রঘুনাথ দেখল তার ছোট তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়েছে একজন মানুষ, সঙ্গে একটি মেয়েও ছিল—মেলায় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে যাত্রা-সার্কাস—এই সব দেখতে এসেছে। তাঁবুর বাইরে এখনো ছিল জুয়েল ম্যাজিক শো'র সাইন বোর্ড। দু-দিকে দুটো কাটা মুণ্ডু, মাঝখানে বড় বড় অজগর।

দর্শক ফিরে যাবে, খেলা দেখাতে পারবে না রঘুনাথ—সে মরে যাচ্ছিল। মাথা তুলে সে তার দর্শকদের দিকে ঝাপসা চোখে তাকাল এবং কান্নার মতন বলল, "খেলা খতম বাবু, আমার জীবন খতম—"

রঘুনাথ মদ খেয়ে পড়ে আছে এবং প্রলাপ বকছে মনে করে দর্শক কিছু পিছিয়ে গেল, নাক ফুলিয়ে মদের গন্ধ পাবার চেষ্টা করল, "শালা, বেসামাল হয়ে কেলিয়ে পড়ে আছ মেলায়?"

রঘুনাথ তার কথা বুঝল, টপ টপ কয়েক ফোঁটা জল পড়ল তার চোখ দিয়ে, শার্টের হাতায় তা মুছে সে ধুঁকতে-ধুঁকতে বলল, "বাবু, একটু ভুল বললেন। শরাব পিয়ে জাহান্নামে যাবার মানুষ আমি না বাবু, আমার গা

ছুঁয়ে দেখেন জবরের তাপ—আমাকে ভগবান মেরে দিল!"

"হল কী?" দর্শক ঝাপসা অন্ধকারে সাপ দেখল, কাটামুণ্ডু দেখল এবং কাতর মৃতপ্রায় এক মানুষকে দেখতে দেখতে ঝুলন পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে একটা মানবিক বোধে ঈষৎ বিহ্বল হয়ে বলল, "মেলার মানুষকে খবর দিলে না, কোন চিকিৎসা হল না?"

"না বাবু, কে শুনবে কথা? এখানে মানুষ এল টাকা রোজগারের ফিকিরে—ব্যারামীর সেবা করবার টাইম কার হবে!"

"বাড়ি কোথায় তোমার গো?"

মৃতের মুখের হাসির মতন তপ্ত শুষ্ক ঠোঁট অল্প ফাঁক হল রঘুনাথের। সে আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছিল, করুণাসাগরের এক-একটি দ্রুত ঢেউ তার জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন শয্যা নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল, "আমার বাড়ি শেরপুর গ্রামে, পাটনা শহর থেকে দূর হবে আট-দশ মাইল", কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রঘুনাথ বলল, "বাড়ি আমি যাব না বাবু—"

"কোথায় যাবে গো?"

তার ব্যর্থ দর্শককে হঠাৎ ঈশ্বরের দূত বলে মনে হয়েছিল রঘুনাথের। মেয়েটি তখন পিছন ফিরে জোড়া অজগর দেখছিল, ভয়ে-ভয়ে কাটামুণ্ডুর কাছে হাত নিয়ে যাচ্ছিল।

রঘুনাথ উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল, "বাবু, আমি আসানসোলে যাব—আমি বার্নপুরে যাব। আমার সাপ, তাম্বু, কাটা মুণ্ডু, সব নিয়ে যাব।" কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল রঘুনাথের, তার চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছিল—জীর্ণ শয্যায় আছড়ে পড়ে রঘুনাথ ছটফট করল, "দেড় শো-দু' শো টাকা পেলে আমি ওষুধপথ্য করতে পারতাম, খেলবার জন্যে মনে বল পেতাম—" তার কাশি হল, থুতু গড়িয়ে এল, মৃত্যুর মতন নিশ্বাস বার হল বুকের হাড় চিরে, "কোথায় পাব টাকা! আমার জীবন খতম! ও বাবু, আপনি দোসরা তাম্বুতে যান, অন্য মানুষের খেল্ দেখুন—" জীবনে প্রথম দর্শককে এমন করে ফিরে যাবার কথাও বড় কষ্ট করে বলতে হয়েছিল রঘুনাথকে।

সেদিন যশোদাকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল তার দাদা কৈলাস এবং একা পড়ে পড়ে রঘুনাথ আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। স্বপ্নের ভিতরে তার সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তখনো তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং ঘণ্টা ধ্বনির আওয়াজ হচ্ছিল অন্ধকার তাঁবুতে। বড় বড় কাচ প্রতিবিম্ব ধরে রেখেছিল কাটা মুণ্ডুর। মরতে মরতেও রঘুনাথের মনে হচ্ছিল, ঘণ্টাধ্বনির তালে তালে তার কাটামুণ্ডু খেলে যাচ্ছে।

যাকে ঈশ্বরের দূত বলে মনে হয়েছিল রঘুনাথের, যে খেলা দেখতে এসে মৃতপ্রায় একটি মানুষকে মাতাল বলে অবহেলা করেছিল প্রথম প্রথম এবং কোন কথা না বলে ফিরে গিয়েছিল, সে আবার এল পরদিন সকালেই।

এবার একা এসেছিল কৈলাস। সে রঘুনাথকে নিয়ে যাবে তার ডেরায়। ওষুধ-পথ্য দেবে, মাছ দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। এমন না করলে—কৈলাসের তখন ধারণা জন্মেছিল—তাকে মহাপাতকের অংশীদার হতে হবে।

ধর্মপ্রাণ ভীরু এক মানুষের মতন পুণ্য করবার লোভেই শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে রঘুনাথকে তার তাঁবু সাপ ও কাটামুণ্ডু আর সব সরঞ্জাম সমেত উখড়ার মেলা থেকে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল কৈলাস। সে তার জীবন

ফিরিয়ে দিয়েছিল, যা চেয়েছিল রঘুনাথ—দেড় শো টাকা তা-ও দিয়েছিল। পুণ্য তিথিতে যাকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিল কৈলাস, চিরকালের মতন একটা পাকাপাকি সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে তার সঙ্গে যশোদার বিয়েও সে দিয়েছিল।

অকৃতজ্ঞের মতন এসব কথা ভুলে যাবার মানুষ রঘুনাথ নয়—তার মন না বুঝে যশোদা এখন তাকে যা-ই বলুক না কেন!

"এবার ঝুলনে উখড়ার মেলায় খেলবার বনবস্ করেন হারকু সাহেব", পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে অফিস-টেণ্টে বসে সকালবেলা বলল রঘুনাথ।

সুবলবাবু গোকুলবাবু নবীন সহদেব বাহাদুর—এরা সকলেই এখন ছিল, হারকু সাহেব রঘুনাথের কথা শুনে প্রত্যেকের মুখ দেখল। কারুর সামনে না, সে পরে বাবুর সঙ্গে উখড়া ক্যাম্পের আলোচনা করবে।

সুবলবাবু দাঁড়িয়ে ছিল, তার কোলে ছিল রঘুনাথের ছোট মেয়ে। মাথায় দুটো বড় বড় ফোড়া হয়েছে বলে মেয়ে থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল। তার মাথায় ফুঁ দিতে দিতে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিল সুবলবাবু।

সুবলবাবুকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল রঘুনাথ, "ওকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বড় কষ্ট বেচারির—রাতে একদম ঘুমাতে পারে না।"

"আমি এখুনি যাচ্ছি বাবু। ওই তো রাস্তার ওপারেই ডাক্তারখানা—"

সুবলবাবু রঘুনাথের মেয়ের মাথায় ফুঁ দিতে দিতে চলে যাচ্ছিল, তখন তাকে আবার ডাকল রঘুনাথ, পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলল, "কী রকম বুদ্ধি আপনার সুবলবাবু? টাকা-পয়সা না নিয়ে চলে যাচ্ছেন? ওষুধ-বিসুধের দাম লাগবে না?"

হা-হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব, "জুয়েল সার্কাসে নোকরি নিলে, বুঝলেন বাবু, মানুষগুলো এক রাতের ভিত্তর একদম বুদ্ধু বনে যায়! কেমন সব মানুষ লিয়ে আমাকে এত বড় কোম্পানীর কাম চালাতে হয়, বুঝে দেখেন!"

দশ টাকার নোট হাতে নিল সুবলবাবু। মালিক ও জেনারেল ম্যানেজারকে কাজ দেখাবার জন্যে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সে রঘুনাথের ছোট মেয়ের মাথায় খুব জোরে-জোরে ফুঁ দিতে থাকল। হারকু সাহেবের হাসি এত লোকের সামনে বড় লজ্জা দিয়েছে সুবলবাবুকে।

"যান যান সুবলবাবু", হারকু সাহেব বলল, "দেরি করবেন না। নবীন সহদেব বাহাদুর, তোরা নয়া বাঘের কাছে যা। দুধের গামলা খাঁচার ভিত্তর গেছে কিনা দেখ। মদনবাবুকে বলবি বাঘের গায়ে-পায়ে কাঁচা হলদি ছিটিয়ে দিতে। গোকুলবাবু, আপনি ছাপাখানায় চলে যান। টালিগঞ্জ ক্যাম্পের জন্যে দু হাজার হ্যাণ্ডবিলের অর্ডার দিবেন। ট্র্যাপিজের ব্লক মারবেন। বুঝলেন কথা?" গেটের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে উঠল হারকু সাহেব, "দেখেন দেখেন বাবু, বাচ্চার মাথায় কত জোরে ফুঁক দিচ্ছে সুবলবাবু—সিটিতে ফুঁক দিবার মতন। শালা একদম বুদ্ধু!"

রঘুনাথ হাসল, "মানুষটা বড় ভাল।"

অফিস-টেণ্টে রঘুনাথকে ঘিরে যারা ছিল, তাদের সকলকে এক-এক কাজের ভার দিয়ে কৌশল করে সরিয়ে দিল হারকু সাহেব। এখন কেউ নেই।

তাহলেও সে খুব সতর্ক হয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। এবং চেয়ার টেনে রঘুনাথের আরও কাছে এসে বসল।

"উখড়ায় ক্যাম্পের কথা বলছিলেন বাবু?"

"হাঁ হাঁ", রঘুনাথ কমবয়েসী লাজুক ছেলের মতন হাসল এখন, "সে তো বহুত দেরি আছে, আরও চার-পাঁচ মাস বাদ ঝুলনের সময়—"

"ঠিক বাত। টাইম অনেক আছে। লেকিন এ সালে সেইখানে খেলার অনেক মুশকিলও আছে। আমাদের চুপে-চুপে ভিত্তর-ভিত্তর আভভি বন্দবস করতে হবে।"

"কেন?"

"আমার খবর, এ সালে উখড়ায় ইণ্টারন্যাশেনেল খেলবে।"

রঘুনাথ বিব্রত হয়ে বলল, "তবে দরকার নাই। দোসরা সালে দেখা যাবে। আমরা বার্নপুরে খেলব, রানীগঞ্জে খেলব—আরও কত জায়গা আছে! ইণ্টার-ন্যাশেনেলের মালিক সুবোধবাবু বড়া আদমি, তাকে আমি শত্রু বানাতে রাজী না হারকু সাহেব।"

"আপনিও এখন বড়া আদমি হয়ে গেলেন বাবু। রয়েল বেঙ্গল এসে গেল, ট্র্যাপিজ চালু হয়ে গেল—এখন ভাল ভাল জায়গায় ক্যাম্প গাড়বার দরকার।"

"টালিগঞ্জ থেকে কোথায় যাবেন?"

হারকু সাহেব একটু ভেবে বলল, "বাদুড়িয়ায় আট-দশ দিন খেলবার মতলব আছে। তারপর কৃষ্ণনগর—সেখানে বারো দোলের মেলায় খেলা জোর চলবে।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক বাত। বর্ষার সময় কোলিয়ারির দিকে যাব, আর পুজোর সময় এবার বাটানগরে—"

বাটানগরের নাম শুনেই চমকে উঠল হারকু সাহেব, নিজের মুখের কাছে একটা আঙুল তুলে রঘুনাথকে চুপ থাকবার ইঙ্গিত করল, "চুপ বাবু, আস্তে! বাটানগরের নাম জোরে বলবেন না—"

"কেন? সেখানে পাবলিকের সাথে ঝগড়া লাগল নাকি কোন্ সার্কাস পার্টির?"

"আরে না না বাবু। আপনার খেয়াল নাই, আগের সালে কোহিনুর আর ইণ্টারন্যাশেনেল পুজোর সময় খেলবার মতলব করেছিল বাটানগরে। কোহিনুর বড় কোম্পানী, তা-ও জমি পেল না, খেলবার পারমিশন পেয়ে গেল ইণ্টার-ন্যাশেনেল," হারকু সাহেব এক-একবার বাইরে তাকিয়ে লক্ষ করছিল কাছা-কাছি কেউ আছে কি-না এবং থেমে থেমে গল্প বলবার মতন এসব কথা শোনাচ্ছিল রঘুনাথকে, "খুব রাগ হল কোহিনুরের মালিকের। ইণ্টার-ন্যাশেনেলের পয়লা দিনের পয়লা শো একদম মার্ডার করে দিল।"

"তা কেমন করে হল?" কিছু না বুঝে হারকু সাহেবের মুখের দিকে কৌতূহলী শ্রোতার মতন তাকিয়ে থাকল রঘুনাথ। চা কিংবা সিগ্রেট—তার এখন কিছুই খাবার ইচ্ছে হল না।

হারকু সাহেব বলল, "ইণ্টারন্যাশেনেলের সব মাল ট্রাকে গেল না, খেলার আগে আগে ঠিক টাইমে রেল গাড়িতে পৌঁছবার বন্দবস্ হল। ব্যাস, রেল গাড়ি দো ঘণ্টা লেট! শালারা চেন টেনে টেনে ইণ্টারন্যাশেনেলের পয়লা দিনের পয়লা শো—শুনলেন বাবু, অনেক টাকার লস্ খাইয়ে দিল।"

"ক্যা তাজ্জব!" সার্কাসের মানুষের এই রকম নীচ প্রকৃতির কথা মনে করে মুখ নামিয়ে থাকল রঘুনাথ।

"ক্যাম্পের খবর কাউকে জানান ঠিক না। সব শালা বদমাশ। ঘুষ খায় আর চাকু চালায়!"

"হাঁ হাঁ, ঠিক বাত।" একটা কথা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল রঘুনাথের, তাহলেও বলল, "সার্কাসের মানুষই সার্কাস ভেঙে দেয় হারকু সাহেব, বড় হতে দেয় না।"

"ওই জন্যে বেইমানদের চিনে রাখা দরকার—শালাদের মুখে লাথি!"

রঘুনাথ অসহায় মানুষের মতন শুকনো হেসে বলল, "বেইমান বহুত আছে, চিনা মুশকিল।"

"ঠিক ঠিক।"

হারকু সাহেব সিগ্রেটের প্যাকেট রাখল রঘুনাথের সামনে। খেলা করবার মতন দেশলাই-এর বাক্স সে একবার খুলল, খস করে বন্ধ করল। আবার খুলে কয়েকটা কাঠি আঙুলে চেপে ক্লাউনের ছড়ির মতন চরর্ চরর্ শব্দ করতে থাকল হারকু সাহেব।

রঘুনাথ একটা সিগ্রেট মুখে তুলতেই হারকু সাহেব জ্বলন্ত কাঠি এগিয়ে নিয়ে এল, "এবার কোহিনুরের মালিক অনেক রাগ করবে আমাদের উপর—লোকসান করিয়ে দিবার ফিকির করবে।"

সিগ্রেটের ধোঁয়া রঘুনাথের গলায় ধাক্কা দিয়েছিল বলে সে কাশতে কাশতে বলল, "পুষ্পরাজ আর ঊষার নাম মনে করে এই কথা বলছেন?"

"হাঁ বাবু।"

"ভগবানের উপর ভরসা রাখবেন। যার যা মতলব—করুক। আমাদের কোন লোকসান হবে না।"

এখন হারকু সাহেবও সিগ্রেট ধরাল। রঘুনাথের মুখের ওপর যেন ধোঁয়া না খেলে তাই সে অন্য দিকে তাকিয়ে সিগ্রেট টানছিল, "পুষ্পরাজ আর ঊষা পাক্কা খেলোয়াড়", হি-হি করে হাসল হারকু সাহেব, "বিজয়নকেও ভাগিয়ে নিয়ে এল, ক্লাউনটা শুধু এল না। যুগল ক্লাউনের কাম চালিয়ে লিবে বলছে—"

একটা বিস্ময় খেলছিল রঘুনাথের চোখে, তার শ্লথ আঙুল থেকে জ্বলন্ত সিগ্রেট পড়ে যাচ্ছিল, "আমাদের নতুন ছোকরা যুগল? ট্র্যাপিজ তার জানা আছে?"

"পুষ্পরাজ শিখলাতে শুরু করেছে। ছোকরা খুব চালাক। শালার উপর কড়া নজর রাখতে হবে—অন্য সার্কাসের দালাল ওকে ভাগিয়ে নিতে পারে—"

রঘুনাথ জিজ্ঞেস করল, "আমাদের আর কতজন আর্টিস্টকে ট্র্যাপিজ শিখবার কথা বললেন?"

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল হারকু সাহেব। শিবনাথের কথা মনে করে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মনের সে-ভাব দমন করবার চেষ্টা করতে করতে সে জোর করে হাসল এবং যথাসম্ভব নরম গলায় বলল, "লীলাকে দিলাম না। অত লোক এখন দরকার নাই পুষ্পরাজের। আমি যমুনা আর হাসিকে ট্র্যাপিজ শিখবার কথা বলেছি—"

"ভাল করেছেন। রাধানাথবাবু কী বলল? বড় খুশ হল তো?"

"হাঁ, বহুত খুশ হল। তার তাম্বুতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে দিল।"

হারকু সাহেবের বুক উত্তেজনায় ধকধক করে উঠছিল, "নিমন্ত্রণ খেতে যাব বাবু ওনার তাম্বুতে?"

"জরুর যাবেন। না যাবার ইচ্ছা কেন হল আপনার?"

"আওরাত আছে না? ওই তাম্বুতে আমার যাওয়া ঠিক হবে না বাবু।"

"আপনি জেনারেল ম্যানেজার", হারকু সাহেবের বিনয় মুগ্ধ করল রঘুনাথকে। বড় প্রসন্ন হয়ে সে এখন খুব জোরে জোরে কথা বলছিল, "সব তাম্বুতে আপনি খুশি মতো যাবেন।"

"আপনি পারমিট দিলেন, আমি জরুর যাব।" নিজের ঘাড়েই জোরে জোরে থাবা মারল হারকু সাহেব। এইরকম আস্ফালন করে সে মনে মনে তার শক্তি ও মনোবলকে প্রশ্রয় দিতে চাচ্ছিল, "শিববাবু পারমিটের কেয়ার করে না বাবু, রাতের আঁধারে যমুনার তাম্বুতে গিয়ে হাসি-তামাশা করে। কিছু একটা বিপদ হলে যমুনাকে কে সামাল দিবে বলেন? রাধানাথবাবুর সামনে কৈফিয়ত কে দিবে? দুর্নাম তো আমার কোম্পানীকে লাগবে—"

হারকু সাহেবের কথা শুনতে শুনতে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকল রঘুনাথ। খালি খালি চোখ, বিরস মুখ। সে ঠোঁটে ঠোঁট চাপছিল বলে তার গোঁফও নড়ে উঠছিল। রঘুনাথকে যা বলবার চেষ্টা করছিল হারকু সাহেব, তা বলা হয়ে গেল। এখন সে তার মেজাজ বোঝবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিল।

"শিবনাথ এত বড় বদমাশ হয়ে গেল!" বড় অবসন্ন স্বর রঘুনাথের। সিগ্রেট ফেলে দিয়ে সে দু হাতে গোঁফ চাপছিল, "আপনি তাকে বারণ করবেন—ধমক দেবেন।"

"অনেক বলেছি বাবু! সে আমার কথা শুনে না—আমার উপর তম্বি করে—"

"না না, হারকু সাহেব, আমার কোম্পানীতে এমন কাম চলবে না। শিবনাথ কোম্পানীর নিয়ম মানবে না—এটা কী রকম কথা হল?"

"ঠিক বাত। কোম্পানীতে থাকলে নিয়ম তো মানতেই হবে", হারকু সাহেব উঠে দাঁড়াল, "আমি রাধানাথবাবুকে একটুক নজর রাখতে বলব?"

"হাঁ বলবেন," হারকু সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখনও একটা বিস্ময় লেগেছিল তার চেহারায় এবং এক-একটি কথায়।

রঘুনাথ আর একবার অস্ফুট উচ্চারণ করল, "লিখাপড়া জানে শিবনাথ। ভদ্দর আদমি। আমার সার্কাসে খেলতে এসে বদমাশ হয়ে গেল!"

॥ দশ ॥

বাঘের খাঁচার ওপর এখন রোদের টাটকা আভা খেলে যাচ্ছে। এদিকে ঘাস নেই। চাকার ঘষা খেতে খেতে সব ঘাস মরে গেছে। মাটি নরম বলে খাঁচার চাকার আঁকাবাঁকা দাগ এখনো স্পষ্ট।

একদিকে মাটি পোড়া-পোড়া। ইটের ভাঙাচোরা একটা উনুনও আছে। বাঘ-সিংহের খাঁচার পিছনেই খুব পুরনো পাঁচিল, কোথাও কোথাও বড় বড় ফুটো। ছোট বড় ছেলেমেয়েরা সেখানে চোখ রেখে সার্কাসের জন্তু-জানোয়ার টিকিট না কেটেই দেখে যায়।

পাঁচিলের গায়ে একটা বটগাছও আছে। হাওয়া উঠলে খাঁচার ওপর পাতা কিম্বা ছোট ছোট ফল মাঝে মাঝে খসে পড়ে। রিং মাস্টারের সহকারীরা বাঘ-সিংহর পরিচর্যা করতে এসে কখনো কখনো বাসি রুটির টুকরো আর ডিমের খোলাও দেখতে পায়—কাকের মুখ থেকে পড়েছে।

একদিকে বাঘ-সিংহ-ভাল্লুকের খাঁচা, কিছু দূরে বাঁধা আছে হাতি উট আর বাচ্চা একটা ঘোড়া। ওদের মাথার ওপর কিছু নেই, ঝড়ে জলে রোদে ওরা এমন করেই দাঁড়িয়ে থাকে। উটের জন্যে জমা করা আছে প্রচুর নিমপাতা। হাতি সারাদিন ধরে চাল রুটি কলাপাতা চিবোয়। ঘোড়ার জন্যে তো ঘাস আছেই।

বাঘ-সিংহর খরচ অনেক। রোজ চোদ্দ-পনেরো কিলো মাংস, ওদের শরীর ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে সপ্তাহে একদিন মাংসর বদলে শুধু দুধ খাওয়ান হয়। ভাল্লুকও খায় দুধ ভাত। ফল খাওয়াতে পারলে আরও ভাল হয়—কিন্তু তার খরচ অনেক। জুয়েল সার্কাসের ভাল্লুক ফল খেতে পায় না এখন।

হাতির প্রকৃতি খুব ঠাণ্ডা হলেও মাহুত কিংবা রিং মাস্টারকে এক সময় বড় সতর্ক থাকতে হয়। একরকম রস গড়ায় তখন হাতির চোখ থেকে—কথা শোনে না, শাসন মানে না, ক্ষেপে থাকে। এ সময় খেলা দেখাবার চেষ্টা করলে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয় হাতি। মাহুত কিম্বা রিং মাস্টারকেও শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারে—পায়ের চাপে পিষে দেয়।

যদিও তেমন কোন দুর্ঘটনা এখনো ঘটেনি জুয়েল সার্কাসে। একমাত্র সিংহীই মাঝে মাঝে রিং মাস্টারকে থাবা মেরে মাংস খাবলে নেয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু চাবুকের কী জোর মদনমোহনের। সিংহী শুধু আস্ফালনই করে, আর কিছু করার সাধ্য থাকে না তার।

এক জোড়া শান্ত চিতা বাঘ, এক জোড়া সিংহ, ভাল্লুক হাতি উট আর বাচ্চা একটা ঘোড়া—এতদিন জুয়েল সার্কাসের চিড়িয়াখানায় এরাই শুধু ছিল, এখন এল দুটো রয়েল বেঙ্গল—সুরয আর চাঁদনী।

চাঁদনী ঝিমোচ্ছিল। সুরয বড় অস্থির। তন্দ্রাকাতর চাঁদনীকে প্রহরীর মতন পাহারা দিচ্ছে—এদিক-ওদিক ঘুরছে। খাঁচার মধ্যে টাটকা দুধ ঠেলে দেয়া হয়েছিল, এখন খালি গামলা পড়ে আছে। এক-একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখছে সুরয, কখনো গামলায় তার পা পড়ছে।

"কী রকম দেখলেন মদনবাবু?" রয়েল-বেঙ্গলের বড় খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে গর্ব প্রকাশ করার মতন রিং মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল রঘুনাথ দাস।

খাঁচার আরও কিছু কাছে এগিয়ে এল মদনমোহন। তার হাতে এখন চাবুক নেই, কিন্তু মুখ বড় অপ্রসন্ন। দুটো নতুন বাঘকে সে চুপচাপ দেখল কিছু সময়। বাঘের গলায় বকলেস বাঁধা—লোহার শেকল চামড়ার কাজ করে ঢেকে দেয়া হয়েছে। বকলেসের রিং-এ ইংরেজি 'ডি'র মতন লোহার একটা অক্ষর ঝুলছে।

বাঘের ট্রেনিং-এর সময় শেকল আর লম্বা দড়ি এক সঙ্গে জুড়ে বাঁধা হবে আর একটা 'ডি'র মতন অক্ষরে এবং তা বাঘের গলার 'ডি'র সঙ্গে আটকে দেয়া হবে, 'ডি—টাইট'।

রিং মাস্টার মদনমোহন সুরয আর চাঁদনীকে দেখতে দেখতে বলল, "বড় তেজী বাঘ বাবু!"

"রয়েল বেঙ্গল তেজী হবে না? বড় দরাদরি করতে হল! এখন তাড়া-

তাড়ি খরচা ওঠাতে না পারলে খুব মুশকিল হবে। আপনি জলদি-জলদি করবেন মদনবাবু।”

আবার পিছনে সরে এল মদনমোহন, একটু ইতস্তত করে শুকনো স্বরে বলল, “টাইম লাগবে।”

“খুব টাইম লাগিয়ে দিলে আমার চলবে না”, বিরক্তির একটা ঝাঁজ জমে উঠছিল রঘুনাথের গলায়, “আরও তিন হাজার টাকা দাম দিতে হবে, চোদ্দ-পনেরো কিলো মাংসের খরচ বাড়ল, দুধ কত বেশি লাগবে!”

রঘুনাথের পাশে হারকু সাহেবও দাঁড়িয়েছিল। নতুন বাঘের কাছে আরও অনেকে ভিড় করেছে। একদিকে ছিল নবীন সহদেব বাহাদুর, মদনমোহনের দু'জন সহকারী কাশী আর জোসেফও আছে। রিং বয়রাও এসে জুটেছে—বাচ্চু মাইলা অনন্ত নুরু ছট্টু শম্ভু।

খাঁচার দরজার নিচেই গর্তের মতন ফাঁক। সেখান দিয়েই দুধের গামলা ভেতরে রাখা হয়েছিল, এখন জোসেফ একটা লাঠি দিয়ে ঠেলে খালি গামলা বের করে আনল। খাঁচার ভেতর গুঁড়ো হলুদ ছড়ানো হয়েছে অনেক। সুরযের থাবায় হলুদের ছাপ, চাঁদনীর গায়েও আবীরের মতন হলুদ পড়েছে—বাঘের রং-এর সঙ্গে হলুদের রং প্রায় মিশে এসেছে।

নবীন খাঁচার অনেকটা কাছে এসে পড়েছিল, হারকু সাহেব দেখল চাঁদনী তার দিকে চোখ রেখেছে শিকারের মতন। রয়েল বেঙ্গলের জোড়া দেখতে দেখতে হাসছিল নবীন, খাঁচার মধ্যে কেন হলুদ ছড়ানো হয় সেকথা তার জানবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

নবীনকে টেনে দূরে সরিয়ে দিল হারকু সাহেব, “খাঁচার অত কাছে যাবি না নবীন, ঝাপটা মারতে পারে—”

নবীনের খেয়াল ছিল না যে সে প্রায় বাঘের মুখে গিয়ে পড়েছে। রয়েল বেঙ্গলের পিঙ্গল চোখ, গায়ে ডোরাকাটা দাগ এবং লম্বা ও নিচু শরীর দেখতে দেখতে প্রচণ্ড বিক্রমের কথাই ভাবছিল নবীন—সে নিজেকে তাদের একজন বলে ভাববার চেষ্টা করছিল।

“মদনবাবু, মেজাজ বুঝলেন কিছু?” সুরয আর চাঁদনীকে দেখতে দেখতেই হারকু সাহেব বলল।

“খাঁচার থেকে বাইরে না নামালে জানোয়ারের মেজাজ কিছু বুঝা যাবে না—”

রিং মাস্টারের কথা শুনে হারকু সাহেব হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল এবং ঝাঁজ প্রকাশ করে বলল, “দো-তিনদিন হয়ে গেল বাবু বাঘ আনল—আপনি কিছু খেয়াল করলেন না, চুপচাপ বসে আছেন—”

“বলেন কী করব?” রঘুনাথের সামনে একটু রূঢ় স্বরেই হারকু সাহেবের কথার মাঝে বলে উঠল রিং মাস্টার মদনমোহন।

হারকু সাহেব মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করলেও রঘুনাথ সামনে ছিল বলে উত্তেজনা এখন দমন করে নিল এবং রিং মাস্টারের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে শুধু বলল, “এই ক্যাম্পের খেলা পরশুদিন শেষ হয়ে যাবে, তার চার-পাঁচ রোজ বাদ আমরা টালিগঞ্জে খেলব পুরা একমাস—শুনলেন মদন-বাবু? এই টাইমের ভিতরে আপনি বাঘ দুটাকে খেলার জন্যে তৈয়ার করে দিবেন। টালিগঞ্জে ট্র্যাপিজ হবে, দোসরা ক্যাম্পে রয়েল বেঙ্গল খেলবে। ব্যাস, আউর কোই বাত নেই—” হারকু সাহেব বড় তাড়াতাড়ি এসব বলল এবং কথা

শেষ করে রঘুনাথের সমর্থন পাবার আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

"হ্যাঁ, এই রকম করবেন মদনবাবু।"

বাঘের খাঁচার কাছ থেকে সরে এল মদনমোহন। রঘুনাথ ও হারকু সাহেবের কথা সে রাখতে পারবে কিনা তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না। একটা উৎকট গন্ধ বার হচ্ছিল বাঘের গা থেকে, কিন্তু মদনমোহন ছাড়া সে গন্ধ সম্ভবত আর কারুর নাকে যাচ্ছিল না। মদনমোহন দূরে সরে এসে নাক কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকল।

তার চেহারা দেখে এখন রঘুনাথও বিরক্ত হল। মদনমোহনের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হারকু সাহেবকে বলল, "হারকু সাহেব, মদনবাবুর মুখ দেখলেন? আমার নয়া বাঘের গন্ধ তার মেজাজ বিগড়ে দিল।"

হা হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব। অনেকদিন থেকেই মদনবাবুর ওপর সে প্রসন্ন ছিল না, আজ সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে কঠিন শাসন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল এবং প্রথমে হাসতে হাসতেই বলল, "এমন মানুষ জুয়েল সার্কাসের রিং মাস্টার!"

হারকু সাহেবের হাসি শুনে চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুরথ। চাঁদনী নিষ্ঠুর একটা ডাক ছেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল। এবং ঠিক সেই সময় পাশের খাঁচায় ক্ষতর যন্ত্রণায় অস্থির সিংহ আর একবার আর্তনাদ করে উঠল।

রঘুনাথ বলল, "মদনবাবু, এই রকম মুখ করে দূরে সরে যদি থাকেন, তবে জানোয়ার কেন আপনাকে জলদি জলদি মানবে বলেন? আপনি শুধু বলবেন, টাইম লাগবে—আর আমার কোম্পানীর লোকসান চলতে থাকবে।"

আর্তনাদ শুনে সকলেই এখন সিংহর খাঁচার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। গলার কাছে গর্তের মতন একটা ক্ষত হয়েছে সিংহর, খুব রোগা হয়ে গেছে, হাড়-জিরজিরে শরীর—যন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছে। মদনমোহনকে খাঁচার সামনে দেখে তার চোখ দুটো আরও করুণ হয়ে উঠল।

রিং মাস্টার মদনমোহন এত লোকের সামনে রঘুনাথ ও হারকু সাহেবের কাটা কাটা কথা শুনে মনে মনে জ্বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা জেদের বশে বেপরোয়া হয়ে বলে উঠল, "আমাকে কী করতে হবে, অর্ডার দেন?"

হারকু সাহেব মাটিতে পা ঘষে বলল, "অর্ডার মানেন আপনি?"

"না মানলে নোকরি থাকবে কেন?" কথা বলতে বলতে কয়েক পা পিছিয়ে মদনমোহন আবার রয়েল বেঙ্গলের খাঁচার কাছে এসে বলল, "আমি আজ রাতের বেলা এ দুটো বাঘকে রিং-এ বার করব—টাইমের কথা বলে আমাকে গালাগাল করবেন না, আপনারা সকলে রাতের বেলা বাঘের মেজাজ বুঝে দেখবেন।"

"আপনার মেজাজ তো আগে বুঝে দেখতে হবে মদনবাবু", চীৎকার করে কথা বলছিল রঘুনাথ। দুটো রয়েল বেঙ্গলের কথা ভেবে সে বড় প্রসন্ন হয়েছিল কয়েক দিন, এখন বুঝল রিং মাস্টার তাদের কোন যত্ন করবে না এবং তার খেয়াল-খুশি মতন অত্যাচার করে খেলা শেখাবার চেষ্টা করবে। এসব ভাবতে ভাবতে খুব রুক্ষ স্বরে মদনমোহনকে রঘুনাথ পুরনো কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, "পানামা সার্কাস থেকে যখন রাতের বেলা লাথি মেরে হাঁকিয়ে দিল আপনাকে, তিনদিন আপনি না খেয়ে রইলেন—তখন এমন টেম্পার

কোথায় ছিল আপনার? এখন মুখে বড় বড় বাত ছুটাচ্ছেন!"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মদনমোহন। কারুর ওপর এই মুহূর্তে চাবুক চালাতে পারছিল না বলে একটা নিষ্ফল আক্রোশ তার রক্তের মধ্যে ফুলে উঠছিল এবং সে হঠাৎ বড় অসুস্থ বোধ করছিল।

এত পরে মদনমোহনকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেল হারকু-সাহেব, সে খুব কড়া স্বরে বলল, "কয়টা জানোয়ার শেষ করলেন পানামা সার্কাসে? সব খবর আমি জানলাম মদনবাবু। জানোয়ারকে ঠিক মতন ছোকরারা খেতে দিল কিনা—আপনি কুছ খবর করেন না—"

হারকু সাহেব হাত তুলে সিংহকে দেখাল, "বাবু দেখেন, ভোলার কী হাল হল!"

"ভোলার ঘায়ের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম—"

"ঝুট বাত বলবেন না মদনবাবু। আমি আপনাকে পুছলাম যখন—আপনি বললেন, এই রকম ঘা ওদের হয়। একটা ডাক্তারকে খবর দিবার ফুরসৎ আপনার হল না কেন বলেন?"

এখন চুপ করে থাকা যায় না। একটা কিছু বলতেই হবে বলে মদনমোহন আস্তে বলল, "আমি ডাক্তারকে চিনি না।"

আর একবার জোরে হাসল হারকু সাহেব এবং পরেই চুপ হয়ে গেল। আরও পরে থুতু ফেলার মতন উচ্চারণ করল, "বুদ্ধু! ডাক্তারের সাথে জান-পয়চান কার থাকে! আপনি রিং মাস্টারের কাজ ছাড়েন। আপনার মতন বুদ্ধু জানোয়ারের জীবন বেশি দিন রাখতে পারবে না। আপনি আমার কোম্পানীর সব জানোয়ার একদম ফিনিশ করে দিবেন।"

শুধু মদনমেহনকে শাসন করেই চুপ থাকল না হারকু সাহেব, একে একে প্রত্যেক খাঁচার সামনে টেনে আনল রঘুনাথকে, আঙুল তুলে হাতি ঘোড়া আর উটও দেখাল এবং তাকে বুঝিয়ে দিল যে সব জানোয়ারই অযত্নে ও অনাদরে শেষ হয়ে যেতে বসেছে। সব দোষ রিং মাস্টারেরই। সে একটা অপদার্থ।

রঘুনাথের মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি তিক্ত। হারকু সাহেবের সব কথা সে বিশ্বাস করছিল এবং তার মনে লোকসানের একটা আশঙ্কা জাগছিল বলে সেও হারকু সাহেবের মতন উঁচু গলায় মদনমোহনের সঙ্গে কথা বলল, "মানুষ মরলে আমার কোম্পানীর বেশি লোকসান হবে না মদনবাবু—মানুষ অনেক আছে। জানোয়ার তো মাত্র এই কয়টা। তাদের দামের কথা আপনি জানেন! আপনি ঠিক মতন কাজ করতে পারলে করবেন—না পারলে চলে যাবেন। আমার নিমক খেয়ে কোম্পানীর লোকসান করবেন না।"

একটা কাক ডাকছিল বটের শাখায়। মদনমোহন তার কর্কশ ডাক শুনছিল। যদিও সে খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়েছিল তা হলেও এখন খুশি মতন চলাফেরা করার কথা ভাবতে পারল না। শরীর ও মনের জড়তা কাটিয়ে নেওয়ার জন্যে নিচু হয়ে একটা ঢিল তুলে নিল মদনমোহন, কাককে লক্ষ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে নিচু হতে দেখেই কর্কশ স্বর বন্ধ হয়ে গেছে কাকের। উড়ে পালিয়েছে কাক।

হারকুসাহেব রঘুনাথকে আগলে আগলে রাখল সারা সকাল, যা বলবার বলল। এখন সে তাকে তার তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

জুয়েল সার্কাসের প্রোপ্রাইটারের তাঁবু সবচেয়ে বড়। বাচ্চাকাচ্চা অনেক

বলে জিনিসও বেশি। তা ছাড়া গাড়িও আছে সার্কাসের। দরকার মতন লিলুয়া থেকে আরও জিনিস নিয়ে আসে ড্রাইভার, এখান থেকে নিয়েও যায়।

এত সময় রিং মাস্টারের সঙ্গে বকাবকি করে মেজাজ ভাল ছিল না রঘুনাথের, এখন আরও খারাপ হয়ে গেল। ক্যাম্পখাটের ওপর গা এলিয়ে আছে যশোদা, কোম্পানীর মেয়ে মঞ্জু তার পা টিপে দিচ্ছে।

বাণী আর কিশোরীকেও দেখতে পেল রঘুনাথ। একজন টিউবওয়েল থেকে জলের বড় বালতি ভরে আনছে, আর একজন কাপড়ের বস্তা নিয়ে বসেছে কলের কাছে, সাবান ঘষে ঘষে যশোদার ছেলেমেয়েদের কাপড় কাচছে।

এসব দেখে রঘুনাথ স্থির থাকতে পারল না, তাঁবুতে ঢুকেই রাগ প্রকাশ করল, "এটা কী হচ্ছে যশো?"

রঘুনাথের গলা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল মঞ্জু, নিজের কাজ ভুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তখন এক লাথি মেরে যশোদা তাকে তার কাজের কথা মনে করিয়ে দিল এবং রঘুনাথের কথা বুঝতে না পেরে চোখের একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে খুব জোরে বলে উঠল, "কী, বলছ কী?"

যশোদার স্বভাবের পরিচয় যদিও সার্কাসের প্রত্যেক মানুষেরই জানা তা হলেও তাঁবুর বাইরে তাকিয়ে দেখল রঘুনাথ অনেকটা দূরে, হারকু সাহেব চলে গেছে কিনা। কেননা, স্ত্রীর এমন গলার স্বর ও ভঙ্গি তাকে বড় লজ্জা দিচ্ছিল।

"যশো, এটা ভাল না। আমার কোম্পানীর মেয়েদের ফের তুমি খাটাতে থাকলে—"

"কেন?" উঠে বসল যশোদা, মাথা নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলতে থাকল, "তারা বুঝি শুধু রাতে শোবে তোমার সাথে?"

"ছি ছি ছি যশো, এটা তুমি কী বল—" দু আঙুল কানের মধ্যে ঢুকিয়ে রঘুনাথ থেমে থেমে বলল, "তুমি জুয়েল সার্কাসের মালিকানী—এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এই রকম খাটাতে থাকলে মানুষ তোমাকে খারাপ বলবে—"

"উঃ, দরদ কত!" যশোদা ঝপ করে খাট থেকে নেমে কোমরে দু হাত ঠেকিয়ে রঘুনাথের মুখের সামনে এসে দাঁড়াল, "আর বড় বড় মেয়েদের ডাক দিয়ে খাটালে হত কী? হি হি, হু হু হাসাহাসি হত, না? বুঝেছি, বুঝেছি। বেলা আর শান্তার ওপর নজর তোমার চিরকালের। ওদের বাপ এলে নিজে ছুটে যাওয়া হয় রসড়ায়, ভাল ভাল তরকারি বানাবার হুকুম দেওয়া হয়। আমার দাদার টাকায় বদমাশি!"

যশোদার কথা বলবার ধরনই এমন। কোম্পানীর মেয়েদের সামনে এসব শুনতে ভাল লাগল না রঘুনাথের। সে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই, যা এবার।"

"না", তার চুল ধরে তাকে কাছে টেনে রাখল যশোদা, "আমার কাজ শেষ না করে যাবি তো—"

রঘুনাথ বলল, "ওরা সকালবেলা প্র্যাকটিস করে, বড় পরিশ্রম হয়। এখন ফের আমার তাঁবুতে ওরা খাটতে আসবে না। যশো, ওদের বাবা এসব শুনলে, আমি তাদের কী বলব?"

এত সময় যশোদা রঘুনাথের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মঞ্জুর চুল এখনো ছিল তার হাতের মধ্যে। হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল যশোদা, একটা বালিশ ছুঁড়ে মারল রঘুনাথের দিকে, "শাসন করা হচ্ছে আমাকে—

দরদের বুলি শোনানো হচ্ছে ছুঁড়িগুলোকে? আসুক এবার দাদা, তোমার চরিত্তিরের কথা—"

যশোদা চুপ করছিল না বলে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল রঘুনাথের। সে ভাবল, কখনো কোন ক্যাম্পে তাকে আর নিয়ে যাবে না। একটা ঝি কিংবা চাকর যশোদা কেন ক্যাম্পে এনে রাখে না সে কথা বুঝতে পারে না রঘুনাথ। সার্কাসের মেয়েদের এমন করে খাটিয়ে নেওয়া সে অন্যায় মনে করে বলেই যশোদার সঙ্গে সার্কাসের তাঁবুতে তার সম্পর্ক বড় অদ্ভুত হয়ে ওঠে। এবং যশোদাও ধরে নেয় বেলা আর শান্তার ওপর চোখ পড়েছে রঘুনাথের—সেই কারণে তার মুখের ওপর কথা বলতে সে সাহস পায়।

"চুপ থাক যশো", রঘুনাথ শার্ট খুলল, গেঞ্জি দড়িতে ঝুলিয়ে রাখল আর যশোদাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই ধুতি ছেড়ে গামছা জড়িয়ে নিল। আজ একটু আগেই কলের তলায় গিয়ে বসবে সে—স্নান সেরে নেবে।

"উঃ, হুকুম করছেন বাবু! আমি যেন ওনার সার্কাসের মেয়ে! আজ যদি দাদা থাকত এখানে—" শেষ কথা বার হল না যশোদার মুখ থেকে। হঠাৎ সে ঘোমটা টেনে ঘুরে দাঁড়াল। তাঁবুর বাইরে শিবনাথ এসে দাঁড়িয়েছে।

শিবনাথ ডাকল, "বাবু?"

যে রাগ মনে চেপে রেখেছিল রঘুনাথ—যশোদার সামনে প্রকাশ করবার সাহস ছিল না, এখন শিবনাথকে দেখে তা ফুটে উঠল তার চোখে, ছায়া ফেলল মুখের ওপর। গামছা পরেই রঘুনাথ তাঁবুর বাইরে এসে শিবনাথের কাছে দাঁড়াল।

"সকাল বেলা কোথা গেছিলেন শিববাবু?" জেরা করবার মতন স্বর রঘুনাথের। নিমের একটা ডাল হাতে নিয়ে সে জোরে জোরে দাঁত ঘষছিল।

রঘুনাথের রূঢ় প্রশ্ন এবং তার কণ্ঠস্বর শিবনাথ শুনল, সে সব বুঝতেও পারল। যদিও একটা চমক খেলে গিয়েছিল তার মনে, তা হলেও সে রঘুনাথকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল না। নিজের হয়ে কথা বলতে এখন বাধল শিবনাথের।

সে রঘুনাথকে বলল, "বাবু, আমি আর আপনার কোম্পানীতে চাকরি করতে পারব না।"

শিবনাথের কথা শুনে রঘুনাথ চমকাল না, অবাকও হল না। নিমের ডাল হাতে ধরে মুখ ফিরিয়ে থুতু ফেলে বলল, "সকাল বেলা কাজের ধান্দায় বাইরে গেছিলেন?"

শিবনাথ রঘুনাথের দিকে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। সে যতই কঠোর হওয়ার চেষ্টা করুক, তার মনে একটা কোমল বিশ্বাস গাঁথা ছিল যে, হঠাৎ চাকরি ছাড়বার কথা বললে কিছু বিচলিত হয়ে পড়বে রঘুনাথ এবং তার অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু রঘুনাথের প্রশ্ন আঘাতের মতন শিবনাথের মনে বাজল।

সে বলল, "না। আমি অন্য কাজে গিয়েছিলাম।"

"ভাল কথা। যেখানে আপনার খুশি আপনি যাবেন। তবে আমার লোকসানের কথাটা একটু মনে রাখবেন—"

"কিসের লোকসান?"

রঘুনাথ ঘস ঘস করে দাঁতে নিমের ডাল ঘষল, পরে সেটা চিবোতে চিবোতে বলল, "হ্যাণ্ডবিলে আপনার নাম ছাপা হতে গেল—নতুন ক্যাম্পের

কথা পাকা হল, এখন ইচ্ছা হলে আপনি যাবেন—” কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে হঠাৎ শিবনাথকে জিজ্ঞেস করল, “যমুনাও যাচ্ছে নাকি আপনার সাথে?”

রঘুনাথের প্রশ্নের উত্তর দিল না শিবনাথ—অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে খুব জোরে বলে উঠল, “শালার মুখ আমি ছিঁড়ে ফেলব বাবু—”

রঘুনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, “এই রকম গাল আপনি কাকে দিলেন শিববাবু?”

“যে আমার নামে আপনাকে লাগিয়েছে, সে ব্যাটার জন্মের ঠিক নেই, ওকে আমি—”

“চুপ, শিববাবু চুপ”, রঘুনাথ ধমক দেওয়ার মতন বলল, “আপনি রাতের বেলা যমুনার কাছে চুপে চুপে যাবেন, হাসি-তামাশা করবেন, আর কেউ কিছু বললে তার উপর রাগ হবেন—তাকে গালাগাল করবেন—এটা কী রকম কথা হল?”

উত্তেজনায় শিবনাথের শরীর ঘামছিল, “বাবু, আপনি জানেন যমুনার তাম্বুতে আমার যাওয়া-আসা আছে—”

“রাতের বেলা সেখানে কেন গেলেন আপনি? আর গেলেন যদি, আপনি একটা পারমিট নিলেন না কেন?”

“আপনি তখন এখানে ছিলেন না বাবু।”

“হারকু সাহেব তো ছিল—”

“ও লোকের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না—”

নিমের ডাল ফেলে দিয়েছিল রঘুনাথ। তার গায়ে এক খণ্ড গামছা ছাড়া আর কোন বস্ত্র ছিল না। রোগা রোগা হাত-পা রঘুনাথের। দুর্বল শরীর। কিন্তু এখন তার স্বল্প বস্ত্র ও ঘন কালো গোঁফ তাকে এক নিষ্ঠুর মানুষের মতন করে তুলেছিল।

রঘুনাথ বলল, “শিববাবু, হারকু সাহেব আমার সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার। আপনি এখানে কাজ যদি করবেন তবে তাকে আপনার মানতেই হবে—এই কথাটা মনে রাখবেন—”

রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না রঘুনাথের, সে তাঁবুর মধ্যে গিয়ে পেতলের বড় একটা ঘটি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে কলের দিকে এগিয়ে গেল।

আজ তার স্নানের বড় দেরি হয়ে গেছে।

রঘুনাথ চলে যাবার পরেও শিবনাথ কিছু সময় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার মুখ এখন গোল একটা কুমড়োর মতন ঠাণ্ডা, খালি-খালি চোখ, দেহের পেশীও শিথিল। হতাশার ম্লান একটা ছায়া আস্তে আস্তে তাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

কেন রঘুনাথের জুয়েল সার্কাসে প্রথম এসেছিল শিবনাথ? সে তার শক্তি, তার বিক্রমের প্রমাণ অন্যভাবেও মানুষকে দিতে পারত—তার গুরু বলেছিল যে সে একদিন জগদ্বিখ্যাত হবেই। জুয়েল সার্কাসে শিবনাথ অর্থ কিম্বা যশের জন্যে আসেনি, সে এসেছিল রঘুনাথের জন্যেই।

একটা ছোট সার্কাস আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে, বড় হচ্ছে। শিবনাথের মতন কোন মানুষ তখন জুয়েল সার্কাসে ছিল না। শ্রীরামপুরে রথের মেলায়

এক প্রদর্শনীতে তাকে সার্কাসে চলে আসবার জন্যে জোর করল রঘুনাথ—কতকটা তার কৃপা ভিক্ষা করবার মতন।

"আপনার মতন মানুষ এলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আমি গরিব লোক, আমার সার্কাসটাকে আপনি একটু দয়া করেন—"

রঘুনাথের কাতর মিনতি শিবনাথের মনে প্রথম একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। রঘুনাথের তাকে প্রয়োজন—সে ইচ্ছে করলে একটা ছোট সার্কাসকে বড় করে তুলতে পারে। নিজের সম্পর্কে একটা অস্ফুট দম্ভ এবং সচেতনতা শিবনাথকে নিয়ে এল জুয়েল সার্কাসে।

শ্রীরামপুরে না, শিবনাথ সার্কাস-আর্টিস্ট হয়ে প্রথম এল তারকেশ্বরে। তখন শেষ চৈত্র হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে ফুলে উঠছে, থেকে থেকে ফানেলে ফুঁ দেয়ার মতন হাওয়ার শব্দ খেলছে। নিজের তাঁবুতে বসে শিবনাথ হাত পাখা দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া খাচ্ছিল। পাখা কখনো-কখনো তার গালে মাথায় এবং কপালে আঘাত করছিল। রঘুনাথ বড় যত্ন করেছে তাকে, সার্কাসের সব চাকর মালিকের আদেশ মতন তার কী কী দরকার তা জানবার জন্যে বার বার আসছিল।

হারকু সাহেব বেরিয়েছিল, ফিরে এসে শুনল শিবনাথ এসেছে। হারকু সাহেবও শিবনাথের তাঁবুতে তাকে দেখতে এল, "এই যে শিববাবু, সেলাম!"

হারকু সাহেবের চেহারা দেখে শিবনাথ ভাবল সে-ও জুয়েল সার্কাসের আর একজন চাকর, তার তেষ্টা পেয়েছিল বলে সে হেসে বলল, "এক গিলাস পানি পিলাও।"

হারকু সাহেবের মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠেছিল। শিবনাথের পাশে ঝপ করে সে বসে পড়ল এবং কিছু পরে তার গায়ে গা ঠেকিয়ে উদ্ধত স্বরে বলল, "আপনি লিখাপড়া জানা ভদ্দর লোক। আমার সার্কাসে খেলতে এসে পয়লা দিন পানি কেন খাবেন? রাম জিন হুইস্কি—বলেন, কী ফরমাশ?"

শিবনাথ এসব শুনে বিব্রত হয়ে পড়েছিল, হারকু সাহেবকে পাখার হাওয়া দিতে-দিতে আস্তে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপ কৌন হ্যায়?"

"আমি আপনার নোকর—এই সার্কাসের জেনারেল ম্যানেজার—"

"আরে, আপনিই হারকু সাহেব?" হাত চলছিল না শিবনাথের, সে তার পায়ের ওপর তালপাতার পাখা ঠেকিয়ে রেখেছিল।

"হাঁ-হাঁ, আমার নাম জে, হারকিউলেস।"

যে বিস্ময় শিবনাথের মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে করতে সে শুকনো হাসল, "রঘুনাথ বাবু আমাকে জুয়েল সার্কাসে নিয়ে এল—"

"হাঁ-হাঁ, শুনলাম," হারকু সাহেব জিজ্ঞেস করল, "আগে কোন সার্কাসে খেলে এলেন আপনি?"

"কোথাও না।"

"তবে বাবু কেন নিয়ে এল আপনাকে? একদম নবিস্ আছেন—রুপেয়া কত নিবেন?"

শিবনাথের গলা ও কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছিল। সে পাখা নাড়তে নাড়তে প্রথম দিনই চীৎকার করে বলে উঠেছিল, "সে কথা আপনাদের মালিককে জিজ্ঞেস করবেন হারকু সাহেব। রুপেয়ার জন্যে আমি সার্কাসে খেলতে আসিনি—বুঝলেন?"

“তবে কিসের জন্যে এলেন?”

“আপনার মালিক আমাকে পায়ে ধরে নিয়ে এল—”

হঠাৎ হাসতে শুরু করে দিয়েছিল হারকু সাহেব। শিবনাথের হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে তাকে বাতাস দিতে দিতে বলেছিল, “আমি বালতি-বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢালি মাথায়—আপনিও ঢালবেন!”

হারকু সাহেব হাসতে থাকলেও বিদ্রূপের একটা কর্কশ ধ্বনি খেলে যাচ্ছিল তার হাসিতে যা শিবনাথকে খোঁচা মারছিল। প্রথম দিন থেকেই দুজনের সম্পর্ক এমন তেতো-তেতো ও ঈর্ষার হয়ে উঠল যে আজ ওরা পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যে সব সময় তৈরি হয়ে থাকে।

এখন শিবনাথকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে হারকু সাহেব।

রঘুনাথের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসার একটা অমানুষিক আকাঙ্ক্ষা শিবনাথের রক্তের মধ্যে সরীসৃপের মতন কিলবিল করে উঠছিল। তখন রাধানাথবাবুর তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে যমুনা—হাতছানি দিয়ে ডাকছে শিবনাথকে।

॥ এগার ॥

আরও পরে গরুর গাড়ির মতন খাঁচার চাকার শব্দ উঠল। সুরয আর চাঁদনীকে নবীন আবার দেখল অনেক রাতে।

শেষ খেলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো রিং-এর আলো জ্বলছে। গ্যালারির ওপর পড়ে আছে খালি চায়ের ভাঁড়, এদিকে-ওদিকে চানাচুরের ঠোঙা, চীনেবাদামের খোসা, আইসক্রীমের কাগজের গেলাস।

রাত অনেক। কিছু আগে রসড়ায় গোলমাল হচ্ছিল, থালা-বাসনের শব্দও শোনা যাচ্ছিল— এখন তা-ও নেই। মদনমোহনের হুকুম মতন কয়েক জনের সঙ্গে কাশী আর জোসেফ নতুন বাঘের খাঁচা ঠেলে নিয়ে এল রিং-এর মধ্যে।

আজ সুরয আর চাঁদনীকে প্রথম খাঁচার বাইরে আনবে রিং মাস্টার—খেলার মহড়া দেবে। রাতের খেলা অনেক আগে শেষ হয়ে গেলেও এখনো সার্কাসের পোশাক ছেড়ে ফেলেনি সে। এখনো তার হাতে দুটো চাবুক। দুটোই চামড়ার। একটাতে ছোট ছোট পেরেক গাঁথা।

হালকা রোদের আভায় সকাল আর দুপুর শুকনো-শুকনো হয়ে এলেও বিকেল এখনো ভিজে-ভিজে এবং রাত প্রথম শীতের মতন। তাহলেও এখন নবীনের গায়ে চাদর নেই। উত্তেজনার একটা প্রবল আলোড়নে সে ঠাণ্ডার কথা ভুলে গিয়েছিল।

রিং-এর ভেতর মধ্যরাতে এসে দাঁড়িয়েছে নবীন, বাঘের খাঁচা দেখছে—সুরয আর চাঁদনীকে ভালবাসার একটা আগ্রহ তার মন থেকে এতদিনের জমা করা ভয় এবং সার্কাস জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা আস্তে আস্তে মুছে ফেলছে।

নেশার মতন মনে হচ্ছে নবীনের। এক জোড়া রয়েল বেঙ্গল বড় শান্ত এখন, বিশ্রামকাতর। নবীনের করুণা জাগছিল। সকাল বেলা এদের দেখতে দেখতেই বশ করবার একটা অদম্য ইচ্ছাও তার হয়েছিল—যেন সে কুকুরের

মতন বাঘকেও পোষ মানিয়ে নিতে পারে। তারা নবীনকে মানবে এবং তার সাহস ও ক্ষমতা দেখে লীলাও তাকে মানুষের মতনই মনে করবে।

প্রথম লীলার কথাই মনে হয়েছিল নবীনের।

আর কারুর কাছে নয়, কেননা ভীতু মানুষ বলে আর কেউ তাকে লীলার মতন যন্ত্রণা দেয় না—স্ত্রীর কাছেই দুঃসাহসের প্রমাণ দেয়ার কথা নবীন ভেবেছিল বলে হিংস্র পশু যুগলকে তার বড় সুন্দর লেগেছিল। এবং নবীনের মন থেকে একটা স্থূল অপমানবোধও আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসছিল।

আজ সকালে সিংহর ক্ষতর কথা বুঝিয়ে নবীন নিজেই একজন পশু চিকিৎসককে ডেকে এনেছিল। ভোলাকে ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার মনে করল না ডাক্তার—একবার দেখেই বুঝে নিল তার কী হয়েছে।

অনেক আগেই নাকি ডাক্তারকে খবর দেয়া উচিত ছিল। এখন ভোলার বাঁচবার আশা কম। ইনজেকশন দিল ডাক্তার, ওষুধও লাগাল এবং বলল সিংহর খেলা একেবারে বন্ধ রাখতে হবে—চেষ্টা করে দেখা যাক কী হয়।

রিং মাস্টার তখন ছিল না, হারকু সাহেব রোগা সিংহর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, "ডাক্তারবাবু, আমার ভোলার ব্যায়রাম খুব খারাপ আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী অসুখ হল?"

বেশি কথা বলল না ডাক্তার, হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে পকেটে রাখল, "যা হয়েছে, গলায় চাপ পড়ছে। খেতে পারে না, তাই রোগা হয়ে যাচ্ছে—"

"শুন রে নবীন, ভোলা খেল কি না খেল কেউ খবর করতে পারল না! ওকে রিং-এ নিয়ে গেল—বেচারাকে চাবুক মেরে খেলা দেখাল!"

সিংহের দুরারোগ্য ক্ষতর কথা শুনে হারকু সাহেবের মনে ক্রোধ ও হতাশা এই দু জাতীয় অনুভূতি একসঙ্গে ঠেলে উঠলেও সে নবীনের পিঠে জোরে আঘাত করে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছিল, "জানোয়ারের উপর তোর দরদ জোর আছে রে নবীন! তোর যা কাম না, তুই তা-ই করলি—ডাক্তার নিয়ে এলি—" দু-এক মিনিট চুপ করেছিল হারকু সাহেব, মনে মনে কিছু একটা স্থির করে নিয়ে আবার বলেছিল "হাঁ ঠিক হ্যায়। শুন রে নবীন, একটা জরুরী বাত শুন—ক্যাশিয়ারের কাম করবে বাহাদুর—শুনলি?"

"হুঁ"—চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় নবীনের বুক কাঁপছিল, তার মুখও বিবর্ণ হয়ে এসেছিল।

"কাশী আউর জোসেফের সাথে তুই জানোয়ার দেখবি। তোকে আমি রিং মাস্টার বানিয়ে দিব। মদনমোহনকে দিয়ে আমার কাম চলবে না।"

হারকু সাহেবের রুক্ষ গলার স্বর, তার এক-একটি কথা রোমাঞ্চের মতন নবীনের শরীরের ওপর ফুটে উঠছিল এবং তার বুকের ভিতর এমন এক অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিয়েছিল যা তাকে অনেক সময় বোবার মতন করে রেখেছিল। তখন হারকু সাহেবের কাছেও আন্তরিক বশ্যতা স্বীকার করে নিতে পেরেছিল নবীন এবং তার দীন ও মলিন মন ভবিষ্যৎ নতুন কর্মের কল্পনায় ঝকমক করে উঠেছিল।

প্রথম রাতেই একটা কম্পমান কৌতূহল নবীনকে ঠেলে নিয়ে এসেছিল রিং-এর মধ্যে রিং মাস্টার মদনমোহনের পাশে—এক জোড়া নতুন বাঘের

মুখোমুখি। একটা দুঃসাহস তার গলা ঠেলে উঠছিল। সে দেখছিল মদনমোহনকেও।

এক-একবার চাবুকে আঙুল ঘষে-ঘষে মদনমোহন পেরেকের ধার পরীক্ষা করছিল। বড় চোখা পেরেক, কাঁটার মতন তার আঙুলে খোঁচা লাগছিল। মদনমোহন চোখের কাছে আঙুল তুলে দেখছিল রক্তের দাগ আছে কি না।

সকাল বেলা রঘুনাথ ও হারকু সাহেবের কাটা-কাটা কথা তার মনে জোঁকের মতন সেঁটে আছে এবং একটা আক্রোশ তাকে অধীর ও অপ্রকৃতস্থ করে তুলছে। বাঘের খাঁচার বড় কাছে এগিয়ে এসেছিল মদনমোহন।

হিংস্র বাঘের চোখে কয়েক মুহূর্ত সে চোখ রাখল। যে-কথা মদনমোহন সকাল বেলা শুনেছিল, এখন চামড়া ও পেরেকের চাবুক খুব শক্ত করে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে আপন মনে তার উত্তর দিতে থাকল এবং প্রশ্নও করে গেল।

নুরু আর অনন্ত কয়েকটা বাঁশ ফেলল রিং-এর মধ্যে। শম্ভু একদিকে মশাল সাজিয়ে রাখছিল। কাশী দড়ি আর শেকল একসঙ্গে করে বাঘের গলায় ডি-টাইট দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। জোসেফ বড় বড় তক্তা বয়ে আনছিল বাঘের খাঁচার কাছে।

এত রাতে এই সব সরঞ্জামের আওয়াজে এবং মানুষের গলার স্বর শুনে বাঘের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। রিং মাস্টারকে খাঁচার কাছে দেখে সুরয আর চাঁদনী বুঝতে পেরেছিল এখুনি একটা কিছু ঘটবে যা তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত করবে। তারা মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার ছাড়ছিল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ঢেউ-এর মতন অনেক দূর অবধি বাঘের গর্জন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

হারকু সাহেবের লাল-লাল চোখ। মদ খেতে-খেতে সে উঠে এসেছে নতুন বাঘের ট্রেনিং দেখতে। তার মুখ থেকে বিলিতি মদের ঝাঁজালো গন্ধ আসছিল। রঘুনাথও এসেছে। তার সঙ্গে কথা বলবার সময় হারকু সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

রিং মাস্টার মদনমোহন কারুর দিকে দেখল না। সে খাঁচার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুরয কিম্বা চাঁদনী—কাউকেই আর লক্ষ করল না। চামড়ার চাবুকের পেরেকে আবার আস্তে আঙুল ঘষছিল মদনমোহন এবং এক-একবার পিছন ফিরে রঘুনাথ ও হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটা চাপা আক্রোশ ফেনাতে ফেনাতে সে আপন মনে প্রশ্নোত্তর সাজিয়ে নিচ্ছিল।

"পানামা সার্কাসে জানোয়ার আমি মেরে ফেলেছি? কে তোমাদের এ খবর দিলে? আচ্ছা, টাইম হোক, এ কথার জবাব আমি শুনিয়ে যাব—"

"আমি বেশি টাইম লাগিয়ে দিলাম?...কোম্পানীর লোকসান করিয়ে দিলাম!...জানোয়ার কথা বলতে পারে না, কথা বললে সাচ বাত ও-ই বলে দিত! কত জানোয়ার মানালাম না আমি একেলা? বাঘ সিংহ হাতি উট—কম-কম টাইমে এত সব জানোয়ারকে আমি তৈয়ার করে দিলাম না।...এখন আমার কামের গলতি বাদ কুছ বাত বলবে না তোমরা। আমি শালা শ' রুপেয়ার রিং মাস্টার—আমাকে জানোয়ারের টাট্টি সাফা করতে হবে। আমি তোমাদের বাপ-দাদার নোকর!"

একটা তক্তা একাই তুলে আনল জোসেফ, খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল। দু' ভাগ হয়ে গেল খাঁচা। সুরয আর চাঁদনী আলাদা হয়ে গেছে।

কিন্তু আরও তক্তার দরকার। ডি-টাইট মারবার জন্যে এক-একটি বাঘের

জায়গা একেবারে স্বল্প পরিসর করে তুলতে হবে। কাশী তক্তা তুলে দিচ্ছিল জোসেফের হাতে, কাঠের কর্কশ আওয়াজ উঠছিল, খাঁচার ভেতর তক্তা ঠেসে-ঠেলে দুটো বাঘকেই একসঙ্গে দু-দিকে কোণঠাসা করবার কৌশল করছিল জোসেফ।

"ব্যস ব্যস", চাবুক মাটিতে ফেলে দিল রিং মাস্টার, নির্ভয়ে এখন খাঁচার শিকে হাত রেখে বলল, "কাশী, শিকলি লে আও।"

সুরযের গা ঘেঁষে তক্তা পড়েছে। তার দেহ স্থির, মাথাও সে নাড়াতে পারবে না। আস্ফালনের নিষ্ফল ইচ্ছায় সুরযের ভয়ঙ্কর রকম বিকৃত মুখ থেকে ফেনার মতন থুতু ঝরছিল।

সুরয আর চাঁদনীর গলার 'ডি'র মতন লোহার অক্ষরে আর একটা 'ডি' বসিয়ে দড়ি ও শেকল একসঙ্গে বেঁধে দিল রিং মাস্টার। নুরু আর অনন্ত রিং-এর মধ্যেই লোহার খুঁটি পুঁতে রেখেছে, এখন তারা মদনমোহনের হাত থেকে সুরয আর চাঁদনীর দড়ি-শেকল নিয়ে দুটো আলাদা খুঁটিতে শক্ত করে বাঁধল। অর্থাৎ গণ্ডি কাটার মতন বাঘের চলা-ফেরার পরিধি নির্দিষ্ট করে দিল।

এক-একটি তক্তা খাঁচার মধ্যে থেকে টেনে-টেনে বের করে আনল জোসেফ, ধড়াস-ধড়াস করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল এবং পরে সে খাঁচার ওপরে উঠে দরজার পুরু কড়ায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল—রিং মাস্টারের আদেশ পেলেই দরজা ওপরে টেনে তুলে বাঘকে বাইরে বেরিয়ে আসবার সুযোগ দেবে।

দুটো চাবুক হাতে তুলে নিল রিং মাস্টার। বাঘ এখনো খাঁচার মধ্যে থাকলেও অভ্যাসবশত সে একবার মাটিতে চাবুক আছড়ে শব্দ করল, চটাস্! আওয়াজ শুনে চাঁদনী আর সুরয খাঁচার শিকের কাছে মুখ এনে আর একবার ডেকে উঠল।

মেজাজ এসে গেছে রিং মাস্টারের। এখন মধ্য রাতে সার্কাসের পুরো রিংটারই মালিক সে একা। তার হুকুম মতন কাজ করবে মানুষ, জানোয়ার বুঝে নেবে তার কথা না শুনলে চামড়া ফুটো হবে পেরেকের চাবুকের ঝাপটায় —খেলা তাকে দেখাতেই হবে।

রিং-এর মাঝখানে এসে মদনমোহন রঘুনাথ হারকু সাহেব আর যারা-যারা নতুন বাঘের খেলার মহড়া দেখতে এসেছিল তাদের দেখে নিল গর্বিত এক মানুষের মতন এবং আর একবার চাবুকের আওয়াজ করল।

"আরে শম্ভু, টুল কাঁহা?"

যে-টুলে উট দাঁড়ায়, হাতি বসে তেমন দুটো নিচু-নিচু টুল শম্ভু ছুটে নিয়ে এল, মদনমোহন একটার ওপর পা রেখে আর একটা কিছু দূরে সরিয়ে রাখতে বলল শম্ভুকে। খাঁচা থেকে বেরিয়ে প্রথম টুলের ওপরেই বাঘকে বসতে শেখাবে সে।

ভাল করে আর একবার সব দিক দেখে নিল রিং মাস্টার। নিচু হয়ে সে লোহার খুঁটিতে দড়ি ও শেকলের বাঁধন টেনে-টেনে পরীক্ষা করল, মাথা তুলে বাঘের খাঁচার ওপর জোসেফকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

কাশী বাঁশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রিং মাস্টারের কথা না শুনলেই বাঘকে বাঁশ দিয়ে মেরে কাহিল করে তুলবে। কাশীর পাশেই আছে শম্ভু, হুকুম পেলেই রিং মাস্টারের হাতে মশাল তুলে দেবে। কেরাসীন তেলে চোবানো ন্যাকড়া বাঁশের মাথায় বেঁধে সে দাঁড়িয়ে আছে। নুরুর হাতে দেশলাই।

রিং-এর মধ্যে বাঘের খাঁচার সামনে এসে এসব দেখতে-দেখতে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটা কৌতুক অনুভব করছিল নবীন। পরে হঠাৎ রঘুনাথ ও হারকু সাহেবকে পলকে দেখে নিয়ে সে তৎপর হয়ে উঠল এবং একটা কিছু করবার আগ্রহে শম্ভুর হাত থেকে মশাল টেনে নিল। রিং মাস্টার মদনমোহনের মতন নবীনও এখন মনে মনে হিংস্র রয়েল বেঙ্গল বশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল।

"জোসেফ, রেডি?" বাঘের খাঁচা খুব কাছে থাকলেও চীৎকার করে বলল মদনমোহন, "খোল দেও!"

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। একটা আওয়াজ উঠল, হড়াৎ! খাঁচার দরজা ওপরে টেনে তুলেছে জোসেফ, সুরয আর চাঁদনীকে বাইরে রিং-এর মধ্যে জোরালো আলোর তলায় বেরিয়ে আসবার পথ করে দিয়েছে।

বাঘের খাঁচার দরজা খোলা। একেবারে পিছনের দিকে লোহার শিকে গা ঘেঁষে কঠিন একটা জেদের বশে স্থির হয়ে আছে সুরয আর চাঁদনী। আলোর রেখায় তাদের চোখ জ্বল জ্বল করলেও দরজা খোলার আওয়াজ শুনে তারা হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মৌন প্রাণীর মতন। মুখ ব্যাদান কিংবা চাপা গর্জন—উত্তেজনা প্রকাশের কোন অভিব্যক্তি এখন তাদের নেই।

খাঁচার ওপর থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল জোসেফ। ঝপ্ শব্দ শুনে ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সুরয তাকে দেখল এবং আরও পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল। একটা বাঁশ তুলে নিয়েছে জোসেফ, খাঁচার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—দরকার হলে বাঘ দুটোকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বাইরে বের করতে হবে।

দু-হাত তুলে আরও জোরে চীৎকার করছিল মদনমোহন, "হে-ই, হে-ই! সুরয! চাঁদনী! আও—আও আও!"

"হে-ই! হে-ই—" খাঁচার ওপর বাঁশের বাড়ি মারল জোসেফ, কাশী খোঁচাতে থাকল সুরয আর চাঁদনীকে—এমন হল্লা আর বাঁশের আওয়াজ ছাড়িয়ে রিং মাস্টারের চাবুকের ভীতিপ্রদ আওয়াজ উঠছিল। কিন্তু তাহলেও এক পা নড়ল না সুরয, খাঁচার বাইরে আসবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না চাঁদনী।

জোসেফ বিরক্ত হয়ে বলল, "নেই নিকলে গা।"

"আগ লাগাও—"

রিং মাস্টারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফস করে দেশলাই জ্বালাল নুরু। প্রথম কাঠি ধরল না, দেরি হয়ে গেল। কাশী মশাল কেড়ে নিল নবীনের হাত থেকে। কেরাসীনে চোবান ন্যাকড়া পরেই দপ করে জ্বলে উঠল। বাঁশের মাথা থেকে কালো ধোঁয়া উঠছে হু-হু করে, পোড়া-পোড়া গন্ধ আসছে।

"হে-ই, হে-ই—হাট হাট—"

আগুনের ছেঁকা খেয়ে সুরয আর চাঁদনী ঢেকুর তোলার মতন আওয়াজ করল, তারপর এল দরজার কাছে—তখনো ইতস্তত করল কয়েক মুহূর্ত, পরে লাফ দিয়ে নামল।

পিছিয়ে এসেছে মদনমোহন। খুব সতর্ক হয়ে লক্ষ করছে সুরয আর চাঁদনীকে। খাঁচার বাইরে এসে অনেক বেশি জোরে গর্জন করছে ওরা—অস্থির হয়ে শেকল ছেঁড়বার চেষ্টা করছে।

টুলের ওপর মদনমোহনের চাবুক পড়ল, "সুরয!"

"পিছু যাইয়ে—পিছু যাইয়ে—" ভীত একটা চীৎকার তুলে ধাক্কা মেরে কাশীকে দূরে সরিয়ে দিল জোসেফ। লাফ দিয়েছিল চাঁদনী, জোসেফ কাশীকে ঠেলে না দিলে প্রথম রাতেই সে হয়তো তাকে জখম করে দিত।

পর পর দু'বার পেরেকের চাবুক দিয়ে চাঁদনীকে মারল মদনমোহন। কাশী আগুনের ছেঁকা দিল, জোসেফের বাঁশও পড়ল তার পিঠের ওপর। আঘাতের যন্ত্রণায় আরও হিংস্র হয়ে উঠে গলার জোর আওয়াজ তুলে চাঁদনী, মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে বড় বড় হাঁ করে থাবা নাড়ল, গর্জন করল।

কিন্তু যত আস্ফালনই করুক, ভয় পেয়েছিল সুরেষ আর চাঁদনী প্রথম দিনই। কেননা নবীন দেখল, লেজ নিচু করে বার বার তারা খাঁচার দিকেই যাচ্ছে। খাঁচা বন্ধ, ওরা বেরিয়ে আসতেই জোসেফ আবার দরজা নামিয়ে দিয়েছে। নবীন আস্তে আস্তে অনেকটা পিছিয়ে এসেছিল।

বাঁশের বাড়ি, লাঠির আঘাত এবং আগুনের ছেঁকা দিয়ে রিং মাস্টার ও তার সহকারীরা যেমন করে হিংস্র জানোয়ার বশ করবার চেষ্টা করছিল, নবীনের মতন মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখা বড় কঠিন।

সে রিং থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না হলেও এত সময় আলোর নিচে ছিল বলে চারপাশ তার অন্ধকার লাগছিল। নবীনের তাঁবুর ভেতরে অন্ধকার আরও ঘন।

আমি রিং মাস্টার হব—আমি বাঘ সিংহ হাতি উট নিয়ে খেলব—ঘুম আসছিল না নবীনের। এই সব কথা তার মনে নরম আলোর ফুলকির মতন ঝরে পড়ছিল।

লীলার খাটে পুরু মশারি টাঙানো। নবীনেরও একটা আলাদা মশারি আছে—এখন অন্ধকারে তা টাঙিয়ে নিতে তার ইচ্ছে হল না। এখনো উৎকর্ণ হয়ে সে বাঘের গর্জন, মদনমোহনের চাবুকের আওয়াজ ও আর সব মানুষের চীৎকার শুনছিল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল লীলার—তার শব্দও কানে যাচ্ছিল নবীনের।

তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মদনমোহনের মতন অমানুষিক অত্যাচার করে কম সময়ের মধ্যে কোন জানোয়ারকেই নবীন খেলা শেখাতে পারবে না। সে সময় নেবে। নিজে তাদের খাওয়াবে, যত্ন করবে এবং আস্তে আস্তে পোষ মানাবে—সুযোগ পেলেও তারা আক্রমণ করবে না নবীনকে।

একটা অলৌকিক ক্ষমতার কথা ভাবল নবীন এবং অন্ধকারে আপন মনে হাসল। বড় সুন্দর দেখতে সুরেষ আর চাঁদনী। হয়তো একদিন সার্কাসের খাঁচার মধ্যেই চাঁদনীর বাচ্চা হবে—নবীন তখন রিং মাস্টার। মনের আয়নায় তার নতুন প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল।

হাতে চাবুক নবীনের। সে-ও পরেছে মদনমোহনের মতন আঁটসাঁট প্যান্ট, লাল কোট গায়ে দিয়েছে। চাঁদনী তার পা চাটছে। সে সুরেষের গলা চুলকে দিচ্ছে, আদর করছে চাঁদনীকে—মুখের কাছে মুখ এনে চুমু খাচ্ছে।

অল্প আগে বাঘের বাচ্চার কথা ভেবেছিল বলে এখন তার কল্পনা তাদেরও ধরতে পারল। চার-পাঁচটা বাচ্চা নবীনের কাছে-কাছে আছে—খেলা করছে। এক-একটিকে এক-একবার ছোট ছেলের মতন কোলে তুলে নিচ্ছে নবীন—বুকের কাছে চেপে ধরে মুখে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

বাঘের গোটা সংসার নিয়ে আপন মনে খেলা করতে করতে হঠাৎ নিজেকেও বড় পরিপূর্ণ মনে হল নবীনের এবং অন্ধকারে সে আর বেশি সময় একা

বসে থাকতে পারল না। লীলার ঘুম ভাঙিয়ে নবীন তার সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

সে ইতস্তত করল না, যে-কল্পনাকে এত সময় প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিল তারই রেশ তাকে অস্থির করে তুলল। নবীন লীলার মশারি তুলে কয়েক মুহূর্ত তার ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকল।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লীলা, দুটো হাতই ওপরে তোলা। তার গা থেকে পাউডারের মধুর গন্ধ আসছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পেল না নবীন, তার মনে হল লীলার গালে এখনো রঙের গোলাপী ছোপ লেগে আছে। নবীন বেশি সময় লীলার ঘুমন্ত দেহ দেখতে পারল না—সে তার বুকের ওপর পড়ল।

নবীনের ভারে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল লীলার। তন্দ্রা ঘোরেই প্রথম প্রথম সে ছটফট করল—অস্ফুট উচ্চারণে কী সব বলল এবং পরে নবীনের মাথা বুকে চেপে ধরে ভর্ৎসনার মতন বলল, "ঘুমতে হবে না?"

"হুঁ, হবে।"

"যাও যাও—এসব আমার ভাল লাগে না মাইরি—কোনদিন কী হয়ে যায়!"

"হবে আবার কী", লীলা কী বলতে চায় তা বুঝতে পারলেও খুব তাড়াতাড়ি নবীন বলল, "কী হবে গো?"

লীলা নবীনকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে নামিয়ে দিল, "শরীর খারাপ, জান না? যাও, যাও, নিজের খাটে—"

"না, আজ রাতে আমি তোমার সাথে শোব।"

লীলার ভেতরে-ভেতরে একটা জ্বালা অল্প-অল্প ধকধক করে উঠছিল, এখন তা তার গলায় উঠে এল, "ভোরের বেলা প্র্যাকটিস নেই?"

"আমিও তো প্র্যাকটিস সেরে এলাম", যে-কথা সারাদিনে লীলাকে বলবার চেষ্টা করেছিল নবীন—বলতে পারেনি, এখন তা বলবার জন্যে উৎসুক হল, "সুরয আর চাঁদনী—কী তেজী বাঘ রে বাবা—"

"বাঘ তেজী না হলে কে হবে—তুমি?"

"তেজ কিছু কম আছে আমার?" নবীন লীলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, সে তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল কিন্তু লীলা এখন জেগে আছে—সে তাকে বাধা দিল।

"এত রাতে এমন জ্বালাতন করলে আমি চেঁচিয়ে উঠব—"

অন্য সময় হলে আর কথা বলত না নবীন, চুপ থাকত। আজ সে হাসছিল, "চেঁচালে কী হবে? বউ-এর সাথে রাতের বেলা পীরিত করেছি বলে ফাঁসি হবে আমার?"

"সহদেব বাহাদুরের মতন অন্য মেয়েমানুষের বাড়ি যেতে পার না? রাতে একটু ঘুম হয় তবে আমার!"

লীলার গা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে নবীন বলল, "আমি চাঁদনীর ঘরে যাব, তার সাথে খেলব। চাঁদনীর বাচ্চা হবে ঠিক—" কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লীলাকে আঘাত করবার জন্যেই সে বলল, "যে মেয়েমানুষ বাঁজা হয়ে থাকতে চায় তার সাথে আমার শোয়ার দরকার নেই, থাক সে একা-একা পড়ে জীবনভোর—"

নবীনকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল লীলা। বেশি রাত বলে তার স্বর বড় কর্কশ, বড় তীক্ষ্ন, "কে মানা করেছে যেতে পরের ঘরে? যাও না। ভীতু

মানুষের সাথে পীরিত নেই আমার, কতবার সেকথা মুখের উপর বলেছি না?"

চাঁদনী যে কোন মেয়ের নাম নয়, হিংস্র একটা বাঘিনীর নাম সেকথা নবীন এখন লীলার কাছে ভাঙতে পারল না। তার সঙ্গে নবীনের কৌতুক করবারও ইচ্ছে হল না। তার সম্পর্কে যে পুরনো বিশেষণ আবার প্রয়োগ করল লীলা তা খণ্ডন করবার জন্যে সে-ও জোরে বলল, "ভীতু কি-না বুঝিয়ে দেব, বাঘের সাথে খেলব এবার, দেখবে—"

কী ভেবে একথা বলল নবীন, লীলা তা বোঝবার কোন চেষ্টা করল না, সে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে বলে তার রাগ হচ্ছিল। লীলা জানত এখন নবীন চুপ করে থাকবে না, আরও কথা বলবে—আবার তার কাছে আসবে—তার পাশে শুয়ে থাকবে।

এবং নবীন তাকে আবার কান্নার মতন সেই সব পুরনো কথাই বলবে। সার্কাসের জীবন ভাল নয়, স্বামী স্ত্রীর জন্যে ঘরেরই দরকার। লীলাকে নবীন বলবে, সার্কাস ছেড়ে তার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যেতে। লীলা যেতে না চাইলেও নবীন জোর করবে, রাগ করবে—তারপর সারা রাত ধরে ঝগড়া করবে।

আজ লীলাও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকল। আবার যদি নবীন সেই সব কথা এখন তোলে এবং তাকে মারতে ওঠে তাহলে সে ছুটে যাবে হারকু সাহেবের তাঁবুতে, তাকে চীৎকার করে বলবে, হারকু সাহেব, লোকটাকে বেঁধে মার—আমাকে ভাংচি দিয়ে ভাগিয়ে নিতে চায়—

কতবার নবীনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে লীলা যে ঘরে তার ঘুম হবে না। কোন-কোন ক্যাম্পে অনেক আর্টিস্ট সার্কাসের কাছাকাছি ঘর পেলে ভাড়া নিয়ে থাকে, লীলা কখনো তেমন করতে পারে না। তাঁবুর বাইরে যে জীবন, তা তার জন্যে নয়।

রসড়া থেকে র‍্যাশন নিয়ে রান্না করে নিজের খুশি মতন খাওয়ার কথাও অনেকবার লীলাকে বলেছে নবীন, তা-ও তার করবার ইচ্ছে হয়নি। সংসারের কোন দায় সে বহন করবে না, কোন কাজ করতে পারবে না। তবে কেন একটা ভীতু মানুষের সঙ্গে জোর করে তার বিয়ে দিল হারকু সাহেব। তার কথা ভাবতে-ভাবতেই লীলা মনে মনে বলল, হারকু সাহেব, আমি ইচ্ছে করে একসিডেন করব—মরে যাব।

লীলাকে অনেক সময় চুপ করে থাকতে দেখে তার মনে বিশ্বাস জাগাবার জন্যে নবীন আবার বলল, "দুটো নতুন বাঘ এসেছে না? আজ তাদের প্র্যাকটিস হচ্ছে, আমি সেখানে ছিলাম—"

এখনো কথা বলল না লীলা, ঘুমন্ত মানুষের মতন পড়ে থাকল। নবীনের কথা শোনবার তার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু তাহলেও আরও কথা বলল নবীন।

"মানুষ চেনে না হারকু সাহেব? আমাকে চিনেছে—বুঝলে? আমি বাঘ নিয়ে খেলব, রিং মাস্টার হব—হারকু সাহেব বলেছে। লীলা, ও লীলা, কথা শুনলে আমার?"

নবীন যেমন ভেবেছিল, লীলা এসব বিশ্বাস করল না—তাকে থামিয়ে দেবার জন্যে রুক্ষ গলায় বলল, "মদের ঘোরে কী বলেছে হারকু সাহেব তা শুনে মাঝরাতে চাল মারতে হবে?"

"আরে না, মোটে মদ খায়নি তখন—সকালবেলা ভোলাকে দেখবার জন্যে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম কি-না—"

"তোমার পায়ে পাড়ি, চুপ কর মাইরি", চেষ্টা করে লীলা একটা বড় হাই তুলল, "ঘুম পেয়েছে।"

যেকথা লীলাকে শোনাতে চেয়েছিল নবীন, সব বলতে পারল না, কিছু-কিছু বলল—সে তা-ও ভাল করে শুনল না, যতটুকু শুনল, বিশ্বাস করল না। নবীন জানত এমন হবে। ঘুম না এলেও পা টান-টান করে সে শুয়ে পড়ল।

বাঘের খাঁচার চাকা আবার আওয়াজ তুলল। আজকের মতন কাজ শেষ হয়েছে মদনমোহনের। এখন রিং অন্ধকার, চুপচাপ। ক্যাম্পখাটে পা ঘষে ঘষে তৃপ্তি অনুভব করছিল নবীন—চোখ বন্ধ করে মধুর এক কল্পনার ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছিল।

মধ্য রাতের শূন্য অন্ধকার রিং নয়, অন্য কোন ক্যাম্পের সন্ধ্যার উজ্জ্বল রিং। নতুন এক পরিচয় দিতে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে নবীন। দুটো বড় বড় খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে সুরয চাঁদনী ভোলা আর পান্না—জুয়েল সার্কাসের বাঘ সিংহ।

খোলা রিং-এ হিংস্র জানোয়ার মুক্ত করে খেলা দেখাচ্ছে নবীন একা। তার হাতে চাবুকও নেই। বাঘ সিংহ তার ঘাড়ে ও পিঠে পা তুলে তাকে মুহুর্মুহু লেহন করছে।

সেদিন লীলা তাকে দেখবে। ঘুম এসে যাচ্ছিল নবীনের।

॥ বার ॥

এখন ব্যথা নেই, শুধু ঠোঁট কালো হয়ে আছে—হঠাৎ আগুনের ছেঁকা লেগে পুড়ে যাওয়ার মতন। হেমলতা ছোট একটা আয়না মুখের কাছে এনে নিজের ঠোঁট দেখছিল। দিনে তিন বার মলম লাগাবার কথা, কিন্তু এখন ওসব কিছু করবার ইচ্ছে হল না হেমলতার।

বিছানা গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার ওপর বিষণ্ণ হয়ে হেমলতা বসেছিল। একটু দূরে উপুড় হয়ে পড়ে চোখা একটা কঞ্চি দিয়ে মাটিতে দাগ টানছিল শ্রীধরন এবং এক-একবার মুখ তুলে হেমলতাকে দেখছিল। তাকে দেখতে দেখতে এক চরিতার্থ কিশোর আপন মনে গানও গাইছিল।

একটা সাজান আসর এখন লন্ডভন্ড, বিশৃঙ্খল। ছোট ছোট তাঁবু খোলা কিম্বা আধখোলা—ঝড়ে ঝুলে পড়ার মতন। এক-একদিকে জিনিসের স্তূপ। মানুষের সংখ্যা অনেক কম। বাঘ সিংহর খাঁচাও নেই। যেখানে হাতি বাঁধা ছিল—বাঁধান শানের ওপর হলদে হয়ে আসা একটা কলাপাতা হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে।

কাল থেকেই প্রস্থানের তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, বড় তাঁবু খোলা হল কিছু আগে। এক-একটা রঙ করা পোল বড় রাস্তার আলোর থামের মতন—এখন তা মাটি থেকে উপড়ে নেয়া হচ্ছে। তারই আওয়াজ মানুষের গলার সঙ্গে মিশে একটা ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

খিদিরপুর অঞ্চলে কাল রাতে জুয়েল সার্কাসের শেষ খেলা হয়ে গেছে।

এখন যত তাড়াতাড়ি এখানকার সব ভেঙে-চুরে নতুন জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া যায়! যেমন করে জুয়েল সার্কাস হঠাৎ একটা শহর বহন করে নিয়ে এসেছিল এখানে—পোড়ো জমি খুঁড়ে-খুঁড়ে, আগাছা সাফ করে মানুষ ও জানোয়ারের সাময়িক বসবাসের জায়গা করে নিয়েছিল, ঠিক তেমন করেই রাতারাতি আবার অন্য জায়গার রূপ ফেরাবে।

এরা চলে যাওয়ার পরেও একবালপুর রোডের জমিতে অনেক দিন থাকবে রিং-এর দাগ, যেখানে-যেখানে খুঁটি পোতা হয়েছিল সেই সব গর্ত, রসড়ার কাছে পোড়া-পোড়া কালো ঘাস, ডিমের খোলা, আলু-পেঁয়াজের খোসা আর দড়ির দু-একট টুকরো। চিল উড়বে, কাকও জটলা করবে ফাঁকা জমিতে। রাস্তার কুকুর মাটি শুঁকে-শুঁকে এদিক থেকে ওদিকে যাবে।

কাল বিকেল থেকেই কিছু-কিছু সরঞ্জাম পাঠান হচ্ছিল টালিগঞ্জে। রাত বারোটার পর হাতি আর উটকে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জন্তু-জানোয়ারের খাঁচাও গেছে তখন। অনেক লোকও গেছে। নতুন ক্যাম্প সাজিয়ে খেলা শুরু করতে তিন-চার দিন দেরি। কেউ-কেউ ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে।

শাসন শৃঙ্খলা সার্কাসের সব কড়াকড়ি এ সময় বড় শ্লথ। যার-যার জিনিসপত্র গুছিয়ে চুপচাপ একদিকে বসে থাকা নিয়ম। সময় মতন ট্রাকে গিয়ে উঠতে হবে। কাকে কখন ট্রাকে চড়ে নতুন জায়গায় যেতে হবে ঠিক নেই কিন্তু তৈরি হয়ে থাকতে হবে সকাল থেকেই—ডাক আসবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র নিয়ে লাফিয়ে ট্রাকে উঠতে হবে। দেরি হলে জায়গা হবে না, অন্য কেউ উঠে পড়বে।

এ সময় খেলা নেই, প্র্যাকটিসও বন্ধ। বিশ্রামে অনভ্যস্ত শ্রীধরন মাটিতে কঞ্চির খোঁচা মেরে-মেরে দাগ কাটছিল এবং রাঘবন ছিল না বলে নির্ভয়ে হেমলতার দিকে তাকাতে পারছিল। তার ট্রুপের সব জিনিস আর ছেলেমেয়ে নিয়ে একবারে যেতে পারেনি রাঘবন। কিছু জিনিস পড়ে আছে, সে সব পাহারা দেয়ার জন্যে সে রেখে গেছে শ্রীধরন আর হেমলতাকে। রাঘবন তাঁবু নিয়ে ট্রাকে চড়েছে, আমিনা রেবতী আর নলিনী তার সঙ্গে গেছে।

আয়নায় নিজের কালো ঠোঁট দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল হেমলতা। এক সময় তার হাত থেকে ছোট আয়নাটা মাটিতে পড়ে গেল। আর দরকার ছিল না, আয়না পড়েই থাকল। হেমলতা নিচু হয়ে সেটা আর তুলে নিল না।

কড়া রোদ পড়েছিল হেমলতার মাথার ওপর, তাঁবু নেই। কিছু দূরে কলের জল পড়ে যাচ্ছে, স্নান করবার ইচ্ছে হলেও সে তা করতে পারল না, হঠাৎ ট্রাক এসে পড়তে পারে। খিদেও পেয়েছিল তার। অন্যান্য দিন প্র্যাকটিসের পর শুকনো একটা রুটি পাওয়া যায়, আজ রাঘবন রান্না করতে দেয়নি। সে কখন খেতে পাবে, জানে না। হেমলতা তার মা-বাবার কথা ভাবছিল।

বাবা বলেছিল, কোন না কোন ক্যাম্পে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে আসবে। এখনো আসেনি। ছোট একটা বোন আছে হেমলতার, সে কত বড় হল এতদিনে! হেমলতা যখন প্রথম সার্কাসে আসে তখন তার বোন ভাল করে কথা বলতে পারত না, বেড়ালের বাচ্চার মতন শব্দ করত—ঝাঁপিয়ে আসত তার কোলে।

ঠোঁটে আস্তে আঙুল বুলিয়ে নিতে-নিতে হেমলতা ভাবল, সে সার্কাসে চলে আসবার পর প্রথম প্রথম তাকে না দেখতে পেয়ে হয়তো খুব কেঁদেছিল তার বোন। কেননা তার জন্মের সময় থেকেই মা-র অসুখ, হেমলতাই দেখত তার মা আর বোনকে—বাবাকেও।

হেমলতার বাবা শখ করে তাকে সার্কাসে দেয়নি। শখ করে কেউ মেয়েকে দেয় না সার্কাসে। কাপড়ের যে-তাঁতে কাজ করত তার বাবা, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও কাজ নেই। মার অসুখ, আর একটা ছোট বোন—এত লোক খাবে কী! এমন সময় গিয়ে পড়ল রাঘবন।

হেমলতার হাত থেকে আয়না পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল শ্রীধরন। এখন সে উঠে দাঁড়াল। হাত প্যাণ্টে ঘষে-ঘষে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে আয়নাটা তুলতে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু সময় হেমলতার ঈষৎ ফোলা কালো ঠোঁট দেখল।

"এ হেম?" শ্রীধরন হেমলতার গায়ের কাছে এসে আস্তে ডাকল।

"উঁ?"

"কাঁদছিস?"

হেমলতা জানত না বাড়ির কথা ভাবতে-ভাবতে তার দু-চোখে জল টস-টস করছিল, এখন শ্রীধরনের কথা শুনে আধ-ময়লা ঘাগরার একাংশ তুলে সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, "দূর! তুই অন্ধ হয়ে গেলি নাকি শ্রীধরন?"

শ্রীধরন হাসল। মিথ্যা কথা বলছে হেমলতা। শ্রীধরন জানে হেমলতার স্বভাবই এমন। মাস্টারের কাছে মার খাওয়ার সময় মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় চীৎকার করলেও পরে সে একটা কথাও আর বলে না। যতই কষ্ট হোক তার, তা স্বীকার করতে চায় না।

"তোর ঠোঁটে এখনো জ্বালা আছে, না রে?"

"ন্যা-না, কবে সেরে গেছে", পা নাচাতে-নাচাতে হেমলতা বলল, "মাস্টার মলম এনে দিয়েছিল, খুব ভাল মলম—একদম জ্বালা নেই", সে শ্রীধরনের দিকে তাকিয়ে একটা আঙুল তুলে তার ঠোঁট দেখাল, "দেখ না?"

হেমলতার ঠোঁট দেখতে-দেখতে তার পায়ের কাছে ছোট আয়নাটা আর একবার দেখল শ্রীধরন। আয়নায় আকাশের ছায়া—সাদা এবং নীল রঙ। শ্রীধরন হেমলতার কালো ঠোঁট দেখতে পারল না, পায়ের কাছে আকাশের অংশ দেখতে দেখতে বলল, "ঠোঁটে মলম লাগাসনি আজ?"

"না, কৌটো হারিয়ে গেছে।"

"না রে, হারায়নি", প্যাণ্টের পকেট থেকে মলমের ছোট কৌটো বের করে হেমলতার মুখের সামনে তুলে ধরে শ্রীধরন বলল, "এই দেখ, আনলোডিং-এর সময় তুই কোথায় হারিয়ে ফেলবি, তাই আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম—"

শ্রীধরন ভেবেছিল তার কথা শুনে খুব খুশি হবে হেমলতা, হাত বাড়িয়ে মলমের কৌটো চাইবে কিন্তু সে একটা কথাও বলল না, নিচু হয়ে আয়না তুলে নিল, উল্টো করে সেটা তার কোলের ওপর রেখে ট্রাকের শব্দ শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকল।

"এ হেম?"

"উঁ", অন্য দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণার মতন অস্ফুট শব্দ করল হেমলতা, শ্রীধরনের দিকে ফিরে তাকাতে তার বড় কষ্ট হচ্ছিল এবং ভয়ও লাগছিল।

একদিন খেলা করে হেমলতার চুল টেনেছিল শ্রীধরন, কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, এডি!

সেদিনও শ্রীধরনের মুখে প্রিয়া ডাক শুনে চমকে উঠেছিল হেমলতা, ভয় পেয়েছিল কেননা এসব জানতে পারলে লোহা গরম করে দুজনের হাতে-পায়ে ছেঁকা দেবে রাঘবন—হেমলতার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা দেবে শ্রীধরনকে। সেসব ভেবে এখনো তার ভয় লাগছিল।

নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা হাতির পিঠের মতন যে বিছানার ওপর চুপচাপ বসেছিল হেমলতা, এখন শ্রীধরনও সেখানে বসল এবং কৌটো খুলে কিছু মলম তুলে নিল ডান হাতের আঙুলে—"মলম লাগাবি না হেম?"

"না, দরকার নেই।"

"আয়, আমি লাগিয়ে দি", হেমলতার দিকে ফিরে তার ঠোঁটের কাছে মলম-মাখা আঙুল নিয়ে এসে বড় অন্তরঙ্গ স্বরে শ্রীধরন বলল।

"এই, কী করিস? না-না—" ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হেমলতা। এদিক-ওদিক দেখছে। হাসাহাসি করছে বাহাদুর আর সহদেব। কলের তলায় বালতি রেখে ঘটি-ঘটি জল মাথায় ঢেলে গা ঘষে-ঘষে স্নান করছে হাসি। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে গোহনলাল হাসিকে দেখছে।

একটু দূরে টুনি মাসির তাঁবু—এখনো খোলা হয়নি। বাইরে জড়ো করা অনেক জিনিস। কাণ্ডী বেলা শান্তা কিশোরী বাণী মঞ্জু টুনি মাসির কাছা-কাছি আছে। বাজার মাস্টার শ্যামসুন্দর হাত নেড়ে ডাকছে টুনি মাসিকে।

লোহার ওপর জোরে-জোরে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বড় তাঁবুর এক-একটা পোল জোর করে কাত করে দিচ্ছে অনেক মানুষ। ট্রাক আসছে হুড়মুড় করে। সুবলবাবু সহদেব আর সার্কাসের যত রিং-বয় গুনে-গুনে গাড়িতে জিনিস তুলে দিচ্ছে।

শ্রীধরন কোন শব্দ শুনল না, কারুর দিকে তাকিয়ে দেখল না—অসংখ্য মানুষের সামনে সার্কাস দেখাবার মতন অসঙ্কোচে হাত ধরল হেমলতার, "মলম না লাগালে মাস্টারকে বলে দেব। এই হেম, বস এখানে—"

শ্রীধরন হাত ধরে টানলেও এত মানুষের সামনে তার পাশে আর বসবার সাহস হল না হেমলতার। কোন দোষ না করলেও তার মনে হচ্ছিল শিমুল তুলোর মতন শ্রীধরনের ছোট্ট একটা অনিয়ম হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে রাঘবনের কাছে। যে-কোন মুহূর্তে একটা ট্রাকে এখানেই ফিরে আসবে সে—ভাঙা সসার আবার ঘষে দেবে তার ঠোঁটে, লাঠি মারবে শ্রীধরনের মাথায়। নিজের কথা যত না ভাবছিল হেমলতা, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবছিল শ্রীধরনের কথা। এবং একটা ভয় তার মনে সিরসির করে উঠছিল।

"মাস্টার কী করবে আমার", হাওয়ার ঝাপটায় ঘাগরা অনেকটা উঠে যাচ্ছিল বলে হাত দিয়ে তা নামিয়ে নিতে-নিতে বিরস মুখে কথা বলল হেমলতা, "মাস্টার তোকেই মারবে—দেখিস!"

"কেন?"

"আমার ঠোঁটে আঙুল ঘষলে, মারবে না?"

"মারুক, মার খেতে-খেতে মরেই যাব—"

হেমলতা হেসে বলল, "মরে যাবি কী রে? বড় হবি না? কী বলেছিলি আমাকে মনে নেই?"

"হুঁ, মনে আছে", মাটিতে জোরে-জোরে পা ঘষল শ্রীধরন, আঙুলে মাখনের মতন সবুজ মলম দেখতে দেখতে ছেড়ে-ছেড়ে এক-একটি ভারী শপথ উচ্চারণ করতে থাকল, "আমি সব খেলা শিখব, সেরা খেলোয়াড় হব, দু হাজার টাকা মাইনে পাব—"

"হুঁ হুঁ, বল না তারপর?" কৌতুকের আমেজে চমকে উঠছিল হেমলতার কথায়। এখন তার ভয় মুছে গিয়েছিল। হাসির পাতলা একটা আভা তার বিক্ষত ঠোঁটও সুন্দর এবং যন্ত্রণামুক্ত করে তুলেছিল।

"তারপর জেমিনির মতন বড় একটা সার্কাস পার্টি বানিয়ে ফেলব। আমিই মালিক। বিশটা হাতি কিনব। শিম্পাঞ্জি কিনব। চার-পাঁচটা রিং-মাস্টার থাকবে—"

"বল না?" শুধু শ্রীধরনের ঝকঝকে ভবিষ্যতের কথা নয়, তার মুখে নিজের কথাও শুনতে চাচ্ছিল হেমলতা, তাকে যে কথা সুযোগ পেলেই সাহস করে বারবার সে শোনায়, আজও তা বলবে, হেমলতা জানত।

"আর তুই হবি তখন আমার সার্কাসের মালিকানি—আমার বউ", শ্রীধরন দুষ্টু ছেলের মতন হেসে বলল, "এ্যাডি—প্রিয়া পেট্টা!"

অন্য দিন এত কথা হেমলতা শোনে না, অল্প ইঙ্গিত পেলেই ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় শ্রীধরনকে। আজ তার সব কথা শুনল সে। রোদে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, লজ্জার মতন। কিন্তু আজ কোন লজ্জা ছিল না হেমলতার, সার্কাস শেষের লণ্ডভণ্ড বিশৃঙ্খল জমির ওপর দাঁড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার সময় তার মনে বেদনার একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

"এ শ্রীধরন—" যা বলতে চেয়েছিল হেমলতা তা বলবার সময় ইতস্তত করল, হঠাৎ বলতে পারল না। এক আঙুল দিয়ে সে তার আর এক আঙুলে খোঁচা মারতে থাকল।

"কী রে?"

হেমলতা মাটির দিকে তাকিয়ে ঘাসে জোরে-জোরে পা ঘষে-ঘষে বড় করুণ করে বলল, "আমাকে আর একটা তাম্বু দিবি, তুই যখন সার্কাস বানাবি—তখন?"

"হ্যাঁ, দেব", বিমূঢ়ের মতন হেমলতার দিকে তাকিয়ে শ্রীধরন জিজ্ঞেস করল, "কার জন্যে তোর তাম্বুর দরকার হেম?"

"আমার মা-বাবা আছে না? তাদের ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হয় রে—" হেমলতা একবার আকাশ দেখল, পরে মাটি দেখতে দেখতে ধরা গলায় বলল, "আমার একটা ছোট বোন আছে রে শ্রীধরন—তার কথা মনে হলে আর কিছু আমার ভাল লাগে না, খালি-খালি কান্না পায়—"

হেমলতার কান্না-কান্না মুখ দেখতে দেখতে এবং তার ভিজে ও ভারী গলার স্বর শুনতে শুনতে বড় অস্থির হয়ে শ্রীধরন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খুব বড় তাম্বু তোর মা-বাবার জন্যে আমি বানিয়ে দেব—হাঁ-হাঁ, ঠিক। আর তোর বোন আমার সার্কাসে খেলা দেখাবে—তাকে আমি অনেক রুপেয়া দেব—"

হেমলতা জোরে-জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, কখনো না। আমার বোনকে আমি সার্কাসে কখনো খেলতে দেব না।"

"কেন রে?"

"ছোট বাচ্চা, মাস্টার মারলে খুব কাঁদবে, ভয় পেয়ে মরে যাবে—তখন আমি কী করব রে শ্রীধরন?"

এত পরে, হেমলতার কথা শুনে হঠাৎ জুড়িয়ে গেল শ্রীধরন। তার আঙুলে তখনো সবুজ মলম, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছিল—সে তা দেখল। মা বাবা ভাই বোন, হেমলতার মতন কেউ ছিল না শ্রীধরনের। সে তার বুড়ি ঠাকুরমার মুখে শুনেছে, তার যখন মোটে কয়েক মাস বয়েস তখন জোর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল কুথুপারাম্বা গ্রামে—সেবছর না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরেছে শ্রীধরনের বাপ-মা। তার ঠাকুরমা বেঁচেছিল অনেক দিন। তাকে রাঘবনের কাছে অল্প টাকায় বিক্রি করে খুব অল্পদিন আগে বুড়ি মরেছে।

এত কথা কখনো মনে হয় না শ্রীধরনের, ঠাকুরমার কথাও সে ভাবে না। আজ হেমলতার বাড়ির কথা শুনতে শুনতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে উদাস হয়ে থাকল। একটা থুড়থুড়ে বুড়ি, যে তাকে ভালবাসত মায়ের মতন—শ্রীধরন তার কথা ভাবল।

যেখানে রাঘবনের ফেলে যাওয়া জিনিস পাহারা দিতে-দিতে কথা বলে যাচ্ছিল হেমলতা আর শ্রীধরন, সেখান থেকে অনেকদূরে—সার্কাসের ভাঙা-ভাঙা রিং-এর ওপারে ফাল্গুনের হাওয়ার ঝলক ছোট একটা প্রজাপতি ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল। হেমলতা প্রথম দেখল। এবং সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ভাবান্তর ফুটে উঠল তার চেহারায়। হেমলতার কচি মনের সব দুঃখ ও যন্ত্রণা বাসি ফুলের মতন ঝরঝর করে ঝরে পড়ল।

"এ শ্রীধরন, দেখ ওই—" প্রজাপতির দিকে আঙুল দেখিয়ে খুশিতে চীৎকার করে বলে উঠল হেমলতা, "চল, ধরি?"

শ্রীধরন কিছু দেখতে পেল না, সে বুঝতে পারল না হঠাৎ কী দেখে এত খুশি হয়ে উঠল হেমলতা, কিন্তু সে-ও হাসল। হেমলতার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে শ্রীধরন তাকে কিছু পরে জিজ্ঞেস করল, "কী ধরবি রে?"

যেখানে বাঘ সিংহর খাঁচা ছিল, বট গাছের নিচে, চাকার আঁকাবাঁকা দাগ মাড়িয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল হেমলতা। এদিক-ওদিক খুঁজল। হাওয়া দূরে ঠেলে নিয়ে গেছে প্রজাপতিকে, এখানে কোথাও নেই। শ্রীধরনকে সে কিছু বলতে পারল না এখন। বাঘ সিংহ নেই কিন্তু এখনো একটা উৎকট গন্ধ লেগে আছে এখানকার মাটিতে।

মুখ নিচু করে হেমলতা আস্তে ডাকল, "শ্রীধরন?"

"কী রে? এখানে এলি কেন, বল না?"

হেমলতা যে প্রজাপতি দেখতে পেয়ে এদিকে ছুটে এসেছিল সেকথা বলল না শ্রীধরনকে। সে হঠাৎ হেসে বলল, "কৌটো থেকে আঙুলে মলম তুলে নিয়েছিলি কখন! শুকিয়ে গেল যে। আমার ঠোঁটে লাগিয়ে দিবি না? উঃ, এখন বড় জ্বালা করছে রে!"

"হুঁ হুঁ, আয়—" এত সময় যে মলম আঙুলে মাখিয়ে রেখেছিল শ্রীধরন, এখন তা সাবধানে লাগিয়ে দিল হেমলতার ঠোঁটে এবং পরে প্যাণ্টে আঙুল ঘষে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। রাঘবনের ওপর রাগ হচ্ছিল শ্রীধরনের।

"আমি যখন বড় হব, এ হেম শুনলি? এক রাতে আমি মাস্টারকে খুন করব—"

"এই চুপ! এসব বললে আমি তোর সাথে কথা বলব না। মাস্টার না থাকলে কে খেলা শেখাবে তোকে? কে খেতে দেবে?" খাওয়ার কথা বলতেই গলা শুকিয়ে এল হেমলতার, বমি ঠেলে আসতে চাইল। শ্রীধরন কিছু করতে পারবে না জেনেও সে তাকে বলল, "বড় খিদে লেগেছে আমার।"

শ্রীধরনেরও খিদে পেয়েছিল, কিন্তু এখন খিদে মেটাবার জন্যে কিছুই করতে পারে না ওরা। রসড়াও এখন ফাঁকা। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার দিন যা-তা করে কাজ সারে শ্যামসুন্দর, তাড়াতাড়ি সকলকে খাইয়ে দেয়। রসড়ায় কিছু নেই এখন।

রসড়ায় রান্না হলেও সেদিকে যেতে পারে না হেমলতা আর শ্রীধরন—কেউ তাদের একটুকরো আলুও খেতে দেবে না। তারা রাঘবনের ট্রুপের ছেলে-মেয়ে। আজ হয়তো রাঘবন তাদের না খাইয়ে রাখবে। কতবার এমন হয়েছে!

হেমলতার কথা শুনে ভাঙা রসড়ার দিকে তাকাল শ্রীধরন, রাধানাথবাবুর তাঁবুও দেখল দূরে থেকেই। শ্রীধরনের মনে হল উনুনের কাছে বসে আছে যমুনা—হয়তো রান্না করছে। ওরা খাওয়া শেষ করে তবে যাবে এখান থেকে।

"হেম, আমি ওই তাম্বুতে যাই—" রাধানাথবাবুর তাঁবু দেখতে দেখতে শ্রীধরন বলল, "তোর জন্যে কিছু তরকারি চুরি করে নিয়ে আসি?"

হেমলতা শুকনো মুখে বলল, "ওরা খুব চালাক। তোকে ধরে ফেলবে—মাস্টারকে বলবে। ওদিকে যাস না।"

"তবে কোন দিকে যাব?" শ্রীধরন বলল, "আজ কিছু খেতে দিল না মাস্টার। নয়া ক্যাম্পে নলিনী কিছু তরকারি বানাবে কি-না জানিস?"

"জানি না।"

"ওই দিকে চল", শিবনাথের তাঁবু তখনো খোলা হয়নি, সে এখন আছে কি-না কে জানে, হেমলতার সংগে তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল শ্রীধরন।

প্রথমবার নয়, আগেও কয়েকবার হেমলতা এসেছে শিবনাথের তাঁবুতে। যেদিন-যেদিন শাস্তি দিয়েছে রাঘবন, রাগ করে কিছু খেতে দেয়নি সেদিন খিদের জ্বালায় অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে শিবনাথের তাঁবুতে এসেছে হেমলতা—রুটি তুলে নিয়েছে, মাংস চুরি করে খেয়েছে। শ্রীধরনও কয়েকবার এমন করেছে।

"নাঃ, আজ কিছু নেই", শিবনাথের তাঁবুর মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতন হেমলতাকে বলল শ্রীধরন, "চল, তাড়াতাড়ি পালাই এখান থেকে। ওই দেখ, সহদেব দেখছে আমাদের—মাস্টারের কাছে লাগিয়ে দিলে—"

শুধু শিবনাথের তাঁবুর মধ্যে হেমলতা আর শ্রীধরনকে এখন দেখল না নবীনের সহকারী ক্যাশিয়ার সহদেব, জিনিসপত্র গুনে-গুনে ট্রাকে তোলার ফাঁকে-ফাঁকে এবং অন্য কাজ করতে-করতে সে অনেক আগে থেকেই তাদের লক্ষ করছিল।

হেমলতা আর শ্রীধরন নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না, তার আগেই সহদেব এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। চতুরের মতন চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে সে হাসল এবং হেমলতার হাত টানল, "চল আমার সাথে।"

আর এক রাতেও হেমলতার হাত টেনেছিল সহদেব, গাল টিপে দিয়েছিল। শ্রীধরনও জানত না। খুব ভয় পেয়েছিল হেমলতা। রাঘবনকেও এসব বলতে তার সাহস হয়নি।

এখন রাত নয়। রোদ ঝলসাচ্ছে। শ্রীধরনও আছে তার পাশে তাহলেও অন্ধকার-অন্ধকার লাগছিল হেমলতার—ভয়ে তার দেহ শক্ত হয়ে এসেছিল।

সহদেব কী বলতে চায় তা বুঝতে পারেনি শ্রীধরন। সে-ও ভয় পেয়েছিল। কেননা শ্রীধরন ভাবছিল শিবনাথের তাঁবুতে তারা খাবার চুরি

করে খেতে এসেছে বলে সহদেব তাদের দুজনকে হারকু সাহেবের কাছে এখন ধরে নিয়ে যাবে—মার খাওয়াবে।

শ্রীধরন হাত জোড় করল, করুণ স্বরে বলল, "এমন আর কখনো করব না, এবারে ছেড়ে দাও—"

"তুই থাম বদমাশ ছোকরা", হাত তুলে শ্রীধরনকে মারতে উঠল সহদেব, "যা ভাগ এখান থেকে!"

"চলে আয় হেম—"

"এই, ও কোথায় যাবে?"

সহদেব হেমলতার হাত টানতে-টানতে বলল, "ও এখন আমার সাথে আমার রাউটিতে যাবে—"

"কেন?" শ্রীধরনের স্বর কান্নার মতন। সে হেমলতাকে একা মার খেতে দেবে না, সে-ও যাবে সহদেবের সঙ্গে।

হেমলতা কেঁদে বলল, "হাত ছেড়ে দাও, আমি যাব না।"

"এই চল জলদি—" জানোয়ারের মতন উগ্র হয়ে উঠল সহদেব, "যাবি না মানে? এই ছোকরার সাথে কী করছিলি ওই গাছের তলায়? যদি আমার সাথে এখন আমার রাউটিতে না যাবি তো আমি তোদের মাস্টারকে সব বলব।"

শ্রীধরন বলল, "ও কী করেছিল গাছের তলায়?"

"শালা কিছু জানিস না? তুই চুমা খাসনি ওকে—ঠোঁটে হাত দিসনি? আমি সব দেখেছি।"

একটা বিস্ময় ও বেদনা শ্রীধরনের নিষ্পাপ কচি মুখ থেকে সব রক্ত শুষে নিচ্ছিল। তার শক্তি নেই। শিবনাথের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে সে তার মতন শক্তিমান হয়ে উঠে সহদেবের কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। কেননা এখন শ্রীধরন কিছু কিছু বুঝতে পারছিল সহদেব কেন তার তাঁবুতে হেমলতাকে একা টেনে নিয়ে যেতে চায়।

যে কথা বলল সহদেব তা শুনে কান্না থেমে গিয়েছিল হেমলতার, হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টাও সে আর করল না। নিজের কথা সে এবারেও ভাবল না। রাঘবনের কঠোর শাসন থেকে শ্রীধরনকে রক্ষা করতে পারবে বলে সহদেবের তাঁবুতে যাবার জন্যে হেমলতা হঠাৎ মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকল।

সেই সময় একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল কিছু দূরে। ওরা দেখল, অনেক সময় ইতস্তত করে স্থূল রাঘবন লাফ দিয়ে নামছে। হেমলতার হাত ছেড়ে সরে গেল সহদেব।

ঘোরের মতন মনে হচ্ছিল হেমলতার, শ্রীধরনেরও। রাঘবনকে আসতে দেখলেও তারা তার আগে নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না। যখন গেল, তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাঘবনের ক্রুদ্ধ চোখ তাদের খুঁজছে।

"এই, সব জিনিসপত্তর ফেলে কোথায় গিয়েছিলি?" শ্রীধরনের চুল ধরে তার মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে রাঘবন জিজ্ঞেস করল।

রাঘবনের কাছে অনেকবার মার খেয়েছে শ্রীধরন, মারের ভয় তার ছিল না— সহদেব অল্প আগে যা বলে শাসিয়েছিল তা এখনো ভুলতে পারছিল না বলে সে খুব দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়েছিল।

"বল, কেন আমার কথা শুনিস নি? কোথায় গিয়েছিলি?"

"আমি যাইনি—" শ্রীধরন বলল, "হেম আমাকে ওই দিকে—গাছের নিচে যেতে বলল—"

"হেম!" রাঘবনের শক্ত হাত হেমলতার নরম গালে খুব জোরে পড়ল, "খেলা করতে এসেছিস এখানে? একটা জিনিস যদি হারায় আমি তোদের মাটিতে পুঁতে রেখে যাব—" ঘটি বালতি ট্রাঙ্ক বিছানা একে-একে গুনে দেখল রাঘবন। কিছু হারায়নি। সব ঠিক আছে।

"নে, এসব তোল! চল এবার!"

যত জিনিস পড়েছিল, সব বয়ে নিয়ে চলল হেমলতা আর শ্রীধরন—ট্রাকে গিয়ে উঠল।

একেবারে চুপ হয়ে গেছে হেমলতা। বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাচ্ছিল। কাছেই টালিগঞ্জ। এক-একবার ট্রাকের ঝাঁকানিতে হেমলতার গায়ে গা ঠেকছিল শ্রীধরনের, তখন আরও সরে বসবার চেষ্টা করছিল সে।

যে-মলম তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়েছিল শ্রীধরন, এখন হেমলতা তা আঙুল ঘষে-ঘষে তুলে ফেলল।

॥ তের ॥

এতদিন খণ্ড খণ্ড ধোঁয়াটে মেঘের মতন এক-একটি তাঁবু আচ্ছন্ন করে রেখেছিল খিদিরপুর অঞ্চলের একটা বৃহৎ জমিকে, এখন সব পরিষ্কার। চারপাশ অবারিত। স্পষ্ট, ধুধু। শুধু আহ্লাদী রোদ আপনমনে খেলছে।

কিন্তু এখনো একটি তাঁবু থেকে গেছে। তা গুটিয়ে নেওয়া হবে, আরও পরে। সব শেষে ট্রাকে চড়ে নতুন ক্যাম্পে যাবে এক ভদ্র পরিবার—রাধানাথবাবু আর তার দুই মেয়ে হাসি, যমুনা।

আরও একটি মানুষ আছে এখানে। ব্যাণ্ডের আর সব লোক, হীরু, শ্যামল, মণিবাবু চলে গেছে অনেক আগে, মোহনলাল যায়নি। সে যাবে রাধানাথবাবুর সঙ্গে একই ট্রাকে। প্রত্যেকবার এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে যাবার সময় এমন করেই পুরনো জায়গায় শেষ অবধি পড়ে থাকে মোহনলাল।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উপচে উঠছে বালতি—এখনো স্নান করছে হাসি, ঘটি ঘটি জল মাথায় ঢালছে। বালতি ভাঙা, পুরনো—একদিকে কাত হয়ে আছে। নিচু হয়ে জল তুলে নেওয়ার সময় হাসির ভিজে শাড়ি অনেকটা সরে যাচ্ছে। সে এখন অসাবধান, এ সবে তার খেয়াল নেই।

হাসির দেহের অনাবৃত অংশ দেখতে দেখতে কিছু দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ধৈর্য থাকল না মোহনলালের। এদিকটা ছায়া-ছায়া, পিঁপড়ের গর্ত আছে কোথাও। তার পায়ে পিনের মতন পিঁপড়ে খোঁচা মারছিল। এক পা দিয়ে সে চেপে চেপে আর এক পা ঘষছিল।

হাসির দেহ কলের জলে ভিজছে, নরম রোদে ঝকমক করছে। বড় অদ্ভুত। সময় না নিয়ে হঠাৎ বেশী করে ফুটে ওঠার মতন। এক-একবার সে-ও মোহনলালের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তার চুল থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে।

নির্জন পরিত্যক্ত একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে জুয়েল সার্কাসের গীটার বাদক মোহনলাল বুভুক্ষু একটা মানুষের মতন হাসির বুক দেখল, সম্মুখ ও পিছন দেখল, পাহাড়ী প্রস্রবণের মতন জলের শব্দও শুনল এবং পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে আঙুল তুলে ইশারায় হাসিকে বলল, "যাব ওখানে?"

মুখে জল ভরে কয়েক মুহূর্ত গাল ফুলিয়ে রাখল হাসি, কিছু পরে সে গাছের দিকে তাকিয়ে পিচকিরির মতন মুখের জল নিঃশেষ করল এবং আরও পরে আঙুল খেলাতে খেলাতে সে-ও বলল, "কেন?"

মোহনলাল প্রথমে বুকে হাত রাখল, পরে তা শূন্যে মেলে দিয়ে হাসল, "যাচ্ছি—"। সে এগিয়ে যেতে লাগল জলের কলের দিকে থেমে-থেমে, তার পায়ে এখনো যে পিঁপড়ে সেঁটেছিল তা ঘষতে ঘষতে।

শাড়ি নিঙড়ে-নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল হাসি। তার দেহ অল্প বেঁকেছে, বাঁ দিকে হেলে আছে বৃষ্টির পরে ছোট একটা গাছের মতন। মোহনলালকে এ সময় তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের ওপর থেকে ভিজে চুল সরিয়ে দিল হাসি, "এখানে না, দূর! রাউটিতে যেতে পারেন না?"

মোহনলালের পা জ্বলছিল, রবারের চটির ওপর থেকে পা তুলে নিয়ে সে মুখ নিচু করে বলল, "সেখানে যমুনা আছে না, রাধানাথবাবু আছে না?"

"তো কী হয়েছে?" চুলে গামছার আছাড় মারছিল হাসি, মোহনলালের মুখেও জল ছিটকে যাচ্ছিল। থেকে থেকে সে চোখ বন্ধ করছিল। তাকে দেখে একটা কৌতুক অনুভব করতে করতে হাসি বলল, "তারা কি বাঘ? কামড়ে দেবে আপনাকে?"

মোহনলাল হেসে বলল, "দিতে পারে, কে জানে!"

"না-না, দূর! দিদি খুব ভক্তি করে আপনাকে। বাবাও আপনার কথা কত বলে!"

"কী বলে?"

"দিদি বলে, খাঁটি মানুষ। বাবা বলে, অনেক গুণ আছে আপনার—"

"কী গুণ?"

"বা রে, আমি তা কেমন করে জানব?" সাবানের ছোট লাল একটা বাক্স মাটিতে পড়েছিল, তা-ও জলে ভিজেছে। সেদিকে তাকিয়ে হাসি বলল, "আপনি বাজনা-টাজনা বাজান তো, সেসব ভেবেই বাবা হয়তো বলে—"

হাসির লাল সাবানের বাক্স তুলে নিল মোহনলাল, নাকের কাছে নিয়ে এল। বাক্সর মধ্যে অল্প জল ছিল, সাবান চেপে ধরে সে তা ফেলতে ফেলতে বলল, "বাজনা শোনে কে? বাঘ সিংহ হাতি ভাল্লুক? হুঃ—" বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করে মোহনলাল বলল, "আর ভাল লাগে না!"

"তবে কেন পড়ে আছেন সার্কাসে?"

"জান না?"

ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল হাসির, সে চলে যেতেও পারছিল না। মোহনলালের জিজ্ঞাসা ঠাণ্ডা হাওয়ার মতন তার গায়ে সিরসির করে উঠল। কিছু দূরে তাঁবু। হাসি এখন সেদিকেও তাকাতে পারল না।

মোহনলাল আবার বলল, "তোমার জন্যেই তো পড়ে আছি এখানে। বিয়ে হলে আর থাকব নাকি?"

"যাঃ!"

"সত্যি বলছি হাসি, তোমার কথা ভেবেই নড়তে পারি না—" হাসির সাবানের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মোহনলাল বলল, "কে বুঝবে আমার কদর এখানে? আমি রেডিওতে বাজাব, থিয়েটার-সিনেমায় বাজাব—" একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যেতে লাগল সে, "নাম হবে, পয়সা হবে—সব হবে—"

হাসির ভিজে দেহের ওপর মোহনলালের ছায়া পড়েছিল, কয়েক পা সরে

গেল হাসি—রোদে দাঁড়িয়ে বলল, "কত পয়সা হবে—অনেক?"

মোহনলাল নিচু হয়ে পা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "এখানে যা পাই তার চেয়ে বেশী পয়সা তো পাব। তোমার জন্যেই কিছু করতে পারি না—"

হাসি মোহনলালের হাত থেকে আস্তে সাবানের বাক্স টেনে নিল, তা বন্ধ করতে করতে বলল, "আমি কী করব।"

"আমার সাথে বিয়ে হবে তোমার, তারপর এখান থেকে পালাব—তুমি আমার মায়ের কাছে থাকবে।"

হাসি তার ভিজে বুকে গামছা জড়াতে জড়াতে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তার আরও কাছে সরে এসেছিল মোহনলাল, আবার তার ছায়া পড়েছিল। হাসির বুক কনকন করছিল, কাশি আসছিল।

সে বলল, "পাকা বাড়ি তো আপনাদের, না?"

"হ্যাঁ, কাছেই—কোন্নগরে।"

"সেখানে কে আছে, মা-বাপ?"

"বাবা নেই," কথা বলতে বলতে মোহনলাল এক-একবার হাসির ভিজে শাড়ি স্পর্শ করছিল, এখন তার বুকের ওপর থেকে পলকে গামছা তুলে নিয়ে নিজের গালে-মুখে ঘষল, "বাবা মরেছে আমার ছোট বয়েসে। দাদা আছে, তার বউও আছে—"

"আপনার দাদাও বাজনা বাজায়?"

"না, পাঠশালায় পড়ায়—মাস্টার। তারা জানে না আমি সার্কাসে ঢুকেছি, জানতে পরলে—"

"কী হবে?" হাসির মুখ নিভে এল, যে গামছা তার কাছ থেকে নিয়েছিল মোহনলাল, সে তা আবার টেনে নিয়ে বুক ঢাকল।

"হবে আবার কী, খুব অবাক হয়ে যাবে—" মোহনলালের সিগ্রেট পোড়া কালো কালো ঠোঁটে শুকনো হাসি ফুটে উঠল, "আসার সময় তাদের বলে এসেছিলাম বায়স্কোপে বাজাব, নিজের থাকা খাওয়ার খরচ নিজেই চালিয়ে নেব—"

"তা তো চালিয়ে নিচ্ছেন।"

"দূর, এমন করে বেশীদিন চলে না, আমার এসব অভ্যেস নেই", যেদিকে এখনো রিং-এর জমি স্তূপের মতন হয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে মোহনলাল ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এখানে থেকে কিছু যে চেষ্টা করব তা-ও হয় না—"

"কেন?"

"একটু ঘোরাঘুরি করতে হয়, ধরাধরি করা দরকার—কখন করব? ঠিকানা কোথাকার দেব? চিঠি-চাপটা যে লিখব মানুষকে তার জবাব তারা দেবে কোথায়!"

"আপনার বাড়ির ঠিকানা দেবেন—"

"আরে না না", মোহনলাল অপ্রস্তুতের মতন বলল, "বাড়ি-টাড়ি আমি তো যাই না এখন, একেবারে বউ নিয়ে যাব—" সে এখনই হাসিকে সতর্ক করবার জন্যে রাধানাথবাবুর তাঁবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আস্তে বলল, "সার্কাসের কথাটা আমার মা দাদা-বউদিকে বল না হাসি, চেপে যেও—আমি যেমন বলব, ওরা কিছু জিজ্ঞেস করলে তুমিও তেমন বলবে।"

সার্কাস করার মধ্যে যে কোন গৌরব নেই, এ জীবন মানুষ বেছে নেয় নিরুপায় হয়েই, হাসি তা জানে। পাকা বাড়ি বিক্রি করে রাধানাথবাবু তাদের

তাঁবুর নিচে নিয়ে এসেছে বলে যমুনা তাকে বাপের সম্মান করতে পারে না—গাল দেয়, তুচ্ছ করে। তবে এখানে খারাপ লাগে না হাসির, রাধানাথ-বাবুকেও তার ভাল লাগে। কিন্তু এসব কথা যমুনাকে বলতে তার সাহস হয় না।

মোহনলাল কেন তার মা-দাদার কাছে সার্কাসের কথা লুকিয়ে যেতে চায় হাসি তা বুঝল এবং কিছু পরে বলল, "জানেন, উলুবেড়েতে আমাদেরও পাকা বাড়ি ছিল—"

"জানি, এখানে তোমাদের থাকতে খুব কষ্ট হয় তা-ও বুঝি—"

মোহনলাল হাসির পায়ে বুড়ো আঙুলের খোঁচা মেরে বলল, "আমি তোমাকে পাকা বাড়িতে নিয়ে তুলব ঠিক, টালিগঞ্জের ক্যাম্পে সব ব্যবস্থা করে ফেলি? আর নয় তো চল না রাতের বেলা পালিয়ে যাই, পথে সিঁদুর কিনে বিয়ে সাধি হবে এখন—"

"দূর, আমি ওসব পারব না, আমার ভয় লাগে—" মোহনলালের মুখের দিকে হাসি দেখল না, সাবানের ছোট লাল বাক্স জোরে চেপে ধরে মৃদু ভর্ৎসনার মতন বলল, "এ সব কথা বলবেন না।"

মোহনলাল হেসে উঠল, "আরে না না, মিছিমিছি বলছিলাম—" হাসিকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে অবজ্ঞার একটা কঠিন ভঙ্গি করে সে বলল, "আমি কি সার্কাসের লোক যে মেয়েমানুষ নিয়ে রাতের বেলা ভেগে পড়ব!" একটু থামল মোহনলাল, হাসির ভিজে শাড়ি টানল এবং কিছু অধীরতা প্রকাশ করে আরও বলল, "তোমার মত থাকলে রাধানাথবাবুকে বলব, যমুনাকে বলব—এখানেই বিয়ে হবে, হইচই হবে। ব্যস, তারপর সোজা চলে যাব কোন্নগরে। পাকা বাড়ি, পাকা ঘর—তুমি বউ আমি বর—" মোহনলালের গলায় সুর খেলছিল, সে কথা বলল গানের মতন।

"যাঃ, অসভ্য", হাসি সাবানের বাক্সর লাল রং দেখল কিছু সময়, তার ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে নিচু গলায় বলল, "বাবা মত দেবে না—"

মোহনলালের গলা থেকে চমকের মতন একটা ছোট শব্দ উঠল, "কেন?"

"রাজি হবে না, দেখবেন—" স্নানের পরেই হাসির খাওয়ার অভ্যাস, এখন তার খুব খিদে পাচ্ছিল। ভিজে শাড়ি গায়ে সপসপ করছে, তা ছেড়ে ফেলার জন্যে সে অস্থির হচ্ছিল। চলে যাচ্ছিল হাসি।

"যাও কেন?" হাসির ম্লান মুখ, তার করুণ কথা বিমূঢ় করে দিয়েছিল মোহনলালকে। এখনো কলের জল পড়ে যাচ্ছে, মোহনলালের ধুতিতে কাদার ছোট ছোট দাগ, তার এক পাটি চটিও জলের ঝাপটায় কিছু ভিজেছে।

সে বলল, "কিছু আগে বললে না যে রাধানাথবাবু আমার গুণের কথা বলে?"

"বলে তো।"

"তবে তার মত হবে না কেন?"

রাধানাথবাবু কেন খুশী হবে না, হাসির বিয়ে সমর্থন করবে না তার কারণ হাসি এখন মোহনলালকে বলতে পারল না। তার ভিজে পায়ে কিছু শুকনো ঘাস লেগেছিল, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষে ঘষে তা পরিষ্কার করে সে বলল, "পাকা বাড়িতে থাকা আমার কপালে নেই, তাঁবু ছেড়ে যাওয়া-টাওয়া আমার চলবে না, মোহনবাবু—বুঝলেন!"

"চিরকাল তোমার সার্কাসে থাকার ইচ্ছে?" মোহনলাল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে

হাসিকে খোঁচা মেরে কথা বলল, "এখানে খুব মজা, না? এক রাতে কেউ যখন জোর করে তাঁবুতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফূর্তি করবে—তখন?"

হাসি মোহনলালের কথা শুনে থামল। তার—বুকের ওপর থেকে গামছা পড়ে গিয়েছিল, পা দিয়ে তা তুলে নিয়ে চেপে চেপে সে বলল, "আপনার খালি ঐ এক কথা, মন্দ দিকটাই দেখেন মানুষের! কিন্তু আমার বাপ আছে না, তার কথা ভাবেন কিছু? ফূর্তি করার ইচ্ছা তো আপনারই দেখি বেশী—"

"রাধানাথবাবুর কথা আমি কী ভাবব, ছাই!"

হাসি ইতস্তত না করে মোহনলালের কথার ওপর বলল, "বাবাকে ফেলতে পারি না। আমি আপনার সাথে পাকা বাড়িতে চলে গেলে মানুষটা যাবে কোথায়—" একটা শর্ত ছুঁড়ে দেওয়ার মতন হাসি বলে ফেলল, "আমি যেখানে থাকব, আমার বাপও সেখানে থাকবে!"

কথা বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল হাসি। যদিও সে জানত এখন চুপ থাকবে মোহনলাল, বিয়ের কথা হঠাৎ আর তুলতে পারবে না। তা হলেও পা চলছিল না হাসির—মোহনলালের কথা শোনবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

রোদ এখন আরও প্রখর। সূর্য ঠিক মোহনলালের মাথার ওপরে ছিল। চোখ কট কট করছিল তার। চারপাশ আঁধার-আঁধার। হাসির শর্তের মতন কথা তাকে বোবার মতন করে রাখল।

কিছু আগে স্নানরতা হাসিকে দেখতে দেখতে যে বাসনা মোহনলালের মনের মধ্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল এবং এই রুক্ষ কঠোর স্থান থেকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভিন্ন আর এক জগতে তা হঠাৎ ভাবনা-চিন্তার ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ল। এবং অনেক সময় কথা এল না গীটার বাদক মোহনলালের মুখে।

যদিও হাসির শর্ত খুব কঠিন মনে হল না মোহনলালের—মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢেলে স্নান করার মতনই তা সহজ। কোন্নগরের পাকা বাড়িতে হাসির সঙ্গে রাধানাথবাবুকেও টেনে তোলবার একটা অস্ফুট ইচ্ছা মোহনলালের মনে জোনাকির মতন সবুজ আলোর ফুলকি কাটতে থাকল।

কিন্তু পাকা বাড়ির সামান্য অংশও মোহনলালের নামে এখন আর নেই। গোটা বাড়িটাই তার দাদার। মার কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই দাদা-বউদির সংসারে পড়ে আছে। এখনো আশা আছে তার, মোহনলাল শেষ বয়েসে তাকে দেখবে—তার বউ এসে যত্ন করবে।

কিন্তু মার কাছে ফিরে যাবার কথা এখনো মোহনলালের মনে আসে না। টাকা-পয়সা তার কিছু হয়নি এখনো। নামও হয়নি। মাসে তিরিশ টাকা হিসেবে রোজ তার পাওনা এক টাকা করে—বিড়ি-সিগ্রেট, চা সিঙাড়া খেতেই তার খরচ হয়ে যায়।

ইস্কুলে বেশীদিন থাকতে পারেনি মোহনলাল, লেখাপড়ায় তার মনও ছিল না। সিনেমা-থিয়েটার অভিনয় করবার ঝোঁক ছিল প্রথম প্রথম, গানবাজনার শখ ছিল। মার জন্যেই কোন্নগরের বাড়ি ছেড়ে সে চলে যেতে পারেনি, মা না থাকলে কবে সেখান থেকে পালিয়ে যেত।

পরে কিছুই হল না। বড় অভাব, হাতে একটাও পয়সা থাকে না মোহনলালের। দাদা চুপচাপ থাকলেও বউদি কড়া কথা শোনায়— একটা জোয়ান মানুষ দাদার সংসারে বসে বসে কেমন করে দিনের পর দিন খেয়ে যায়—আশ্চর্য!

"তোকে কেউ কথা শোনালে আমার বুক জ্বলে রে মোহন—বুঝিস না?"

একদিন খুব করুণ করে মোহনলালের মা বলেছিল, "একটা কাজ-টাজ খুঁজে নে না বাবা, আমার কথা শোন—"

"কাজ কোথায় পাব", মার শুকনো মুখ দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে একটা জ্বালা অনুভব করেছিল মোহনলাল, "কিছু টাকা পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম!"

"কী করবি? কত টাকা? বল না?"

আগে, কোন্নগরেই এক শিক্ষকের বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কিছুদিন গীটার বাজাতে শিখেছিল মোহনলাল। খুব ভাল তার হাত। মাস্টার বলেছিল, সে নাম করবে—একটা গীটার কিনে তাকে আরও বেশী সময় বাজাবার কথাও বলেছিল।

মোহনলাল গীটার কিনতে পারেনি, তার টাকা ছিল না। যে দুগাছা চুড়ি মা তার বউ-এর জন্যে যত্ন করে তুলে রেখেছিল, মোহনলালের ইচ্ছার কথা শুনে তা বের করে দিয়েছিল তাকে, "এই নে মোহন, এগুলো বেচে দে। বাজনা একটা কিনে নে— বায়স্কোপ-থিয়েটার যা হয় কিছু করে দুটো পয়সা উপায় কর—"

"মা, আমি কাল কলকাতায় যাব, সেখানে মেসে-টেসে থাকব কিছুদিন। তারপর ফিলিমে বাজাব—" সেদিন তার মাকে আন্তরিক আশ্বাস দিতে পেরেছিল মোহনলাল, "ফিলিমওলাদের কত টাকা! তাদের নজরে পড়লে, বুঝলে মা, ভাবনা থাকবে না কোন। মাসে মাসে এত্ত টাকা পাঠাব তোমাকে—"

দাদা-বউদিকে নিজে কিছু বলেনি মোহনলাল, তার মা বলেছিল, "মোহন বায়স্কোপ করতে কলকাতায় গেছে। মাস্টার বলেছে, খুব নাম-ডাক হবে তার—টাকা-পয়সা হবে।"

চুড়ি বিক্রি করে অল্প যা টাকা পেয়েছিল মোহনলাল, কলকাতার মেসের খরচ দিতে দিতে খুব কম সময়ের মধ্যেই তা শেষ হয়ে গেল। গীটার কেনবার কথা সে তখন আর ভাবল না, কেমন করে নিজের খরচ চালাবে সারাদিন সে কথা ভেবে ভেবেই অস্থির হল।

ব্যাণ্ডের দলের হীরু তাকে নিয়ে এসেছে জুয়েল সার্কাসে—বাঁচিয়ে দিয়েছে। হীরুর এক আত্মীয় থাকত মোহনলালের মেসে, সে-ই যোগাযোগ করে দিয়েছিল। এখন যে ইলেক্ট্রিক গীটারে মোহনলালের আঙুল চলে তা নিজের নয়, জুয়েল সার্কাসের।

হীরুর সঙ্গে সার্কাসে ঢুকলেও প্রথম দিন থেকেই স্থির করে রেখেছিল মোহনলাল, এখানে বেশীদিন সে থাকবে না—তাব মাকে সে যেমন আশ্বাস দিয়ে এসেছে তা-ই করবে। সিনেমায় বাজিয়ে টাকা-পয়সা আর নাম হলে চিঠি লিখবে মাকে, তাকে টাকাও পাঠাবে। এবং তার আগে তাকে কোন খবর দেবে না সে।

বেশ কিছুদিন কাটল। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—তাঁবুতে বসে বসে সব ঋতুর স্বাদ গ্রহণ করল মোহনলাল। তার স্থায়ী কোন ঠিকানা নেই। তার জগৎ এখন একেবারেই আলাদা। বাইরের মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকল না।

অস্থির মোহনলাল, বড় বিষণ্ণ। যে স্বপ্ন তখনো বুকের মধ্যে সে বহন করছিল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে একদল মানুষ

ও জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে যন্ত্রের মতন ঘুরতে ঘুরতে তা মরে আসছিল এবং মোহনলালেরও মনে হচ্ছিল তার বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে।

সার্কাসের তাঁবুতে যখন এমন মৃতপ্রায় মোহনলাল, এক-একটি দিন ধূসর ক্লান্ত ও নির্জীব সেই সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল রাধানাথবাবু, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ফাইন বাজাও হে। বড় মিঠে হাত তোমার। শুনতে শুনতে নাচতে ইচ্ছে করে মাইরি—"

মণিবাবু শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম করছিল, রাধানাথবাবুর কথা শুনে অন্য পাশ ফিরে হাসল। হীরু ছিল না। শ্যামল বসে-বসে বিড়ি টানছিল, তা ফেলল না। মোহনলাল খালি গায়ে ছিল, রাধানাথবাবুকে দেখে একটা শার্ট টানতে-টানতে বলল, "বসুন।"

রাধানাথবাবু বসল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলল। নতুন ক্যাম্প পড়েছিল তখন দক্ষিণেশ্বরে। গ্রীষ্মের কড়া দুপুর। থেকে থেকে গলা শুকিয়ে আসছিল মোহনলালের। রাধানাথবাবুর প্রথম কয়েকটা কথা জলের ঠাণ্ডা ফোঁটার মতন টপটপ করে পড়ল মোহনলালের শুকনো গলায় এবং অদ্ভুত অনুভূতি তার দুর্বল ও নিস্তেজ শিরা-স্নায়ু সতেজ করে তুলল।

"না হে, বসব না", মোহনলালের কাঁধে দু-হাত রেখে রাধানাথবাবু তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, "মরতে সার্কাসে এলে কেন হে? এটা জায়গা নাকি তোমার?"

মণিবাবু হালকা গলায় বলে উঠল, "ভাল জায়গা-টায়গা জানা আছে আপনার? দিন না সেখানে পাঠিয়ে—"

"দেব বৈকি, আলবাত দেব! এখানে বসে-বসে ফিনিশ হয়ে যাবে একটা গুণী লোক, আর আমি বসে-বসে তা দেখব?" মোহনলালের কাঁধ জোরে-জোরে ঝাঁকাতে থাকল রাধানাথবাবু, "শোন হে ছোকরা, এখান থেকে যদি না যাও তাহলে আমি তোমায় গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব, মনে রেখ হে!"

মোহনলাল হাসছিল। রাধানাথবাবুর মুখে মদের উৎকট গন্ধ। মাথার চুল সাদা। খুব ফর্সা গায়ের রং। রোগা, লম্বা শরীর। মোহনলালের সঙ্গে কথা বলবার সময় থেকে থেকে জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছিল রাধানাথবাবু।

"চল হে আমার তাঁবুতে। নাও না গীটারটা তুলে, একটু বাজনা-টাজনা শুনি। মেয়েরাও শুনবে 'খন। বড় ভাল মেয়ে সব। কুস্তির প্যাঁচ শিখতে-শিখতেই শেষ হয়ে গেল। গানবাজনা আর শিখবে কখন—" নিজের কপালে জোরে হাতের আঘাত করে রাধানাথবাবু বলল, "কপাল! বুঝলে হে, এখানে যা লেখা থাকে তা খণ্ডন করার সাধ্য কার!"

প্রথমদিনই রাধানাথবাবু মোহনলালকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার তাঁবুতে। যমুনা তাকায়নি, অপ্রসন্ন মুখে আস্তে কিছু বলেছিল রাধানাথবাবুকে—হাসি মোহনলালের কাছে এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল।

মোহনলাল হঠাৎ বিব্রত হয়ে হাসিকে তুলে ধরেছিল, "থাক, থাক!"

"আহা, থাকবে কেন", রাধানাথবাবু চীৎকার করে উঠেছিল, "গুণী লোককে একটু ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে না? কে আছে হে তোমার মতন এখানে? সকলেই তো সার্জেন্ট ক্লাশ—"

সেদিন গীটার নিয়ে যায়নি রাধানাথবাবুর তাঁবুতে মোহনলাল, পরে হাসির খেলার সময় গলা উঁচু করে তার দিকে দেখতে দেখতে এক-একদিন এক-একটা সুর বাজিয়েছে, বিয়ের কথা ভেবেছে, ঘর-সংসারের কথাও তার

মনে হয়েছে। এবং কোন কোন অন্ধকারে তাঁবুর পিছনে দাঁড়িয়ে হাসির ফুটন্ত দেহের এক-এক অংশ স্পর্শ করতে করতে তার সব দৈন্য অসুবিধা ও জটিলতার কথাও এতদিন মোহনলাল ভুলেছিল। তার শুধু মনে হয়েছিল কোন্নগরের পাকা বাড়িতে মা এখনো আছে, সেখানে যে-কোন সময় হাসিকে নিয়ে ওঠা যায়।

শীতের পর দুপুরের প্রথম রোদ স্নান করিয়ে দিচ্ছিল মোহনলালকে এবং হাসির পাশে দাঁড়িয়ে তার মনের সব রং ধুয়ে যাচ্ছিল—সুখের মৃদু কল্পনা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আশ্রয়হীন এক অনাথ বালকের মতন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল মোহনলাল, পিঁপড়ের কামড়ে পা জ্বললেও তার চুলকোবার কিংবা পা ঘষবার আর উৎসাহ ছিল না।

মোহনলালের মনে হল হাসিকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেলেও তার ওঠবার কোন জায়গাই নেই। তাছাড়া একা যাবে না হাসি, রাধানাথবাবুও যাবে। তার সঙ্গে থাকতে কোনই আপত্তি হওয়ার কথা নয় মোহনলালের, কিন্তু থাকবে কোথায়! কোন্নগরের পাকা বাড়ির কথা, কলকাতায় ছোট মেসের কথা এবং সব শেষে সার্কাসের স্বল্প পরিসর তাঁবুর কথা ভাবতে ভাবতে খালি-খালি চোখে মোহনলাল জলের শব্দ শুনছিল। মাটি ভিজছে—হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় তার নাকে এক-একবার ভিজে মাটির গন্ধও লাগছিল।

আরও পরে চাপা স্বরে কথা বলার মতন মোহনলাল বলল, "রাধানাথবাবু যমুনার সাথে থাকবে, তার ভাবনা তুমি কেন কর?"

"কার সাথে, দিদির সাথে?" অল্প হাসল হাসি, "দিদির সাথে শিবুদার বিয়ে হবে—তখন?"

"থাকবে তাদের সাথে। শিবুবাবু সার্কাস ছেড়ে যাবে না তো—"

"দিদিও যাবে না।"

"ভালই হবে। থাকার ভাবনা কী তবে রাধানাথবাবুর—"

"দূরে দূর—" মোহনলালের কথা শেষ হওয়ার আগেই হেসে উঠল হাসি, "বাবা এক তাঁবুতে ওদের সাথে থাকবে নাকি?"

ভিজে শাড়ির প্রান্ত ঠোঁটে বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, "তারা রাজী হবে কেন, লজ্জা-শরম আছে না?"

"তোমার লজ্জা-শরম নেই?"

"বা রে", হাসি প্রতিবাদ করার মতন বলল, "আপনি সার্কাস ছেড়ে চলে যাবেন তো, বায়স্কোপে বাজনা বাজাবেন—আমাকে পাকা বাড়িতে নিয়ে তুলবেন বললেন যে—"

"যদি সার্কাসেই বাজাই?"

"তবে বিয়ের ব্যাপারে মত হবে না বাবার", হাসির ঠাণ্ডা নিশ্বাসের শব্দ উঠল, "তার মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই-এর দরকার না? মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা আর একটা তাঁবু কে তাকে দেবে!"

মোহনলাল এত পরে বুঝল কেন অল্প আগে হাসি তাকে বলেছিল যে তার বিয়েতে মত দেবে না রাধানাথবাবু। মত দিলেও এই মুহূর্তে মোহনলালের করবার কিছু ছিল না। তাহলেও হাসির দেহ, তার সিক্ত শাড়ির প্রান্ত এখনো বিভ্রান্ত করে তুলছিল মোহনলালকে এবং সে একটা নির্জন আশ্রয়ের কথা ভাবছিল।

হাসি বলল, "দিদি বাবার কথা একটুও ভাবে না, জানেন? বাবার ওপর তার কোন টান নেই।"

মোহনলাল অন্যমনস্কের মতন বলল, "হুঁ।"

"বাবা যা-ই করুক, হাজার হোক, বাপ তো বটে! নিজে সুখে করব আর যে মানুষটা জন্ম দিল সে রাস্তায় পড়ে ধুঁকবে—তা হয় না মোহনবাবু।"

"তা বটে।"

বুকে গামছা চেপে ধরে হাসি হাঁটছিল। তার সঙ্গে গেল না মোহনলাল, দাঁড়িয়ে থাকল। পকেট থেকে সস্তা সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে মোহনলাল দেখল, খালি। সে তা ছুঁড়ে মারল হাসিকে লক্ষ করে। তার গায়ে লাগল না, পায়ের কাছে পড়ল।

হাসি মোহনলালের দিকে ফিরে হাসল, "স্নান হয়েছে?"

"না।"

"করবেন না?"

"এখন না।"

"আসুন না, তাঁবুতে। খিদে লাগেনি?"

যেখানে দাঁড়িয়েছিল মোহনলাল, সেখানেই থাকল। আর কিছু সময় যাক। ভিজে কাপড় ছাড়ুক হাসি, চুল আঁচড়ে নিক। পরে যাবে মোহনলাল। এ সময় গেলে যমুনা আর রাধানাথবাবু তাকেও খাওয়ার কথা বলবে। এখন তাদের তাঁবুতে যাবে কিনা, মোহনলাল তা-ও ভাবল।

এখানে সে স্নান করবে না। তার বাক্স-বিছানা কাপড় বাজনা—সব নিয়ে টালিগঞ্জে গেছে হীরু শ্যামল আর মণিবাবু। মোহনলাল সেখানে পেঁৗছে স্নান করবে সন্ধ্যার আগে-আগে। নতুন এক প্যাকেট সিগ্রেট কেনবার জন্যে সে ভাঙা গেটের দিকে যাচ্ছিল। কাছাকাছি অনেক সিগ্রেটের দোকান।

"ও মোহনবাবু, শিগগির আসুন! দিদি খুন করে ফেলল যে বাবাকে—"

হঠাৎ হাসির ভয়ার্ত চীৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মোহনলাল।

গলা চেপে ধরে ঠেলতে-ঠেলতে রাধানাথবাবুকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এসেছে যমুনা, জোরে-জোরে বলছে, "বেরিয়ে যাও! তোমার সাথে থাকি তো আমি এক বাপের বেটি না—চোর কোথাকার!"

"মাইরি বলছি", যমুনার শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে কাতর স্বরে বলছে রাধানাথবাবু, "আমি না, আমি চুরি করিনি! উঃ, লাগে, মরে গেলাম যে!"

"না, তুমি চুরি করনি! আমি চিনি না তোমাকে! আমার সুমুখ থেকে দূর হয়ে না গেলে আজ খুন করে ফেলব আমি তোমাকে—" যমুনা রাধানাথবাবুর গলায় আরও জোরে চাপ দিতে দিতে ভাঙা কর্কশ স্বরে বলতে থাকল। শাড়ি খুলে এসেছে তার। চোখ দপদপ করছে। হাঁপাচ্ছিল যমুনা।

মোহনলাল ছুটে এল।

॥ চোদ্দ ॥

"আরে, ছাড় ছাড়, কী কর—" রাধানাথবাবুর গলা থেকে যমুনার শক্ত হাত আলগা করে নিতে খুব পরিশ্রম হচ্ছিল মোহনলালের। অপ্রকৃতিস্থর মতন হয়ে উঠেছে যমুনা।

"হল কী রাধানাথবাবু?"

"আমি চোর, চুরি করেছি—" যমুনার শক্ত হাতের চাপে কাহিল হয়ে পড়েছিল রাধানাথবাবু, এখন গলায় হাত বুলোতে-বুলোতে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "পুলিস ডাক, আমাকে ধরিয়ে দাও।"

যমুনা বিকৃত মুখ করল, "দূর হও।"

"আরে ছি-ছি যমুনা, এমন মাথা গরম করা ঠিক না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও", কাছাকাছি আর কোন মানুষ আছে কি-না, এদিও-ওদিক তাকিয়ে দেখল মোহনলাল, "গোছগাছ সব শেষ তো?"

কথা বলল না যমুনা, তাঁবুর মধ্যে মাটিতে বসে দু হাতে মুখ ঢাকল। অল্প অল্প করে পিছিয়ে যাচ্ছিল রাধানাথবাবু, এক সময় গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সকলকে শুনিয়ে জোরে বলে উঠল, "মুখে লাথি। মরুক এবার! এই আমি চললাম—"

"কোথায় যান? শুনুন শুনুন, ও রাধানাথবাবু—" মোহনলাল তার হাত ধরতে যাচ্ছিল, রাধানাথবাবু থামল না, ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আরও জোরে হাঁটিতে থাকল।

"ও মোহনবাবু, বাবাকে আটকান—" কান্না-কান্না গলায় বলল হাসি, "চলে যাচ্ছে যে।"

"থাম তুই!" এখনো যমুনার গলায় ঝাঁজ ছিল, "মদ খাবার পয়সার দরকার নেই? যাবে কোথায়?"

তাঁবুর মধ্যে একটা বোলতা ঘুরছিল, তা দেখেও যমুনাকে কিছু বলল না হাসি। একটা অসন্তোষ তারও মনে বোলতার মতন হুল ফুটিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখল, কিছু দূরে রাধানাথবাবুর হাত ধরে তাকে থামিয়েছে মোহনলাল—তাঁবুতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।

একটা শুকনো কাপড় টেনে নিয়ে ভিজে শাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে হাসি বলল, "দিদি, তুই বাবাকে মারলি!"

"খুন করে ফেলিনি, তার ভাগ্য।"

"বাবার গায়ে হাত তুললি, মোহনবাবু দেখল যে।"

"দেখুক", মুখ থেকে হাত সরিয়ে যমুনা বলে যাচ্ছিল, "খালি নিজের সুবিধা দেখবে, নিজের ভাল বুঝবে। বাপ না ছাই, বোঝা একটা—বুঝলি? চিরটাকাল গলায় ঝুলবে—"

বড় কর্কশ স্বর যমুনার, হাসির শুনতে ভাল লাগল না। যা-ই করুক রাধানাথবাবু, তাকে যমুনা যেমন স্বার্থপর ভাবে—হাসি তেমন ভাবতে পারে না। ভিজে শাড়ি পায়ে চাপতে চাপতে সে বলল, "চিরকাল তোর সাথে বাবা থাকবে না, আমার সাথে থাকবে—"

"বাপের সাথে যদি অত পীরিত তোর, তবে যা-না, মাথায় নিয়ে নাচ—" হাসির সাবানের বাক্স পা দিয়ে অনেকটা দূরে ঠেলে দিয়ে যমুনা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ফের যদি আমার পয়সা চুরি করে, দেখিস, আমি কী করি ওর!"

"আগে নেয়নি তোর পয়সা?" নিচু হয়ে ভিজে শাড়ি তুলে নিয়ে রোদে এসে তা চাপতে-চাপতে হাসি তর্ক করার মতন যমুনাকে বলল, "বাবার গায়ে হাত তুলেছিস কখনো?"

বড় রাস্তায় ট্রাম-বাস যাচ্ছিল। হর্ন বাজছিল ঘন ঘন। যমুনা কী বলল, হাসি শুনল না। ভাত তরকারি ঢাকা দেয়া আছে। রান্না শেষ করে উনুন ঝেড়ে ফেলেছে যমুনা। একটু আগে খুব খিদে পেলেও এখন কিছু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না হাসির। অনেক সময় ভিজে কাপড়ে ছিল বলে তার শরীর খারাপ লাগছিল। শোবার জায়গা নেই তাঁবুতে। ক্যাম্পখাট গুটোনো। বিছানা-বালিশ বাঁধা। হাসি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল।

রাধানাথবাবুর ওপর খুব অপ্রসন্ন হয়ে থাকলেও মেজাজ কখনো এমন তেতো-তেতো হয়ে ওঠেনি যমুনার। হাসি ঠিকই বলেছে, আজ প্রথম নয়—রাধানাথবাবু যমুনার লুকোন টাকা-পয়সা অনেকবার চুরি করেছে। সব জেনেও চুপচাপ ছিল যমুনা। আজ তার ধৈর্য থাকল না। রাধানাথবাবুর গলা চেপে ধরবার আগে সিগ্রেটের একটা খালি টিন যমুনা তার কপাল লক্ষ করে ছুঁড়ে মেরেছিল।

একদিকে বসে ঝিমোচ্ছিল রাধানাথবাবু, থেকে থেকে হাই তুলছিল। টিনের ঘায়ে চমকে উঠে কিছু বলবার আগেই ঠোঁটে ঠোঁট চাপল যমুনা। তার সামনে এসে বলল, "চোর!"

সিগ্রেটের খালি টিন থালা-বাসনের কাছে গড়িয়ে গিয়েছিল, তা পা দিয়ে আরও দূরে ঠেলে দিল যমুনা। খেলনার মতন একটা শব্দ উঠল। রাধানাথ-বাবুকে আঘাত করার ইচ্ছায় কোমরে শাড়ি জড়াতে জড়াতে প্রথম থেকেই যমুনা প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিল।

খালি একটা সিগ্রেটের টিনে কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে কাপড়ের তলায় যমুনা রেখে দিয়েছিল। আজ সময় ছিল। দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যায় সার্কাস নেই। সে ভেবেছিল টালিগঞ্জে পৌঁছে একটু গোছ-গাছ করে তাড়াতাড়ি অল্প রান্না করে নেবে, তারপর লুকিয়ে বেরিয়ে পড়বে হাসি আর মোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে—পছন্দ মতন দরকারী দু-একটা জিনিস কিনে কাছাকাছি কোথাও সিনেমা দেখবে। যা পরিশ্রম আর কাজের চাপ, অন্য সময় বাইরে বার হওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

কিন্তু নতুন ক্যাম্পে যাবার আগে ট্রাঙ্ক গোছাতে গিয়ে যমুনা দেখল, টিন খালি। খোলা ঢাকনা আর একদিকে পড়ে আছে। সব বুঝলেও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বলে সে কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে হাত চালাল, জিনিসপত্র তছনছ করে খোঁজবার ভান করল—একটি পয়সাও নেই।

প্রথম প্রথম রাধানাথবাবুর বুঝতে কিছু সময় লাগল যে যমুনা তার সঙ্গে কথা বলছে। টিন রাধানাথবাবুর কপালে লাগেনি, মাথায় পড়েছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিল রাধানাথবাবু, মাথায় হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "মেজাজ খারাপ করিস কেন যমুনা, কী হল?"

"জান না? ন্যাকা!"

থুতু গিলতে গিলতে রাধানাথবাবু বলল, "না বললে কেমন করে জানব মাইরি?"

যমুনা সিগ্রেটের খালি টিন তুলে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল এবং রাধানাথ-বাবুর সামনে এসে খুব জোরে বলে উঠল, "কোথায় গেল পয়সা? চোর কোথাকার!"

"এই, চোপ!" চোখ গোল-গোল করে উঠে দাঁড়াল রাধানাথবাবু, ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুষি পাকাল, "যা মুখে আসে তাই বলবি? জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব হারামজাদী—" তার হাত-পা, গলার স্বর—সব কাঁপছিল।

রাধানাথবাবুর কথার মাঝেই যমুনা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ের ওপর, শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ঠেলে আনল তাঁবুর বাইরে। একটা ভয়ংকর আক্রোশ ছাড়া তার মনে তখন আর কোন্ অনুভূতি ছিল না। ঠিক সময় এসে পড়েছিল মোহনলাল, দেরি হলে কী ঘটে যেত এখন যমুনা ভাবতে পারে না।

মাটিতে বসে দু হাঁটু দিয়ে সে নিজের মাথায় আঘাত করছিল। উত্তেজনা থিতিয়ে এলেও যমুনা জানত উঠে দাঁড়াতে তার আরও কিছু সময় লাগবে। প্র্যাকটিসের পর প্রথম প্রথম যেমন ক্লান্ত লাগত—এখন তার তেমন মনে হচ্ছিল।

আজ হঠাৎ নয়, যমুনার মেজাজ কয়েকদিন থেকেই খারাপ হয়ে আসছিল। রাধানাথবাবুর সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরের মতন ব্যবহার না করতে পারলে হয়তো সে আরও সাংঘাতিক কিছু করে ফেলত—ব্যালেন্সের খেলার সময় হাসিকে ফেলে দিয়ে রাগের ঝোঁকে নিজেও পড়ে গিয়ে ইচ্ছে করে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারত। সার্কাসের মানুষগুলোকে জব্দ করার একটা ইচ্ছা থেকে-থেকে তাকে বিষ ফোঁড়ার মতন যন্ত্রণা দিচ্ছিল। রাধানাথবাবুর গলা চেপে ধরবার সময় আক্রোশে অন্ধ একটা দিশাহারা মেয়ের মতন শিবনাথের কথাও মনে হয়েছিল যমুনার।

টালিগঞ্জে যাবার আগে, যমুনা ভেবেছিল শিবনাথ একবার এদিকে আসবে। সে আসেনি, হঠাৎ এক সময় চলে গেছে। কলির ভীম! যমুনার মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে এল, গায়ে জোরই আছে শুধু, মনে একটুও সাহস নেই—ভীতু একটা মানুষ!

যমুনার সঙ্গে শিবনাথের শেষ কথা হয়েছিল দু-চারদিন আগে, রঘুনাথ দাসের তাঁবুর বাইরে সে যেদিন এসে দাঁড়িয়েছিল—সেদিন। যমুনা ডেকেছিল বলেই কিছু সময়ের জন্যে তার কাছে এসেছিল শিবনাথ।

"কী বল?" ভীত ত্রস্ত ভাব শিবনাথের। বার বার পিছন ফিরে সে রঘুনাথের তাঁবুর দিকে দেখছিল। তার ভীতির কারণ প্রথম-প্রথম বুঝতে পারেনি যমুনা।

"একটা মুশকিল হয়েছে শিববাবু, শুনেছেন?"

"না।"

রান্না করতে করতে উঠে এসেছিল যমুনা, তার হাতে হলুদ-পেঁয়াজের ঝাঁজালো গন্ধ ছিল। তাঁবুর দড়ি পা দিয়ে খেলাতে খেলাতে যমুনা বলল, "হারকু সাহেব আমাদের ট্র্যাপিজ খেলায় নিয়েছে, আপনি বলে দিয়েছিলেন?"

"না।"

"বাবার যেমন কাণ্ড, কী করেছে জানেন?"

যমুনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে শিবনাথের যে অস্বস্তি হচ্ছিল, সে তা বুঝল অনেক পরে। তার কাটা-কাটা কথা, ভয়-ভয় ভাব আগে লক্ষ করলে যমুনা এত কথা বলত না তার সঙ্গে। রাধানাথবাবু কী কাণ্ড করেছে তা জানবার খুব আগ্রহ ছিল না শিবনাথের। সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছিল।

কিছু সময় ইতস্তত করল যমুনা, একটা অসন্তোষ প্রশমিত করবার জন্যে তাঁবুর দড়িতে জোরে পা চাপল, "হারকু সাহেবকে বাবা খেতে বলেছে আজ, কী করি বলুন তো?"

"আমি কী বলব।"

যমুনা ভাবল হারকু সাহেব তাদের তাঁবুতে খেতে আসবে শুনে রাগ হয়েছে শিবনাথের। হলুদ লাগা হাত শাড়িতে ঘষতে ঘষতে সে শুকনো হেসে বলল, "আপনিও আসবেন?"

"কোথায়?"

"হারকু সাহেবের সঙ্গে বসে খান না", যমুনা পা দোলাতে দোলাতে চাপা স্বরে বলল, "খুব জব্দ হয়ে যাবে তাহলে।"

"না, আমি পারব না, কাজ আছে।"

যমুনারও ভয় ছিল, এখানে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। কেউ দেখলে কথা উঠবে। রাধানাথবাবু যে হারকু সাহেবকে নেমন্তন্ন করেছে সে কথাটা শিবনাথকে বলবার জন্যেই তাকে এখন ডেকেছিল যমুনা।

"রাগ করলেন নাকি শিববাবু?" শিবনাথের মুখে উত্তেজনার বিকৃত চিহ্ন পলকে দেখে নিয়ে যমুনা অপরাধীর মতন বলল, "আমি ডেকেছি কাউকে? বাবা তো—"

শিবনাথ বাধা দিয়ে বলে উঠল "জাহান্নামে যাক জুয়েল সার্কাস, তার মালিক, তার ম্যানেজার—সব শালা সমান।"

ভয় পেয়ে গেল যমুনা। খুব উঁচু স্বর শিবনাথের। রাধানাথবাবু বসে আছে তাঁবুতে, তার কথা শুনল কি-না কে জানে। যমুনা উঁকি মেরে রাধানাথবাবুকে দেখল এবং কিছু পরে একটু দূরে সরে গিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করল, "হল কী শিববাবু, হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন কেন?"

শিবনাথ বলল, "বাবু স্পষ্ট বলে দিল, এখানে থাকতে গেলে জেনারেল ম্যানেজারকে মেনে চলতেই হবে। আমি কারুর বাপের চাকর নই—চলে যাব এখান থেকে—"

"কোথায় যাবেন?" থমথম করছিল যমুনার মুখ, গলার স্বর ঈষৎ উষ্ণ। শিবনাথের কথা সে মেনে নিতে পারছিল না।

"কেন, সার্কাস ছাড়া আর জায়গা নেই এ দুনিয়ায়?"

"পালিয়ে যাবেন?"

"লাথি মেরে যাব, জ্বালিয়ে দিয়ে যাব—"

শিবনাথের কথা ফাঁকা-ফাঁকা, এসব শুনতে শুনতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল যমুনা। তার মনে হল, অল্পেই মাথা গরম হয়ে ওঠে শিবনাথের, শপথের কথা ভুলে যায়। যমুনা তাকে আবার সব মনে করিয়ে দিতে চাইল।

"আমাকে কী কথা দিয়েছিলেন, ভুলে গেলেন?" যমুনা উদ্ধত স্বরে শিবনাথকে শাসন করার মতন বলল, "কথা না রাখতে পারলে দেন কেন? পুরুষ মানুষ আপনি?"

শিবনাথ যমুনাকে দেখল এবং তার শাসন আত্মসাৎ করে নিয়ে নরম গলায় বলল, "তুমিও ছেড়ে দাও এ সার্কাস, চল আমরা অন্য কোথাও চলে যাই?"

"আমি পালিয়ে যাবার মানুষ নই শিববাবু", চেপে চেপে কথা বলছিল যমুনা, "কোথায় নিয়ে যাবেন? যেখানে নিয়ে যাবেন জেনারেল ম্যানেজারের হুকুম মানতে হবে না সেখানে? তারপর আবার কোথায় পালাবেন?"

যমুনার আঘাত সহ্য করতে করতে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল শিবনাথ, হঠাৎ রূঢ়স্বরে বলল, "তোমার জন্যেই কড়া কথা শুনতে হল। রাতে তোমার তাঁবুতে গিয়েছিলাম—"

"যে কথা শোনাল তাকে বলতে পারলেন না যে আমি ডেকেছিলাম আপনাকে?"

"তা বললে দুর্নাম হত না তোমার?"

"সেটা আমি বুঝতাম," শিবনাথের ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ঠকে গেছে বলে মনে মনে জ্বলে যাচ্ছিল যমুনা। কেউ কেউ তাদের দেখছে, হয়তো হারকু সাহেবের কানে খবর পৌঁছে যাবে কিন্তু এখন সেসব গ্রাহ্য না করে শিবনাথের মুখের ওপর যমুনা বলল, "আর আপনি চলে গেলে লোকে আমাকে দুয়ো দেবে না? কেন সব মিছে কথা বললেন আমাকে? কিছু করবার ক্ষমতা নেই সেকথা বললেই তো হত। আমি আশা করে বসে থাকতাম না—"

শিবনাথ যমুনার কথার উত্তর দেয়নি। কিছু সময় দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল। রাতে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় যে-দম্ভের প্রকাশ ছিল তার চোখে-মুখে, উচ্চারণে যে-দৃঢ়তা ছিল, সূর্যের আলোয় তার কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না যমুনা।

রাধানাথবাবুর নেমন্তন্ন রাখতে হারকু সাহেব এল কিছু পরে। কাগজে মোড়া একটা বড় বোতল ছিল তার হাতে। সে তা বাড়িয়ে দিল রাধানাথবাবুর দিকে। মোড়ক খোলবার আগেই যমুনা বুঝল, মদের বোতল।

যমুনা ভেবেছিল রাধানাথবাবু বোতল খুলবে না এখন, লুকিয়ে রাখবে কিম্বা হারকু সাহেবকে নিয়ে অন্য কোন তাঁবুতে চলে যাবে, ফিরে আসবে খাওয়ার আগে-আগে রাতের মতন।

একটু আগে শিবনাথের সঙ্গে যে তর্কাতর্কি হয়েছিল যমুনার, তার ঝাঁজ এখনো মনে ছিল বলে সে তাকাতে পারল না হারকু সাহেবের দিকে, কথাও বলল না। শিবনাথ এলে যেখানে বসে সেখানেই বসেছিল হারকু সাহেব। বেঁটে মানুষ, তার পা দুটো মাটিতে ঠেকল না। পা দোলাতে দোলাতে হারকু সাহেব হাসছিল।

মদের বোতল মুখের সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল রাধানাথ-বাবু, "আরে, এ যে বিলিতী দেখছি—"

"হাঁ-হাঁ, বিলাইতী। বড় ভাল জিনিস আছে। পিয়ে দেখেন—" প্যাণ্টের পকেটে হাত অনেকটা চালিয়ে রুমাল খুঁজতে-খুঁজতে হারকু সাহেব বলল, "সোডা আনিয়ে দিব, না পানির সাথে চলবে?"

"না-না, সোডার দরকার নেই—" ইতস্তত করছিল রাধানাথবাবু, ইচ্ছে থাকলেও এখানে বসে তার মদ খাবার সাহস হচ্ছিল না, "ওরে যমুনা, রান্না-বান্না সব হয়েছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"হারকু সাহেব কী বলছে শোন—" খুব ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে কথা বলছিল রাধানাথবাবু, "খাবার আগে গলাটা বোধহয় একটু ভিজিয়ে নিতে চায়—"

রাধানাথবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই হারকু সাহেব হয়তো তার অসুবিধার কথা বুঝে জোরে-জোরে হাত নেড়ে বলল, "আরে না না, আপনি যদি চালান তো—না হলে রাতের বেলা জরুর আসবেন আমার তাম্বুতে—"

"এখানেই খান", মাটিতে পিছন ফিরে হাসির সঙ্গে বসে থালায় খাবার সাজাচ্ছিল যমুনা, এখন হারকু সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াল। শরীর কাঁপছিল তার, অসুখের মতন মনে হচ্ছিল। ভীতু একটা মানুষের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চাচ্ছিল যমুনা।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই—" রাধানাথবাবু বোতল খুলতে খুলতে বলল, "আপনি রাজা লোক, নতুন নম্বরের কথা বলেছেন এদের—বুঝলেন হারকু সাহেব, এরা খুব খুশী—"

হারকু সাহেব পা দোলাতে দোলাতে বলল, "নম্বর বেশী হলে রুপেয়া ভি বেশী হবে—"

"বড় ভাল হয় তাহলে। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, পয়সার অভাবে কিছু কিনতে পারি না—"

এখন এসব কথা যমুনার ভাল লাগল না। দুটো কাচের গেলাস সে রাধানাথবাবু ও হারকু সাহেবের হাতের কাছে ট্রাঙ্কের ওপর রাখল, জল ভরা ঘটিও আনল এবং মাটি দেখতে দেখতে হারকু সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "এখন খাবেন?"

"হাঁ-হাঁ, সাথ-সাথ চলবে।"

বোতল খুলে ফেলল রাধানাথবাবু, গেলাসে সাবধানে হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে বলল, "ফাইন জিনিস মাইরি, আহা! হারকু সাহেব, শুরু করুন—"

"হাঁ-হাঁ", গেলাস হাতে তুলে নিল হারকু সাহেব, আস্তে চুমুক দিল। সে পা দোলাচ্ছিল বলে গেলাসে মদ টলমল করছিল। যমুনাকে দেখতে দেখতে ভিজে ঠোঁট জিব দিয়ে চাটল হারকু সাহেব, কিছু পরে বলল, "আরে আরে, কত খানা তৈয়ার করলে যমুনা!"

জল খাবার মতন গেলাসে ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছিল রাধানাথবাবু, হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে বলল, "জোর ক্ষিধে লাগবে হারকু সাহেব। এটা শেষ হোক, সব খাবার কম হয়ে যাবে—"

হারকু সাহেব ট্রাঙ্কের ওপর গেলাস রেখে আর কিছু জল মিশিয়ে নিল। বেশী জল গড়িয়ে এল ঘটি থেকে, ট্রাঙ্ক ভিজল। হারকু সাহেব রুমাল দিয়ে তা মুছতে যাচ্ছিল, যমুনা দেখতে পেয়ে বলে উঠল, "থাক থাক, আমি মুছে দিচ্ছি।"

উগ্র একটা গন্ধ উঠছিল হারকু সাহেবের গেলাস থেকে, যমুনার নেশার মতন মনে হচ্ছিল। তার বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণা ফেনিয়ে উঠছিল—প্রবঞ্চিত, প্রতারিতের মতন—বড় অসহ্য।

যদি বোতল শেষ না হয় তাহলে লুকিয়ে-লুকিয়ে যমুনাও মদ খাবে—বেহুঁশ হয়ে থাকবে রাধানাথবাবুর মতন। যমুনা জানে নেশার ঘোরে থাকলে অনেক সুস্থ থাকে মানুষ। এসব ভাবতে ভাবতে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সে, মাংসের একটা বড় টুকরো তার হাত ফসকে মাটিতে পড়ল।

হারকু সাহেব সিগ্রেট ধরাতে যাচ্ছিল, খাবারের থালা সাজিয়ে যমুনা ডাকল তাকে, "আসুন!"

হারকু সাহেব হাসল, "রাধানাথবাবু, খানা তৈয়ার। আরে না না, বহুৎ জাস্তি দিলে যমুনা, এত চলবে না—"

রাধানাথবাবুর ফর্সা মুখে লাল রং ধরেছিল, গলার স্বর ভারী। খাট থেকে নেমে দু-হাতে ধুতি তুলতে তুলতে থালার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আরে চালান চালান, খুব চলবে। শিবনাথ হলে এমন তিন চার থালা সাবাড় করে দিত—"

"কার নাম বললেন?" প্রথমে মুখ খুব কঠিন করে তুলল হারকু সাহেব, পরে জোরে হেসে উঠল, "বাবু অনেক রাগ হল তার উপর, ডিসমিস করতে চাইল—"

"কেন?"

রুমাল মুখে ঘষছিল হারকু সাহেব, যমুনার সামনে রাধানাথবাবুকে সব কথা বলতে ইতস্তত করছিল। মাংসের হাঁড়ি থেকে যে হালকা ধোঁয়া উঠছিল তার তাপে জল এসে যাচ্ছিল যমুনার চোখে।

একটা কুকুর এসে লেজ নাড়ছে তাঁবুর বাইরে। হাত নেড়ে তাকে তাড়াবার একটা ভঙ্গি করল যমুনা এবং হারকু সাহেব কিছু বলবার আগে যেন তার পক্ষ নিয়েই মাতালের মতন রাধানাথবাবুর কথার উত্তরে বলল, "বাজে লোক শিববাবু, বদমাশ লোক—"

"ঠিক ঠিক, বহুৎ বদমাশ—" যমুনার কথা শুনে খুশীতে হঠাৎ ঝকমক করে উঠল হারকু সাহেব, কিছু পরে নরম গলায় বলল, "তোমার সাথে সে বদমাশি করবার মতলব করল?"

হারের যন্ত্রণা যমুনাকে অধীর এবং উত্তেজিত করে তুলল। এক সুযোগ হারিয়ে সে আর এক সুযোগ গ্রহণ করার ইচ্ছায় মুখ নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"ব্যস ব্যস, শালাকে আমি ফিনিশ করে দিব—" গরম ভাতে হাত পড়েছিল হারকু সাহেবের, ছেঁকা খাওয়ার মতন সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে যমুনার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দরকার হলে বাবুর সামনে তুমি সব বলবে যমুনা, তোমার কোন ডর নাই—"

"হ্যাঁ, বলব।"

একটুকরো মাংস মুখের কাছে তুলে আনল হারকু সাহেব, গন্ধ শুঁকল, "কী মতলব সে তোমাকে দিল?"

"এখন না, আমি পরে আপনাকে সব বলব হারকু সাহেব", অদ্ভুত একটা অবস্থা হয়েছিল যমুনার, পাগলের মতন।

"হাঁ, জলদি-জলদি বলবে", হারকু সাহেব মাংস চিবোতে-চিবোতে এক-দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে যমুনাকে বলল, "আমার তাম্বুতে যাবে চুপচাপ—"

"যাব।"

খাওয়া শেষ করে যখন চলে গেল হারকু সাহেব এবং আরও পরে দুপুরের খেলার বাজনা বাজল তখন শাড়ি ছেড়ে জাঙিয়া পরতে পরতে হাত-পা মন—সব অসাড় হয়ে যাচ্ছিল যমুনার। কেন শিবনাথের সব কথা সে ভাল করে শুনল না—তার নামে কেন লাগাল হারকু সাহেবের কাছে।

মদের খালি বোতল তখনো ছিল ট্রাঙ্কের ওপর। দেশলাই-এর একটা কাঠি

জেবলে তার মধ্যে ফেলেছিল হারকু সাহেব। যমুনা ঠোঁট দিয়ে বোতল চেপে উঁচু করে ধরল মুখের ওপর। ভিজে ঠাণ্ডা কাঠি ঠেকল তার মুখে—পোকার মতন।

॥ পনর ॥

খিদিরপুর থেকে টালিগঞ্জ বেশী দূরে নয়, কিন্তু এই দুই অঞ্চলের প্রভেদ অনেক। এদিকটা পরিচ্ছন্ন, নির্জন। চার পাশ ফাঁকা-ফাঁকা, কাছাকাছি অনেক বড় বড় গাছ। কিছু দূরে দু-তিনটে পুকুরও আছে। রাস্তার ধারেই পাঁচিল ঘেরা বৃহৎ একখণ্ড জমি। পাঁচিলের ওপর রঙীন কাচের ছোট ছোট টুকরো গাঁথা। কোন সার্কাস এখানে আগে আসেনি, জুয়েলই প্রথম।

পাঁচিলের গায়েই দোতলা-তেতলা বাড়ি। বারান্দা থেকে অনেক কৌতূহলী চোখ প্রথম থেকেই সার্কাসের প্রস্তুতি পর্ব দেখছিল। সার্কাসের যাযাবর মানুষরাও কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সাধারণ মানুষের সংসার নির্বাহের টুকরো-টুকরো ছবি দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

বিশৃঙ্খল অবস্থা গুছিয়ে নিতে বেশী সময় লাগল না। আর কিছু সময় কাজ এগিয়ে যেতে পারত—পুষ্পরাজ বলেছিল, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠে ট্র্যাপিজের কাঠের প্ল্যাটফর্ম পরীক্ষা করে দেখবে কিন্তু তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হারকু সাহেব দুর্ঘটনার আশঙ্কায় রাজী হল না। কেননা এখনো আলোর অনুমতি আসেনি। সম্ভবত কাল বিদ্যুৎ সরবরাহের খবর পাওয়া যাবে।

পরশু থেকে আবার খেলা শুরু হবে জুয়েল সার্কাসের। টালিগঞ্জে প্রথম সন্ধ্যার প্রথম খেলা ট্র্যাপিজ। কাঠের নতুন রং করা বোর্ড পোতা হয়েছে। তিনজন মেয়ে জরীর খাটো পোশাক পরে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাপিজের প্ল্যাটফর্মের ওপর, অন্য দিকে ক্যাচার পুষ্পরাজ পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তাকে না দেখেই ঠিক-ঠিক চেহারা এঁকেছে আর্টিস্ট। থ্যাবড়া মুখ, ছোট ছোট চোখ, হঠাৎ দেখলে বড় নিষ্ঠুর এক মানুষ বলে মনে হয়।

খেলা না থাকলে মেজাজ ভাল থাকে না হারকু সাহেবের। আলস্যের চাপে ঘুম এসে যায়। ঘুম এলেও ঘুমতে কষ্ট হয় তার, মনে হয় সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ফাঁকি দিচ্ছে তার সব লোক—কোন কাজ হচ্ছে না।

"এক গিলাস পানি", ঘুমের ঘোরে কথা বলার মতন হঠাৎ এক সময় খুব আস্তে হারকু সাহেব বলে উঠল এবং জল ভরা গেলাসের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে।

হারকু সাহেবের গলায় কড়া ঝাঁজ উঠছিল। শুকনো-শুকনো জিব, থুতুও নেই। তার চোখ বন্ধ। তাঁবুর মধ্যে কাঠের একটা চেয়ারে অনেক সময় চুপচাপ বসে-বসে তন্দ্রার মতন মনে হচ্ছিল হারকু সাহেবের। তার বন্ধ চোখের মধ্যে সার্কাসের রিং-এর মতন অনেক ছোট ছোট চক্র ঘুরছিল এবং অসংখ্য হলুদ বিন্দু চিকচিক করে উঠছিল।

হারকু সাহেবের কথা শোনবার কোন মানুষ এখন ছিল না। রাত অনেক। শেষ ট্রাম রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেছে। কোন শব্দ নেই। খুব চুপচাপ। নেশায়

আচ্ছন্ন হারকু সাহেব সময়ের খেয়াল না করে তার পিপাসার কথা অন্ধকারের ভিতর প্রকাশ করল।

"এক গিলাস পানি—" আরও পরে বিরক্ত হয়ে মাটিতে পা ঠুকল হারকু সাহেব, চোখ খুলে ছটফট করে উঠল। এবং পরেই যে-হাত সে এখনো বাড়িয়ে রেখেছিল জল ভরা একটা গেলাসের আশায় তা নামিয়ে নিয়ে নেশার ঘোরে হেসে উঠল।

পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা। হাত-পা অসাড়। ঘাড়ের ওপর চুল ভিজে-ভিজে, কপালে ঘাম—জলের হাত বুলিয়ে দেয়ার মতন। টেবিলের ওপর কালো কুঁজো, কাচের গেলাস—এসব দেখল হারকু সাহেব, উঠল না—কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

কিছু দূরে হারকু সাহেবের নিচু খাট, মশারি টাঙানো। ঝাপসা চোখে তা দেখতে দেখতে তার হঠাৎ নিজের কবরের কথা মনে হল। এবং এখনো ঘুমের আমেজে অবসন্ন হয়ে থাকলেও মশারির মধ্যে ঢোকবার সাহস হল না হারকু সাহেবের। মৃত্যুর একটা অনুভূতি আতঙ্কের মতন তাকে তার তাঁবু থেকে বের করে সার্কাসের জমির বাইরে টালিগঞ্জের বড় রাস্তার ওপর ঠেলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল।

টালিগঞ্জের বড় রাস্তার ওপর নীল নকশা কাটা ঘরের মধ্যে হারকু সাহেব এক বিখ্যাত পীরের কবর দেখেছিল। চারপাশে অনেক মোমবাতি, ধূপের মিষ্টি গন্ধ। মনুষের ভিড়। বিখ্যাত পীরের উদ্দেশে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছিল।

তাঁবুর মধ্যে বড় গরম, বড় অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল হারকু সাহেব, পরে টান মেরে মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলল এবং আরও পরে জীবন্ত এক পীরের মতন আস্তে আস্তে পা ফেলে তাঁবুর বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

অন্ধকার বাইরে কিছু পাতলা, রাস্তার আলোর রেখা ছিটকে এসেছে। এক-একটি তাঁবু সৈনিকের ছাউনির মতন। দূরে-দূরে ঝাউ গাছ, নিথর, নিস্পন্দ। হারকু সাহেব মাথা তুলে আকাশ দেখল—তাঁবুর ময়লা কাপড়ের মতন কালো, একটি তারাও নেই।

গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব। হাওয়া উঠেছে। এক-একটা বড় বড় গাছ সনসন শব্দ করছে। খুব আস্তে চলতে চলতে দীর্ঘ ঝাউ-এর দিকে চোখ ফেলে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হারকু সাহেব। তার মনে হল কালো বোরখায় মুখ ঢাকা এক মূর্তি সার্কাসের জমির বাইরে কোথাও অবসর যাপনের ইচ্ছায় পা টিপে-টিপে তার পিছন-পিছন আসছে।

হাতির গলার ছোট ছোট ঘণ্টা টিনির-টিনির করে বেজে উঠল। ঘোড়া ঘরর ঘরর করল কয়েক বার। হারকু সাহেব ভীতুর মতন চারপাশে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তার কপালের ঘাম রাতের হাওয়ায় শুকিয়ে এসেছে, ঘুমের জড়তাও নেই এখন, শুধু তৃষ্ণায় গলা জ্বলছে। নির্জন আলো-অন্ধকারে দূরে ঝাউ-এর দিকে তাকিয়ে হারকু সাহেব আপন মনে আর একবার বলে উঠল, "বিবি, এক গিলাস পানি পিলাও!"

গেটের কাছে নেপালি দারোয়ান টুলের ওপর বসে-বসে ঢুলছিল, হারকু সাহেবের গলা পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, "সেলাম!"

মুহূর্তের চমক সামলে নিল হারকু সাহেব। ঘুম থেকে প্রথম জেগে ওঠার মতন খালি-খালি চোখে কিছু সময় দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল, "দারোয়ান?"

"জী, সাহাব?"

"বাহার গিয়া কোই?"

"জী, হাঁ।"

দারোয়ান অন্ধকারে লক্ষ করল না, হারকু সাহেব হাসল এবং নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কৌন?"

"উ মাহুত গিয়া, বাচ্চু গিয়া—"

হারকু সাহেবের কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে এল। দূর থেকে হাতির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, বড় রোগা হয়ে যাচ্ছে লছমী। তাকে হয়তো ঠিক মতন খেতে দেয় না মাহুত, তার খাবারের পয়সা চুরি করে বাইরে গিয়ে ফুর্তি করে। অন্য সময় হলে দারোয়ানকে গালাগাল করত হারকু সাহেব—মাহুতকে পরে আর কখনো রাতে বাইরে যেতে না দেয়ার কথা বলে দিত।

কিন্তু আজ কিছু বলল না, ঈর্ষার একটা যন্ত্রণা সে মনে মনে অনুভব করছিল। আর কে কে বাইরে গেছে তা জানবার আগ্রহ হচ্ছিল বলে হারকু সাহেব কিছু পরে আবার মৃদু গলায় দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, "আউর কৌন গিয়া?"

"উ রাধানাথবাবু গিয়া—"

"উনকো বাত ছোড়, আউর?"

"আউর কোই নেই গিয়া সা'ব।"

"করালীবাবু?"

দারোয়ান একটু ভেবে বলল, "নেই—"

হারকু সাহেব পীরের কবরের দিকে গভীর রাতে যেতে গিয়ে ইতস্তত করল। গেটের বাইরে পেট্রলপাম্পের নীল আলো স্থির হয়ে আছে। চিকচিক করছে ট্রাম লাইন। রাস্তার পাশে টালিগঞ্জের খোলা ড্রেনের উৎকট গন্ধ তার নাকে এসে লাগছে।

হারকু সাহেবের সামনে রাস্তার ওধারে আর একটা খুব উঁচু পাঁচিল। বড় বড় গাছের নিচে রেস কোর্সের গেট। গাছগুলো মানুষের মূর্তির মতন। আশ্চর্য, ড্রেনের গন্ধ ভাল লাগছে হারকু সাহেবের। ঘাড় বেঁকিয়ে সে নোংরা জল দেখল এবং তখন তার আর একবার তৃষ্ণার কথা মনে হল। দারোয়ান তার সামনে না দাঁড়িয়ে থাকলে ঢালু জমিতে পা ঘষে-ঘষে ড্রেনের আরও কাছে চলে যেত হারকু সাহেব—ঢকঢক করে অনেকটা নোংরা জল খেয়ে নিত।

গেটের ভিতরে চলে এল হারকু সাহেব। নিজের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল বলে এখন রুক্ষ স্বরে দারোয়ানকে আদেশ করল, "আউর কিসিকো বাহার যানে মৎ দেও, ফাটক বন্ধ করকে ঠিকসে বৈঠো।"

নেপালি দারোয়ান সেলাম ঠুকে বলল "জী সা'ব।"

আরও পরে কালো আকাশ চিরে সরু এক ফালি চাঁদ উঠেছিল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে হারকু সাহেবের, চাঁদের পাশে আকাশের পরিষ্কার অংশ এই মুহূর্তে তার খারাপ লাগল। সে জানত, দারোয়ান ছাড়া এখন হয়তো আর কেউ জেগে নেই। জায়গা বদলের কঠোর পরিশ্রমে সব মানুষ পরিশ্রান্ত —অঘোরে ঘুমচ্ছে। এখনো হারকু সাহেব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল।

অন্ধকার চোখে সয়ে গেলেও নিজের তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল না হারকু সাহেব। যেসব মানুষ আরামে ঘুমিয়ে আছে সে তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চোরের মতন লুকিয়ে-লুকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এবং হঠাৎ এক সময় মানুষের গলা পেয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

যেমন ভেবেছিল হারকু সাহেব, তেমন না। সার্কাসের সব মানুষ ঘুমিয়ে নেই। কেউ-কেউ এখনো জেগে আছে। হারকু সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে জুয়েল সার্কাসের দুই ক্যাশিয়ার, বাহাদুর আর সহদেবের আলাপ শুনতে থাকল।

"কী বলিস রে বাহাদুর, রাজী?"

"ভাগ, শালা! মারব তোকে।"

"মারবি কেন? কাঞ্চীর সাথে পীরিত আছে তোর? বলালি না সেদিন, ও তোর কাকা না মেসোর মেয়ে—"

হারকু সাহেব বাহাদুরের হাই তোলবার শব্দ শুনল। খস খস করে গা চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত হয়ে বলল বাহাদুর, "খবরদার সহদেব, কাঞ্চীর দিকে নজর দিবি তো ভোজালী দিয়ে গলা কাটব তোর—বুঝলি?"

"কাট না শালা, কাট!" হো-হো করে হেসে উঠল সহদেব, "কাঞ্চী গলায় চাকু মেরে দিয়েছে মাইরি! এ বাহাদুর, আমার বাপের দিব্যি, একরাতে ফুসলে নিয়ে আয় না কাঞ্চীকে—"

"এই, চুপ!"

"তুই বহুৎ হারামি! আচ্ছা ঠিক হ্যায়, আমি টুনি মাসির সাথে সব ব্যবস্থা করে ফেলব।"

"আরে সহদেব, বাত শুন" চড়া গলায় কথা বলল বাহাদুর, "কাঞ্চীর কথা তুই ফের তুলবি তো হারকু সাহেবের কাছে আমি ঠিক লাগাব তোর নামে—"

"যা-না লাগিয়ে দে! কাঞ্চীকে তবে জবাই করে দেবে হারকু সাহেব। আওরাত দেখলে শালা পাগলার মতন হয়ে যায়। আরে, আওরাতের পীর আছে রে হারকু সাহেব!"

পীরের যে নম্র মেজাজ হারকু সাহেবকে অন্ধকার তাঁবু থেকে বাইরে টেনে এনেছিল, তার সম্পর্কে সহদেবের উক্তি শুনে এখন তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে ছোট একটা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছিল হারকু সাহেব। হুড়মুড়ে করে সহদেবের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে তাকে তার লাথি মারবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সে-ইচ্ছা খুব চেষ্টা করে দমন করল হারকু সাহেব। তার ভয় হচ্ছিল কেউ তাকে দেখে ফেলবে। তাঁবুর দড়ি টপকে সাবধানে সে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল, গাড়ির তীক্ষ্ণ হর্ন বাজল। বাঁক নেয়ার সময় গাড়ির হেড লাইটের আলো ঝলসে উঠল হারকু সাহেবের মুখের ওপর। হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকল এবং মনে মনে বলে উঠল, গাড়ি হাঁকাচ্ছে বুদ্ধু! কী দরকার এখন এত জোরে হর্ন বাজাবার! রাস্তায় কোন মানুষ আছে?

এই তাঁবু বোধহয় করালীকান্তর। জোরে জোরে নাক ডাকাচ্ছে বামন ক্লাউন গোপাল। হারকু সাহেব উঁকি মেরে করালীকান্তকে খুঁজল। কিছু দেখা গেল না, বড় অন্ধকার। হারকু সাহেব তাঁবুর ভেতরে ঢুকে আস্তে ডাকল, "করালীবাবু?"

এত সময় ক্লাউন করালীকান্তর কথা মনে ছিল না হারকু সাহেবের, এখন গোপালের নাক ডাকার শব্দ শুনে মনে পড়ল। সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে হারকু

সাহেবের তাঁবুতে গিয়েছিল করালীকান্ত, কিছু সময় ইতস্তত করে ছুটির কথা জানিয়েছিল।

"কী কথা বলেন করালীবাবু?" তার কথা স্পষ্ট শুনতে পেলেও উত্তেজনার ঝোঁকে মদের গেলাস খুব শব্দ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ছিল হারকু সাহেব এবং রুক্ষ গলায় তাকে প্রশ্ন করেছিল।

করালীকান্ত হারকু সাহেবের মুখের দিকে তাকাতে পারেনি, লণ্ঠনের কালো চিমনি দেখতে দেখতে খুব আস্তে বলেছিল, "দিন দু-একের ছুটি চাই হারকু সাহেব—"

"ছুট্টি? ছুট্টি কেন লিবেন?"

"একটা চিঠি এল বাড়ি থেকে, বড় বিপদ—"

"কী হল?"

"মেয়েটা রাস্তায় খেলতে বেরিয়েছিল। পায়ে কাচ ফুটে খুব জ্বর হয়েছে—ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে হারকু সাহেব—"

"ছুট্টি লিয়ে আপনি কী করবেন?" মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে হারকু সাহেব বলেছিল, "আপনি ডাক্তার আছেন?"

"আমি বাপ!"

করালীকান্তের উদ্ধত স্বর শুনে হারকু সাহেব চিৎকার করে উঠেছিল, "ওসব বাপ-বেটির ঝুটমুট বাত আমাকে শুনাবেন না করালীবাবু। আপনার বেটির বীমার হয়েছে তো খেলা বন্ধ করে ছুটি দিব আমি আপনাকে?"

"আপনার খুশী।"

"আপনি বিলকুল বুদ্ধু আছেন করালীবাবু—"

"হারকু সাহেব, আমার বয়েস হয়েছে," স্বর কাঁপছিল করালীকান্তের, হারকু সাহেবের টেবিল হাত দিয়ে চেপে ধরে সে থেমে থেমে বলেছিল, "ছুটি না দিতে চান না দেবেন—"

টেবিলে থাবড়া মেরে বলে উঠেছিল হারকু সাহেব, "ছুট্টির বাত শুনাতে শরম হল না আপনার? চার-পাঁচটা ক্লাউন আছে আমার সার্কাসে? পরশু রোজ খেলা শুরু হবে —আজ নয়া ক্যাম্পে আপনি আমাকে ছুট্টির বাত শুনাতে এলেন—" তাকে কথা শেষ করবার সুযোগ দেয়নি করালীকান্ত, তাঁবু থেকে হঠাৎ বাইরে চলে গিয়েছিল।

এত রাতে করালীকান্তের তাঁবুতে তার ছুটি মঞ্জুর করতে আসেনি হারকু সাহেব। তাকে ছুটি দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন এসেছে তা সে নিজেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারল না। সম্ভবত জীবন্ত এক পীরের মতন প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার শ্রদ্ধা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগছিল বলে সে নিচু হয়ে হাতড়ে-হাতড়ে অন্ধকারে করালীকান্তের ঘুমন্ত দেহ স্পর্শ করবার চেষ্টা করছিল।

হারকু সাহেব আর একবার ডাকল, "করালীবাবু—"

গোপাল ঘুমের ঘোরে হারকু সাহেবের গলার স্বর চিনতে পারল না, বিড়বিড় করে উঠল, "উনি মাসির তাঁবুতে গেছে গো—"

করালীকান্তের তাঁবু থেকে খুব তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল হারকু সাহেব। গোপালের কথা শুনে তার দুর্বল কতগুলো মুহূর্ত পার হয়ে গিয়েছিল।

করালীকান্ত থাকলে কী সে তাকে বলত!

পাঁচিলের গায়ে সংসারী ভদ্র মানুষদের দোতলা-তেতলা বাড়িগুলোও এখন অন্ধকার। হারকু সাহেব সেদিকে তাকাল—দোতলার একটা ঘরে এখনো নীল আলো জ্বলছে, বারান্দায় সরু তারে যে রঙিন শাড়ি শুকোতে দেয়া হয়েছিল তা এখনো আছে। জানলা খোলা। রাস্তার আলোর রেখা গিয়ে পড়েছে জানালার পর্দার ওপর। পর্দা হাওয়ায় দুলছে।

মানুষের সংসারের এত কাছে আর কখনো আসেনি জুয়েল সার্কাস। জীবিকা অন্বেষণের নেশায় দুঃসাহসী মানুষের দল এতদিন তাঁবু ফেলে এসেছে লোকালয় থেকে অনেক দূরে—নদীর ধারে কিম্বা শহরের বাইরে কোন ফাঁকা ময়দানে, শ্মশানের কাছাকাছি।

যেখানে মেলার হৈ চৈ ছিল, তেলে ভাজার ঝাঁজ উঠত, বেশ্যার ঘর ছিল। বারান্দায় সরু তারে এমন রঙিন শাড়ি, নীল পর্দা—সংসারী মানুষের সুখ-নিদ্রার এমন স্পষ্ট ছবি হারকু সাহেব দেখেনি।

গাঁজার উৎকট গন্ধ তার নাকে লাগছে। তিন তাসের জুয়ো খেলা হচ্ছে নোয়েল খানের তাঁবুতে। হারকু সাহেব হাঁটছিল খুব আস্তে আস্তে, কোনদিকে যাচ্ছিল তার খেয়াল ছিল না।

"দশ!"

"বিশ!"

"চালিশ!"

"তাস দেখলাও? ব্যস, মার দিয়া—" কাটা-কাটা গলার স্বর, পয়সার আওয়াজ, তাসের খস খস।

আরও পরে যমুনার তাঁবুর ওপর একটা হাত রাখল হারকু সাহেব, সাবধানে কানও ঠেকাল। ফিরে আসেনি রাধানাথবাবু। শিবনাথও আর ঢুকবে না এই তাঁবুতে। হারকু সাহেব হাসল। যমুনার জরীর কাঁচুলির মতন তার হাতে ঠেকছে তাঁবুর নরম কাপড়, এখান থেকে হঠাৎ সরে যাওয়ার ইচ্ছে হল না হারকু সাহেবের।

"কী গো ভীম সিং, মুখে কথা নেই যে?"

"না, টুনি, কথাবার্তা আর ভাল লাগে না। এক-একবার ভাবি সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই!"

"তাই যাও না!"

"একবার বাড়ি ঘুরে আসতে চেয়েছিলাম—শুয়োরের বাচ্চাটা যেতে দিল না—"

"কে, হারকু সাহেব?"

"নাম মুখে আনতে নেই, বল শুয়োরের বাচ্চা!"

"অমন অনেক থাকে গো সার্কাসে। ওই বাজার মাস্টারটা—শয়তান! রোজ এসে ঘ্যানর ঘ্যানর করবে আমার কাছে, শাসিয়ে যাবে—"

"কেন?"

"ঘুমন্ত মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যেতে চায় রাউটিতে—"

"কাকে?"

"তার নজর শান্তার ওপর। ধমক দিয়ে বলেছি, না। চাকরি যাবে তোমার। তা বলে, যায় যাক। আমাকে বলে, তাম্বুওয়ালী।"

মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা বৃহৎ দলের নিঃসঙ্গ দলপতির মতন হারকু সাহেব নালিশ জানাচ্ছিল জন্তু জানোয়ারের কাছে। বাঘ-সিংহর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কাতর চোখ মেলে সে মনে মনে বলছিল, করালীকান্ত বোলে আমাকে শুয়ারের বাচ্চা, সহদেব গালি দিল। এ চাঁদনী, এ সুরয—ভোলা আউর পান্না, আমার বাত শুন! আমি তোদের ছাড়ব—সাচ বাত। সব শালাকে ফিনিশ করে দিবি—আমার প্রেসটিজ রাখবি! সার্কাসের সব মানুষ শুয়ারের বাচ্চা!

"লছমী", ঘুরে-ঘুরে সব শেষে হাতির সামনে এসে দাঁড়াল হারকু সাহেব। করালীকান্তকে যেমন ডেকেছিল, হাতির শুঁড়ে হাত বুলোতে বুলোতে তেমন স্বরে সে আবার আস্তে ডাকল।

অন্ধকারের স্তূপের মতন হয়ে আছে লছমী, হারকু সাহেবের ডাক শুনে জোরে জোরে শুঁড় দোলাল। ঘুঙুরের বোলের মতন তার গলার ঘণ্টা বেজে উঠল, ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর!

হাতির শুঁড় ঠান্ডা, কর্কশ। কিন্তু দুহাত দিয়ে তা শক্ত করে ধরেছিল হারকু সাহেব। এক-একবার শুঁড়ের কাছে সে নাক নিয়ে আসছিল, কখনো গাল ঘষছিল, মুখ ঘষছিল। পশুর সঙ্গে এই রকম আচরণ করে মনে মনে সে অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছিল।

মৃদু একটা ডাক শুনে হাতির কাছ থেকে কিছু দূরে চমকে সরে এল হারকু সাহেব, পিছন ফিরে লীলাকে দেখল। তার মুখ যন্ত্রণাকাতর, অন্ধকারে হারকু সাহেব স্পষ্ট দেখতে পেল না। নিজের দুর্বলতা লীলার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে বলে তার মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল।

"কেন উঠে এলি লীলা?"

"এত রাতে হাতির সাথে কী কর হারকু সাহেব?" তাকে বিদ্রূপ করার মতন মুখ নামিয়ে লীলা বলল।

"যা, তাম্বুতে যা!"

লীলা গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল। পকেট হাতড়ে সিগ্রেট খুঁজল হারকু সাহেব। পেল না। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় সিগ্রেটের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসেনি!

লীলা কয়েক মুহূর্ত হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকল, পরে বলল, "ঘুম নেই তোমার চোখে?"

"লীলা, যা!"

"তোমার সাথে আমার কথা ছিল যে হারকু সাহেব—"

"কথা দিনের বেলায় বলবি।"

লীলা হাসল, "দিনের বেলা মানুষ ছেঁকে ধরে যে তোমাকে, তখন কথা হয়!"

হারকু সাহেব আর একবার রূঢ় স্বরে বলে উঠল, "চলে যা লীলা, না যাবি তো আমি তোকে—"

"কী করবে? মারবে? মার না—" লীলা হারকু সাহেবের কাছে এগিয়ে এল, সমস্ত শরীর মেলে দিল তার সামনে।

একটা কড়া কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে ইতস্তত করল হারকু সাহেব। লীলার গা থেকে ধূপের মতন মিষ্টি গন্ধ উঠছিল। হারকু সাহেবের হঠাৎ মনে হল পীরের কবরে মোমবাতির মতন মিটমিট করছে তার দু চোখ। সে বিমূঢ়ের মতন তার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল।

লীলাও যাচ্ছিল তার পিছনে পিছনে। কালো বোরখায় মুখ ঢাকা একটা মূর্তির কথা হারকু সাহেবের আবার মনে পড়ছিল।

॥ ষোল ॥

হারকু সাহেবের তাঁবুর মধ্যে অন্ধকার সাপের মতন ফণা তুলে আছে। তার তলায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল লীলা। বাইরে হারকু সাহেব তাকে ধমক দিতে পারেনি, লীলা জানত, এখন সে তাকে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে। হারকু সাহেবের শাসন অগ্রাহ্য করে তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে লীলা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল।

হারকু সাহেবের তাঁবুতে অন্ধকারে একা-একা চলে আসবার ইচ্ছা আজ হঠাৎ হয়নি লীলার। নম্বর শেষ হয়ে যাবার পর শরীরের খাঁজে-খাঁজে বাতের ব্যথার মতন ক্লান্তির এক-একটি আঁচড় লেগে থাকলেও মধ্যরাতে তার চোখে ঘুমের ঈষৎ কাতরতাও ছিল না। বুকের মধ্যে যন্ত্রণার নিষ্ঠুর পেষণ অনুভব করেছে লীলা। এবং খুব কঠিন একটা খেলা দেখাবার মন নিয়ে নবীনের ফাঁস বড় সন্তর্পণে ছাড়িয়ে সে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

কিছু সময় বিকল একটা যন্ত্রের মতন দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে পা অসাড় হয়ে এসেছে লীলার, তাঁবুর বাইরে যেতে তার সাহস হয়নি।

রোজকার মতন অঘোরে ঘুমচ্ছিল নবীন, মোষের ডাকের মতন তার নাক থেকে বিশ্রী একটা শব্দ উঠছিল। লীলা ঘুমন্ত নবীনের দেহ দেখেছিল, তার নাক ডাকার শব্দ শুনেছিল এবং কাতর একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়েছিল।

দু-হাতে কপাল টিপতে টিপতে জেগে থাকার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল লীলা। তার মনে হয়েছিল হারকু সাহেব তার আর কেউ নয়, যে মানুষটা তার পাশে পড়ে আছে মড়ার মতন—সে-ই সব।

গভীর রাতে হারকু সাহেব লীলাকে একা পেলে আগের মতন বুকে চেপে ধরবে না, আদর-সোহাগ করবে না—এখন সে তাকে দেখলে চমকে উঠবে, গালাগাল করবে। লীলার আরও মনে হয়েছিল, রাগের ঝোঁকে দিন রাত বিবেচনা না করেই হারকু সাহেব তাকে আর নবীনকে জুয়েল সার্কাস থেকে নিষ্ঠুরের মতন তাড়িয়ে দেবে। এখান থেকে চলে যাবার ভয় লীলার মনের ইচ্ছাকে এতদিন দাবিয়ে রেখেছিল বলে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হারকু সাহেবের তাঁবুতে ঢুকে পড়তে তার সাহস হয়নি।

আজ লীলা হঠাৎ উঠে আসেনি। সার্কাস ছিল না, কিন্তু বড় ক্লান্ত তার শরীর, নির্জীব মন—ফুরিয়ে যাওয়ার মতন। যমুনার তাঁবুতে যাওয়া-আসা শুরু করেছে হারকু সাহেব। মাখামাখি হবে তার সঙ্গে। সে তাকে নতুন-নতুন খেলা শেখাবে, সার্কাস-কুইন করে দেবে।

লীলা পিছিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে, একটা ভীতু মানুষের বউ সেজে তাকে থাকতে হবে সারা জীবন। যমুনা হাততালি দেবে তাকে দেখে। এসব ভাবতে ভাবতে লীলা জেগে-জেগে জ্বলে যাচ্ছিল। যদি একটাও কঠিন নম্বর জানত নবীন, ভীতু মানুষ না হত তাহলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকত তার

জীবনে এবং একদিন এমন পিছিয়ে থাকার বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারত লীলা।

কিন্তু তেমন কোন ঘটনা ঘটবে না, লীলার মুক্তির সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে হারকু সাহেব। হাত দিয়ে জোরে-জোরে কপাল ঠুকছিল লীলা, মনে মনে বলছিল, আমার এমন সর্বনাশ তুমি কেন করলে গো হারকু সাহেব!

দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি এখনো হালকা শীতের আমেজে ঝিমঝিম করছিল। বাতাস চলে বেড়াচ্ছিল খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। সরু চাঁদ বাসি লাউ-এর টুকরোর মতন আকাশে লেগে থাকলেও আলো কিংবা হাওয়া—লীলার তাঁবুতে এসব কিছু ছিল না। শুধু ঝাঁক-ঝাঁক মশা একসঙ্গে জড়ো হয়ে তার দেহ ফালা-ফালা করে দিতে চাচ্ছিল।

বাঘ-সিংহর ডাকাডাকি, টালিগঞ্জের পুলিশ ফাঁড়িতে থেকে থেকে ডাকাত পড়ার মতন চিৎকার, "এ ভবানী, ডিউটি বদলিকা টাইম হো গিয়া! আ যাও—" লীলার শরীর এসব শুনতে শুনতে লোহার মতন শক্ত হয়ে উঠছিল।

কিছু পরে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কুকুর বেড়াল না, একটা মানুষ চলা-ফেরা করছে। লীলার তাঁবুর পাশেই পায়ের খসখস শব্দ হল, মানুষের কাশি উঠল। হারকু সাহেবের গলার স্বরের মতন তার পায়ের শব্দও বড় কর্কশ। লীলা চেনে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ পড়ে থেকে সে উঠে বসল। এত রাতে বাইরে কেন ঘোরাঘুরি করে হারকু সাহেব! কার তাঁবুতে যায়? যমুনার তাঁবুতে? যায় না ফিরে আসে?

তাড়াতাড়ি খাট থেকে নামতে গিয়ে লীলার পা লেগে জলের ছোট কুঁজো উল্টে গেল। গলগল করে জল পড়ে যাচ্ছিল। গেলাস গড়িয়ে গেছে আর একদিকে।

এসব দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল না লীলার। সে খুব পাতলা একটা ব্লাউজ পরল, শাড়ি বদলে নিল অন্ধকারে, মুখে গলায় পাউডার ঘষল এবং নবীন জেগে আছে কিনা তা জানবার কোন চেষ্টা না করেই বেরিয়ে এল।

তাঁবুর বাইরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার কালো বোরখার মতন ঝুপ করে পড়ল লীলার উন্মুখ দেহের ওপর। দড়িতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সে সামলে নিল। অন্ধকারের শাসন গ্রাহ্য না করে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি ফেলে দিশাহারার মতন হাঁটছিল লীলা—পাথুরে পেশী হ্রস্ব একটি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

এখন আঁধার ঘন। কেউ আমাকে দেখে না। আমি শুধু শুধু এত জামা-কাপড় পরলাম! হারকু সাহেব, আমি আমার উরুর তাপ দিয়ে তোমাকে টেনে রাখব। আমার বুক টিপে-টিপে মধু চাখবে না তুমি? ঠোঁট চুষে-চুষে বলবে না, মেরা জান!

অন্ধকারের বোরখা পা দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে আপন মনেই বড় দুঃসাহসী হয়ে উঠছিল লীলা।

যে খাট কিছু আগে পীরের কবরের মতন মনে হয়েছিল হারকু সাহেবের, তার ওপরেই সে এক পাশ ফিরে পড়ে থাকল। লীলা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, তার উপস্থিতি হারকু সাহেবকে আরও অবসন্ন করে তুলছিল এবং মনে

মনে খুব কঠোর হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলেও সে তাকে চলে যাবার কথা বলতে পারল না।

অনেক সময় চুপচাপ পড়ে থাকল হারকু সাহেব। যে-তৃষ্ণা জোর করে সে ঠেলে রেখেছিল, এখন তা তার গলার ভিতরে আগুনের তাপের মতন খাঁ-খাঁ করে উঠল।

"লীলা, এক গিলাস পানি পিলাও—" আরও পরে হারকু সাহেব খুব আস্তে কথা বলল। লীলার দিকে ফিরে দেখল না সে, কিন্তু পা গুটিয়ে নিয়ে তার খাটে আর একজন মানুষের বসবার জায়গা করে রাখল।

হারকু সাহেবের কোমল স্বর শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মতন দাঁড়িয়ে থাকল লীলা। তাঁবুর মধ্যে অন্ধকার এখন ঈষৎ ফিকে, আলোর ক্ষীণ একটা রেখা অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। কিন্তু তাহলেও লীলার চোখ ঝাপসা—সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

কোথায় জল আছে তা জিজ্ঞেস করবার আগেই বালিশের তলা থেকে বড় একটা টর্চ টেনে নিয়ে লীলার মুখের ওপর আলো ফেলে হারকু সাহেব বলল, "টেবিলের উপ্পর—দেখলি?"

মুখের ওপর একটা হাত তুলে টর্চের আলো ঢাকবার চেষ্টা করছিল লীলা, "আলো নিভিয়ে দাও হারকু সাহেব—"

"কেন রে, শরম লাগে?" নিজের পায়ের ওপর আস্তে টর্চের আঘাত করতে করতে হারকু সাহেব লীলাকে বলল। তার স্বরে শ্লেষের কিছু ঝাঁজ ছিল।

হারকু সাহেবের কথার কোন উত্তর দিল না লীলা। সে পলকে জল গেলাস—এসব দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তার চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল বলে টেবিলের ওপর অনেক জল পড়ল, গেলাস ভরল কি-না অন্ধকারে তা-ও বুঝতে পারল না লীলা।

"আমার রাউটিতে রাতের বেলা তুই কেন এলি?"

ঢক ঢক করে জল খাচ্ছিল হারকু সাহেব। জল বড় গরম, তার গলা ভিজলেও তৃষ্ণা মিটল না। খালি গেলাস ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে লীলা বোবার মতন দাঁড়িয়েছিল, হারকু সাহেব তার দিকে গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আউর এক গিলাস।"

গেলাস ভরতে অনেক সময় নিচ্ছিল লীলা। ঈর্ষা দ্বেষ এবং ব্যর্থতা—এই রকম সব অনুভূতি তাকে কাচের ভাঙা ভাঙা টুকরোর মতন খোঁচা দিচ্ছিল। হারকু সাহেবের তাঁবুতে কেন দুঃসাহসী হয়ে সে চলে এসেছে, তা তাকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে সে বড় অস্থির হয়ে উঠছিল।

খালি গেলাস হাতে নিয়ে লীলা ভিজে টেবিলে হাত ঘষল, চুঁয়ে-চুঁয়ে জল পড়ছে। শাড়ি দিয়ে তা মুছে দিতে দিতে দূরে দাঁড়িয়েই লীলা সাহস করে বলল, "টেরাপিজের খেলায় তুমি যমুনাকে নিলে, হাসিকে নিলে—আমাকে নিলে না?"

হারকু সাহেব হাসল, "এই কথাটা বলবার জন্যে তোর ঘুম এল না—রাতের বেলা উঠে এলি?"

ভরা গেলাস নিয়ে আস্তে আস্তে হারকু সাহেবের খাটের কাছে আবার এসে দাঁড়াল লীলা। মদ খাওয়ার মতন জলের গেলাসে চুমুক দিতে থাকল হারকু সাহেব। লীলাকে এখন দেখবে না বলেই তার দু চোখ বন্ধ। অন্ধের

মতন হয়ে থাকলেও লীলার দেহের ঘ্রাণ হারকু সাহেবের মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ করে অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছিল হারকু সাহেব, ব্যালেন্সের খেলার মতন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে করতে সে খুব ঠাণ্ডা স্বরে বলল, "আমার সার্কাসের সব মানুষের উপর আমার সুবিচার করতে হবে। তুই বলডেন্স দেখলাবি, যমুনা হাসি ট্র্যাপিজ খেলবে—"

"যমুনা সার্কাস কুইন হয়ে যাবে হারকু সাহেব?" লীলার গলা ধরে এসেছিল, হারকু সাহেবের খাটে বসবার জায়গা থাকলেও হঠাৎ বসে পড়বার সাহস হল না তার।

হারকু সাহেব বলল, "ভাল খেলতে পারলে জরুর হবে।"

লীলা কিছু সময় মুখ নিচু করে থাকল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। তাঁবু থেকে বেরিয়েই হোঁচট খাবার সময় তার পায়ের আঙুলে খুব লেগেছিল—এখন এক পা দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চাপতে চাপতে সে অভিযোগ করবার মতন বলল, "হারকু সাহেব, একটা ভীতু মানুষের সঙ্গে তুমি যমুনার বিয়ে দিয়ে দেবে?"

লীলার ইঙ্গিত বুঝল হারকু সাহেব। তার কথা শুনে সে চোখ খুলল এবং খালি গেলাস মাটিতে আছড়ে ফেলে উষ্মা প্রকাশ করল, "যমুনা তোর মতন আওরৎ না, তার সাধির ভাবনা সে নিজে ভাববে। আমি কেন তার সাধি দিব?"

"আমার কী দোষ?" নিচু হয়ে গেলাস খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত একটা মেয়ের মতন লীলা হাঁপাচ্ছিল, "সেই ছোট বয়েস থেকে তোমাকে দেখছি, তুমি রাতে রাউটিতে ডেকেছ—এসেছি, না আসতে চাইলে তুমি জোর করে ধরে এনেছ—"

হারকু সাহেব ধমক দিয়ে বলল, "তখন সাধি হয়েছিল তোর?"

খালি গেলাস দুহাতে চেপে ধরে হারকু সাহেবের খাটের ওপর তার পায়ের কাছে বসে পড়ে লীলা কাতর স্বরে বলল, "জোর করে একটা ভীতু মানুষের সাথে আমার বিয়ে তুমি কেন দিলে হারকু সাহেব?"

লীলা কথা বলতে বলতে একটা হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল হারকু সাহেবের পায়ের ওপর। হারকু সাহেব পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল। কিছু সময় সে তাঁবুর মধ্যে অশান্ত এবং অধীর হয়ে পায়চারী করল, পরে কাঠের চেয়ারে বসে-বসে লীলাকে দেখে তার মনে যে নেশা জেগে উঠছিল, তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকল।

"হারকু সাহেব—"

"লীলা যা! ফের আমার রাউটিতে আসবি তো—একটুক শরম হল না তোর?"

"আমাকে কেউ দেখেনি।"

"বাঘ সিংহ দেখেছে, হাত্তি দেখেছে। কেউ না দেখুক, উপ্পরওয়ালা সব দেখল—"

লীলা হারকু সাহেবের নিচু খাটে বসে অন্ধকারে তার দিকে তাকিয়ে হাসল "তোমার রাউটিতে রাতের বেলা আসা আমার অব্যেস, ভগবান তা-ও দেখেছে হারকু সাহেব।"

"এসব বলাবি না লীলা," হারকু সাহেব তার কথা শুনে মনে মনে উত্তেজিত

হয়ে উঠলেও খুব আস্তে বলল, "রাউটিতে যা। নবীন উঠে যেতে পারে। তোকে খুঁজবে—না দেখতে পেলে এদিকে চলে আসবে—তখন কী রকম হবে বল?"

লীলা কাচের গেলাস দিয়ে বুকে জোরে চাপ দিতে দিতে বলল, "তোমার রাউটিতে সে-ও আমাকে রাতের বেলা অনেক দেখেছে হারকু সাহেব। তুমি চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে আর সে ছুটে সোডার বোতল নিয়ে আসত—তোমার মনে নেই?"

লীলার সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব। এত সময় সে মেজাজ ঠিক রেখেছিল, এখন তার আর ধৈর্য থাকল না। তার পায়ের কাছে অনেক খালি সোডার বোতল ছিল, একটা তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল হারকু সাহেব, চিৎকার করে বলল, "আমার রাউটি থেকে তুই বাহার যাবি কি-না?"

লীলা নড়ল না, হারকু সাহেবের হাতে সোডার বোতল দেখে হাসল, "আমি অনেক সয়েছি, আর পারি না। তার সাথে আমি থাকতে পারব না হারকু সাহেব।"

"কার সাথে থাকার মতলব তোর?"

"আমি একা থাকব, আমার খেলা নিয়ে থাকব—" গভীর রাতে তৃষ্ণায় লীলারও গলা শুকিয়ে আসছিল, গেলাস হাতে নিয়ে হারকু সাহেবের দিকে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে সে আপন মনেই ফিস ফিস করে উঠছিল, "কারুর সাথে আমার থাকার দরকার নেই—"

লীলা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে করে কিছু নরম হল হারকু সাহেব, সোডার বোতল নামিয়ে রেখে তাকে দেখতে দেখতে বলল, "এই কথাটা আগে যদি আমাকে বলতিস লীলা, তবে তোর সাধির জন্যে আমাকে ঝুট্‌মুট্‌ ভাবনা করতে হত না—"

হারকু সাহেবের কথা না বুঝে লীলা বলল, "ভাবনা তুমি কেন করলে হারকু সাহেব?"

"কেন করলাম, তুই জানিস না?"

"না।"

"ঝুট বাত বলবি না লীলা!"

"মাইরি, আমি জানি না হারকু সাহেব।"

"তোর মতলব ছিল আমার সাথে সাধি করবার—" লীলা হারকু সাহেবের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা হাত সে তুলে নিয়ে হাতির শুঁড়ের মতন এত পরে গালে-মুখে বুলোতে বুলোতে বলল, "সাচ কি-না বল?"

হারকু সাহেবের চোখা প্রশ্নের খুব সহজ উত্তর লীলা এক কথায় দিতে পারত, কিন্তু পরিচিত হাতের স্পর্শে তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। সার্কাসের বাইরের জগতের শাঁখা-সিঁদুরপরা সংসারী মেয়ের মতন কোন সংস্কার না, যে-দুঃসাহসে ভর করে লীলা এখানে এসেছিল হারকু সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে, যত কথা বলবে ভেবেছিল—এখন সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

তার সব কথা কেঁচো আর উই পোকার মতন কখনো রক্তবর্ণ, কখনো সাদা হয়ে মনের মধ্যে চলাফেরা করলেও সে মুখ খুলতে পারল না। লীলার মনে হচ্ছিল. ঘূর্ণায়মান এক চক্রের ভিতর দাঁড়িয়ে কোন নতুন খেলা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ সে হারকু সাহেবের অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে পড়ে গেছে, কেবল এখনো তার মাথার মধ্যে ঘূর্ণনের একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছিল।

লীলাকে অনেক সময় স্থির ও নীরব থাকতে দেখে তার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে হারকু সাহেব বলল, "এক কাহানী শুনবি লীলা?"

লীলা মৃদুস্বরে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি তোর সাধি কেন দিলাম, সেই বাত আমি তোকে শুনাব—" হারকু সাহেব লীলার হাত ছেড়ে দিল, কাঠের হালকা চেয়ারে বসে যত দূর পারল, তত দূর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার মতন শরীর বেঁকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে বলল, "সার্কাসের দোসরা আওরাতের মতন আমার সাথে তোর যদি শুধু মজা করবার মতলব থাকত, তবে নবীনের সাথে আমি তোর সাধি দিতাম না—সাচ বলছি।"

লীলা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "বার বার মতলবের কথা তুমি আমাকে বল না হারকু সাহেব। মতলব-টতলব আমার ছিল না—"

"জরুর ছিল। ঝুট বলিস না লীলা। আমার সাথে তুই মহব্বতের মতলব করেছিলি?"

লীলা পাপ স্বীকার করার মতন ভয়ে-ভয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "হ্যাঁ। তোমার কথা ছাড়া কারুর কথা ভাবি না—"

"লীলা, চুপ!" হারকু সাহেব লীলার গায়ে আঘাত করে বলল, "আমার জীবনে আওরাত নাই। আওরাত জীবন ফিনিশ করে দেয়, কম বয়েসের মানুষকে বুড্ডা বানিয়ে দেয়—শুনলি? আমার জীবনে এক জুয়েল সার্কাস আছে—ব্যস, আউর কুছ নেই।"

বাইরে গোলমাল হচ্ছিল। মাতাল হয়ে ফিরে এসেছে রাধানাথবাবু। সম্ভবত দারোয়ান তাকে ধরে-ধরে তাঁবুতে নিয়ে যাচ্ছে। রাধানাথবাবু তার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছে।

"হাম মাতোয়ালা নেহি হ্যায়। হাম হ্যায় রাজা রাধানাথ সিকদার—মালুম? হাম হ্যায় যমুনাকা বাপ, হাসিকা বাপ। হাম হো যায়গা মোহনলালকা শ্বশুর।"

"এ দারোয়ান, শ্বশুর কিসকা বোলতা সামঝো? জরুকা বাপ। তুমারা জরু হ্যায়? কাঞ্চনানি পশো, সুপারি খ'সো, ও দিলকা পিয়ারি—

"হাম হো যায়গা শিবনাথকা—আরে, নেহি নেহি, শিবনাথ বহুৎ বদমাশ। হাম হো যায়গা হারকু সাহেবকা শ্বশুর।

"ব্যস, এ জুয়েল সার্কাস হামরা হ্যায়। এই চলা আও, বোতল লে আও। এই, আপ!"

রাধানাথবাবুর সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, লীলা যন্ত্রণাকাতর মুখ তুলে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "রাধানাথবাবু কী সব বলে যে?"

হারকু সাহেব বিরক্ত হয়ে বলল, "ওনার বাত ছোড়। বড়া আদমী ছিল, মদ আউর রেস ওনাকে একদম খতম করে দিল—"

লীলা বাধা দিয়ে বলল, "জানি।"

যেমন করে এসেছিল লীলা, এখন একা-একা আস্তে আস্তে পা ফেলে তেমন করেই আবার ফিরে যাচ্ছিল, যাবার সময় কিছু বলল না। হারকু সাহেব তাকে যেতে দিল না, কথা বলল।

"লীলা এক কাহানী শুনাব তোকে?"

হারকু সাহেবের পাশে বসে পাথরের ঠাণ্ডা মূর্তির মতন স্থির হয়ে থাকল লীলা। রাধানাথবাবুকে তাঁবুতে পেঁাছে দিয়ে ফিরে এসেছে দারোয়ান। বাঁশের

গেট টেনে দেয়ার খরর খরর শব্দ এল। পুলিস ফাঁড়িতে একবার মাত্র ঘণ্টা বাজল। সাড়ে বারোটা কিংবা একটা কি দেড়টা—কত রাত হল কে জানে!

একটা আবেশ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেবকে। ভিজে কয়লার মতন তার মনে অহঙ্কারও থেকে থেকে দপ দপ করে উঠছিল। আবেশ ও অহঙ্কার আয়ত্ত করে নেয়ার জন্যে সে-মাটিতে পা ঘষছিল। লীলার হাত দোলাতে দোলাতে হারকু সাহেব বলে যাচ্ছিল তার জীবনের সুন্দর এবং ভয়ঙ্কর এক কাহিনী।

॥ সতর ॥

লীলা, তুই বাহার যা! বাঘ সিংহর খাঁচার কাছে আঁধারের ভিত্তর দেয়ালের পিছে দেখ্ ভদ্দর মানুষের কোঠীতে আওরাতের শাড়ি তারের উপ্পর ঝুলে, নীল এক বাত্তি জ্বলে ঘরের ভিত্তর। ভদ্দর মানুষ বিবিকে পাশে লিয়ে আরামে ঘুম যায়!

হাততালির জন্যে যে মানুষ পাগলার মতন হয়ে গেল, বিবির পাশে সে এমন চুপচাপ ঘুমাতে পারে না। সে-মানুষ তার বিবিকে মারডার করে রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে যায়, মন মন পাত্থর ভাঙে বুকের উপ্পর। সব লোক তাজ্জব বনে যায়। সে-মানুষ পাবলিকের গোলাম, আওরাত তাকে ফিনিশ করতে পারে, বল?

এক আওরাতের বাত শুন, লীলা। সেই রকম আওরাত কোন সার্কাসে নাই—সারা দুনিয়ায় নাই। তার আঁখ দেখলে পাত্থর বনে যাবে পীর-পয়গম্বর, এক পা-ও চলতে পারবে না। তার আঁখের ভিত্তর দুনিয়া নাচে। এ লীলা শুন্, সে আওরাত আমার বিবি ছিল।

আমি ঘরে না ফেরা তক আমার বিবি কোন খানা মুখে নিত না, ঘুম যেতে পারত না। চুপচাপ আশমানের দিকে দেখে উপ্পরওয়ালার নাম নিত—আমার ঘরে ফিরবার টাইম কখন হবে! আমি দূর-দূর গাঁয়ে খেলা দেখলাতাম। কোনদিন ফিরতাম, কোনদিন না। তখন আমার বিবির আঁখ থেকে পানি গিরত।

যেদিন-যেদিন আমার হাড্ডিতে চোট লাগত, বহুৎ দরদ হত বুকের ভিত্তর, সেদিন-সেদিন উ বিবি গরম তেল লাগিয়ে দিত সারা রাত। আর রোয়ে-রোয়ে আমাকে শুনাত, এ কাম বহুৎ খারাপ। এ কাম ছোড় দেও। জীবন খতম হবে জলদি।

এসব বাত বিবি শুনাত যখন, অনেক রাগ হত আমার বুঝলি? আমি বিবিকে জোর ঠেলা মেরে দূরে হটাতাম, কেয়া কাম বাতলাও? দোসরা কোই কাম মালুম হ্যায়?

বিবি শুনাত, তোমার বাপ-দাদা যে কাম করত সে-কাম অনেক ভাল আছে—

মেজাজ বিলকুল বিগড়ে যেত আমার, লীলা জানিস? আমি শালা বাপ-দাদার মতন মাথায় ফলের টুকরি লিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় চিল্লাব, আম চাই, এপ্পেল চাই—কেলা পেয়ারা আঙ্গুর চাই? বিবির আমাকে ফিনিশ করে দিবার মতলব। আপনার সুবিস্থার জন্যে বিবি আমাকে ঘরের ভিত্তর আটক রাখতে চায়।

শুন্ লীলা, আমিও বেয়াকুফের মতন কাম করতাম। বিবির ভাবনা আমাকে

জলদি-জলদি ঘরে লিয়ে আসত—সারা দিল থাকত বিবির উপ্পর। ভদ্দর মানুষের মতন আমারও কখন-কখন ইচ্ছা হত বিবির সাথে চুপচাপ শুয়ে জীবন কাটাবার। ঝুটমুট হাততালির দরকার নাই।

শুন্ লীলা, বিবি আউর হাততালি, মহব্বত আউর নাম একসাথে থাকবে না। ভাবনা একটাই রাখতে হবে, তা বিবির ভাবনা হোক, কি খেলার ভাবনা হোক। যে-মানুষ ডবল ভাবনা ভাববে, তার জীবন ফিনিশ।

আমি বড় দুবলা হয়ে গেলাম। দূর-দূর গাঁয়ে গেলে বিবির আঁখ থেকে পানি গিরবে, বিবি খানাপিনা করবে না, ঘুমাবে না। ভেড়ুয়া বনে যেতে আমি নারাজ। আমার ভেগে যাবার মতলব হল। হাততালির আওয়াজ বিনা জীবন বরবাদ।

একদিন বড় চোট লাগল বুকে, একটা হাড্ডি ভেঙে যাবার মতন। পুরা তিনদিন খেল বনধ। আমি ঘরের ভিত্তর পড়ে আছি, আউর বিবি আমাকে দেখছে সারা দিন—সারারাত!

শুন্ লীলা শুন্, সে-বিবিকে আমি মারডার করে দিলাম। যদি মারডার না করে দিতাম তবে খেল খতম হয়ে যেত আমার। ফলের চুপড়ি মাথায় লিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় চিল্লাতে হত—তার আঁখের ভিত্তর এমন যাদু ছিল।

চারদিনের দিন আমার হাড্ডি বিলকুল ঠিক। আমি গাঁঠরি উঠালাম, বাহার যাবার জন্যে তৈয়ার হলাম। এক সার্কাসের মালিকের সাথে বার্তাচিত হয়েছিল, তার সামনে খেলা দেখলাতে হবে। মালিক খুশ হলে তার কোম্পানীতে আমার নোকরি হবে।

বিবি হাত টেনে রাখল আমার। বাহার যেতে দিবে না। আমার তবিয়ৎ ঠিক নাই। বাহার গেলে ফের চোট লাগবে। বিবি বলে, কসম আমার, বাহার যাবে না, শুয়ে থাকতে হবে আউর বহুৎ দিন।

আমি বাহার যাবার জন্যে পাগল। বিবি যেতে দিতে নারাজ। আমি জোর করে হাত ছুটিয়ে নিলাম, ধাক্কা মারলাম বিবিকে। সে ফের আমার গায়ের উপ্পর পড়ল। বুঝলি লীলা, মেজাজ বড় গরম হয়ে গেল আমার। বিবিকে মারডার করবার মতলব হল। আমি তার গলা পাগলার মতন ধরলাম। বাহার চলে গেলাম।

নোকরি হল আমার এমপ্রেস সার্কাসে। রাতের বেলা ওয়াপাশ এলাম ঘরে। কোন মানুষ জানল না। বিবির লাস পড়েছিল। আঁধারে ভয় লাগল আমার। মন বড় নরম হল, দুখ জাগল। আমি চিল্লাচিল্লি করে করে লোক ডাকলাম, পুলিসকে এজাহার দিলাম, কে মারডার করল সাহেব আমার বিবিকে?

শুন্ লীলা, লাস কাটা ঘরে আমার বিবিকে ফের কাটল মানুষ। একটা বাচ্চা ছিল তার পেটের ভিত্তর। আমি দেখলাম। আমাকে পুলিস খালাস দিল তিন হপ্তা পরে। কে মারডার করল তার ইনকোয়ারি চলতে লাগল—আজও ইনকোয়ারি চলছে মালুম!"

লীলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হারকু সাহেবের কাহিনী শুনছিল। এখনো তার চোখ বন্ধ। তার স্বর কখনো নিচু, কখনো উঁচু—চীৎকার করার মতন।

কথা বলবার সময় হারকু সাহেবের গলা থেকে হাঁপাবার মতন শব্দ উঠছিল। লীলার তাকে আর এক গেলাস জল খাওয়াবার ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু হারকু সাহেব খুব শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছিল, সে তা ছাড়াতে পারল না।

হারকু সাহেব চোখ খুলল আরও পরে, মুখ তুলে লীলার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল, "কী রে লীলা, ডর লাগে?"

"না।"

"যে আওরাত আমার ভাবনা করবে, আমাকে দুবলা করবে, ভেড়ুয়া বানাবার তালে থাকবে, আমি তাকে ফিনিশ করে দিব জরুর।"

অন্যমনস্কের মতন লীলা হঠাৎ বলল, "আর এক গেলাস জল তোমাকে দেব হারকু সাহেব?"

তার কথার উত্তর দিল না হারকু সাহেব, চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে আবার খাটের কাছে এল, থেমে থেমে বলল, "লীলা, করিমপুর ক্যাম্পে আমি তোকে মারডার করবার মতলব করেছিলাম—"

লীলা দূর থেকেই হারকু সাহেবের কথা শুনে বলে উঠল, "আমি ভয় পাই না—" কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে থাকল, হারকু সাহেবের খালি চেয়ারে এখন তার বসে পড়বার ইচ্ছে হলেও লীলা বসল না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাকে খুন করবার ইচ্ছে তোমার কেন হল হারকু সাহেব?"

"জানিস না?"

"না।"

হারকু সাহেবের শিগগির ঘুম আসবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহলেও একটা বড় হাই তুলে বালিশে মাথা রেখে সে পা টান-টান করল। কিছু পরে বলল, "লীলা শুন্, এখানে আয়। তুই আমার বিবির মতন ভাবনা শুরু করলি। আমি তোকে লিয়ে মজা মারতে লাগলাম—"

লীলা দু-হাতে মুখ চেপে বেদনার একটা শীতল প্রবাহ রোধ করবার চেষ্টা করতে-করতে কাতর স্বরে ডেকে উঠল, "হারকু সাহেব—"

"ইয়াদ আছে?"

"হ্যাঁ।"

হারকু সাহেব বলল, "জুয়েল সার্কাস জাহান্নামে যেতে বসল, তুই আমাকে যাদু করলি। জীবনে আওরাত ঘুষল তো ব্যস, সব কাম গেল। তোকে মারডার করবার মতলব তখন হল আমার।"

"করলেই তো হত, করলে না কেন?" লীলার বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে তার শরীরের সর্বত্র যন্ত্রণার প্রবল চাপ পড়ছিল বলে অন্ধকারে তাঁবুর কাপড় দেখতে দেখতে সে স্বগতোক্তির মতন খুব আস্তে বলল।

হারকু সাহেব খাটের ওপর এপাশ-ওপাশ করতে করতে দড়ি ছেঁড়া মশারি নিয়ে খেলতে থাকল কিছু সময়, পরে পা গুটিয়ে আবার লীলার বসবার জায়গা করে তাকে ডাকল এবং তার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "আমি তোকে মারডার করে দিতাম জরুর। শুন্ লীলা, একরাতে—যেদিন শেষ খেলা হয়ে গেল করিমপুর ক্যাম্পে তোকে রাউটিতে ডাকলাম—বহুৎ পিয়েছিলাম সেদিন—ইয়াদ আছে?"

"কী জানি!"

হা-হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব, "ঝুট বলিস। জরুর ইয়াদ আছে। সেদিন নবীনের সাথে তোর সাধির বাত পাক্কা হল—"

এত সময় কথা কম বলছিল লীলা, হারকু সাহেবের তাঁবুতে একা-একা এসেছে বলে একটা ভীতিও ছিল তার মনে, হঠাৎ সব মুছে গেল। হারকু

সাহেবের একটা পা অবলম্বনের মতন দু-হাতে চেপে ধরে সে ধরা গলায় বলে উঠল, "হারকু সাহেব, আমি এসব শুনতে তোমার কাছে এত রাতে আসি নি, ও মানুষের সাথে আমি থাকতে পারব না—"

হারকু সাহেব যেন লীলার কথা শুনতে পায়নি এমন ভাবে বলল, "এক বাত শুন্ লীলা, তুই যদি নবীনকে সাধি করতে নারাজ হতিস—আঁখের পানি ফেলে ফের আমার মেজাজ গড়বড় করে দিতিস তবে আমি তোকে মারডার করে দিতাম জরুর।"

"এখন পার না?"

হারকু সাহেব লীলার ইচ্ছার কথা শুনে হাসল, "না, তোর সাধি হবার পর আমি ফের ফ্রী আদমী হয়ে গেলাম। এখন আমার কী দরকার শুধু শুধু তোকে ফিনিশ করবার—"

হারকু সাহেবের ঘাড়ে টর্চের চাপ পড়ছিল বলে সে তা একটু সরিয়ে রেখে বলল, "তবে হাঁ, করিমপুর ক্যাম্পে আমার বালিশের তলে খুব বড়া একটা ছুরি ছিল, নোয়েল খানের রাউটিতে নিমকের বস্তা ভি ছিল। মাহুত আউর নোয়েল খান রাতের বেলা চুপে চুপে কবরের মতন গাড্ডা বানিয়ে দিত—নিমক লাগিয়ে তোর লাস সেইখানে মাট্টি চাপা দিলে ব্যাস, তামাম শোধ হয়ে যেত।

কোন মানুষ ছিল না সেদিন লীলা, ইয়াদ আছে? সব গেছিল রাত ভোর যাত্রা শুনবার লিয়ে। পরের দিন আমরা ভেগে যেতাম নয়া ক্যাম্পে। তোর লাসের পাত্তা পুলিসের বাপ ভি পেতে পারত না—শুনলি?"

লীলা হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমার সব কথা ঠিক না, আমাকে তুমি খুন করতে পারতে না হারকু সাহেব—"

"ঝুট বলছি আমি? জরুর, আমি তৈয়ার ছিলাম—"

"না, তুমি পারতে না", লীলা হারকু সাহেবের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল, ফস করে আলো ফেলল তার মুখে, ঠাণ্ডা টর্চ গালে ঘষতে ঘষতে কিছু পরে বলল, "জুয়েল সার্কাসে আমার মতন মেয়ে আর ছিল তখন, আমাকে খুন করে ফেললে লোকসান হয়ে যেত না কোম্পানীর?"

হারকু সাহেব লীলাকে কাছে টানল। তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সে-ও লীলার মতন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আলো জেবলে বলল, "আরে সো বাত আমার খেয়াল ছিল বলে না আমি নবীনের সাথে তোর সাধি পাক্কা করে রাখলাম।"

হারকু সাহেবের টর্চের জোরালো আলো লীলার উন্মুখ দেহের ওপর উছলে উঠলেও এখন সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল না। মিনতির মতন তাকে তা নিভিয়ে দিতেও বলল না।

লীলা হারকু সাহেবকে ভয় দেখাবার জন্যে শুকনো গলায় বলল, "বিয়ে দাও আর না-ই দাও, মাইরি বলছি হারকু সাহেব, এমন করে আর চলবে না। তোমার মুখের ওপর কথা বলি নি, ভয় হয়েছিল তাই রাজী হয়েছিলাম, এবার আমি এক্‌সিডেন করে মরে যাব—" সে হারকু সাহেবের বুকের ওপর পড়ে কাঁদল।

"এই লীলা, উঠ! কী বলিস রাতের বেলা, ছি-ছি! ওসব কথা মুখে আনা ঠিক না। পরশুদিন টালিগঞ্জে খেল শুরু হবে, আজ তুই এক্‌সিডেনের ভাবনা ভাবিস?"

"হারকু সাহেব, আমি একলা থাকব। তার সাথে থাকলে আমার খেলা পড়ে যাবে—"

লীলার পাশে আর বেশী সময় থাকতে সাহস হচ্ছিল না হারকু সাহেবের। বাইরে হাওয়া উঠেছে। তাঁবু খসখস করে উঠছে মানুষের পায়ের শব্দের মতন।

হারকু সাহেবের দেহে লীলার মিষ্টি গন্ধ একটা তাপ সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল বলে সে তার কাছ থেকে কিছু দূরে সরে গিয়ে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "তুই ঝুটমুট ভাবনা করিস লীলা। খুব অল্পদিনের ভিত্তর নবীন বিলকুল নয়া আদমী হয়ে যাবে দেখিস—"

"না হারকু সাহেব, তা হবে না।"

"হাঁ, জরুর নয়া আদমী হবে। সে বাঘের খেলা দেখলাবে, জুয়েল সার্কাসের রিং মাস্টার হবে—" হারকু সাহেব লীলাকে ভোলাবার জন্যে বলল, "এক নয়া নম্বর তুই করবি?"

"কী?"

হারকু সাহেব লীলাকে একা তার খাটের ওপর বসিয়ে টেবিলের কাছে এসে নিজেই গেলাস হাতে নিল, কুঁজো থেকে জল ঢালল না, লীলার দিকে ফিরে বলল, "নবীন যখন বাঘের খেলা দেখলাবে, শুন্ লীলা, তুই-ও যাবি তার সাথে রিং-এর ভিত্তর। সুরযের দুই পা-ও কাঁধের উপ্পর উঠাবি—"

হারকু সাহেব গেলাস টেবিলের ওপর রেখে হাত জড়িয়ে ধরার মতন করে বলল, "এই রকম করে তুই বেড় দিবি সুরযকে, তার মুখে মুখ লাগিয়ে চুমা খাবি—ব্যস্ তাজ্জব বনে যাবে পাবলিক। বল লীলা, এ নয়া নম্বর তুই দেখলাতে রাজী আছিস?"

লীলা করুণ একটা নিশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত, কিছু পরে শাড়ির এক প্রান্ত তুলে চোখ মুছতে মুছতে খুব নিচু স্বরে বলল, "না।"

"নয়া নম্বর করতে নারাজ? তোর কী হল লীলা?"

লীলা খাট থেকে নেমে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "ভীতু মানুষের সাথে থেকে বাঘের মুখে চুমু খাওয়ার কথা ভাবব কেমন করে হারকু সাহেব!"

"তুই বহুৎ চালাক লীলা। এখন যা রাউটিতে।"

"আমি আবার আসব।"

"না", মনের সব কোমল বৃত্তি যা রাতের অন্ধকারে ফুলের মতন হারকু সাহেবের মনে ফুটে উঠেছিল, যা তাকে কাতর এবং অবসন্ন করে রেখেছিল এত সময়, তা এখন বাসি হয়ে এসেছে, সে অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন কঠোর স্বরে কথা বলে এত পরে হঠাৎ লীলাকেও তেমন বলল, "নিকাল যা লীলা, আমার রাউটিতে রাতের বেলা একেলা কভি আসবি না! আমার হুকুম!"

চোখ মুছে ফেললেও মুখ থমথম করছিল লীলার। এতদিন ধরে হারকু সাহেবের তাঁবুতে রাতে চলে আসবার কথা সে কেন ভেবেছিল তার কারণ এখন লীলার কাছে আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠল এবং বুকের মধ্যে যন্ত্রণার চাপ সে আরও অনেক বেশী করে অনুভব করতে থাকল।

আস্তে আস্তে হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে চলে যাচ্ছিল লীলা। একা-একা জল খাচ্ছে হারকু সাহেব—লীলা তার শব্দ শুনল।

কিন্তু সে বাইরে যাওয়ার আগেই হারকু সাহেব খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে

তার পাশে এসে দাঁড়াল এবং কানের কাছে মুখ এনে চাপা স্বরে বলল, "থাম!"

খাটের ওপর থেকে টর্চ তুলে আনল হারকু সাহেব। বাতাসের শব্দ না, পা ঘষে-ঘষে মানুষ চলাফেরা করছে তার তাঁবুর বাইরেই। কিছু আগে হারকু সাহেবের মনে হয়েছিল কারা যেন কথা বলছে। নতুন জায়গা, চোর কিনা কে জানে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীলা। খুব সতর্ক হারকু সাহেব। সে-ও চুপ টর্চ হাতে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার পায়ের শব্দ পেলেই তাঁবুর পর্দা তুলে চোরের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে তাকে ধরবে।

তাঁবুর প্রবেশ পথের মুখেই দাঁড়িয়ে আছে লীলা, বেরিয়ে যেতে পারছে না। আশঙ্কায় তার শরীর হিম হয়ে এসেছে। আরও আগে চলে গেলেই ভাল হত। এখন মানুষের সামনে পড়লে সব জানাজানি হয়ে যাবে। বড় অস্বস্তি হচ্ছিল লীলার।

যেদিকে দাঁড়িয়েছিল লীলা, কিছু পরে সেদিকে আবার পায়ের শব্দ হল। ইতস্তত করল না হারকু সাহেব, সাঁক করে তাঁবুর পর্দা তুলে বাইরে এল--তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন মানুষ। টর্চ হাতে থাকলেও তা জ্বালবার দরকার হল না, অন্ধকারেই তাদের চিনতে পারল হারকু সাহেব।

কেউ কোন কথা বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। রঘুনাথের মুখ মাটির দিকে, বড় গম্ভীর। তার পাশেই ছিল শিবনাথ, সে তাকিয়েছিল হারকু সাহেবের তাঁবুর দিকে, ভেতরে উঁকি মারবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ হারকু সাহেবের খেয়াল হল এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয়। লীলা এখনো আছে তার তাঁবুতে। হারকু সাহেব তাকে ডাকেনি, সে নিজেই এসেছে—এ কথাটা লীলাকে বলতে হবে বাবুর সামনে।

বাবু ঘুম থেকে একা-একা উঠে আসেনি তার তাঁবুতে। হারকু সাহেব বুঝল, সব লক্ষ করছিল শিবনাথ এবং তাকে জব্দ করবার জন্যে এত রাতে বাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

হারকু সাহেব বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে নেয়ার জন্যে কাশির শব্দ করে রঘুনাথকে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, এত রাতে? কী খবর?"

"না না, কিছু না—" রঘুনাথ বিরস মুখে বলল, "ঘুম হল না আপনার হারকু সাহেব?"

"হত বাবু", শিবনাথের দিকে পলকের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে হারকু সাহেব বলল, "লীলা এসে পড়ল—"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেল শিবনাথ, তাঁবুর ভেতরে তাকিয়ে বলল, "সে এখনো আছে বাবু।"

রঘুনাথ হারকু সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "নবীনের বউ এত রাতে আপনার রাউটিতে কেন এল হারকু সাহেব?"

"আসুন বাবু, ভিতরে আসুন—" হারকু সাহেব এখন টর্চ জেবলে আলো দেখাল রঘুনাথকে, "সেকথাটা নবীনের বউ আপনাকে শুনিয়ে দিবে—" শিবনাথের ওপর একটা তীব্র আক্রোশ হারকু সাহেবকে উত্তেজিত করে তুললেও সব দিক ভেবে সে তাকেও ডাকল, "আসুন শিববাবু।"

হারকু সাহেবের টর্চের আলো কাঁপছিল ছায়াছবির মতন। লীলা তা দেখল একটা ঘোরের মধ্যে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ছিল সে, মৃত্যুভয়ে অবসন্ন একটা মানুষের মতন তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। সকলের সামনে

দিয়ে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হলেও সে এক পা নড়তে পারল না।

হারকু সাহেব লীলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে শক্ত করে টর্চ চেপে ধরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমার রাউটিতে তোকে আমি ডাকলাম?"

"না-না—"

"শুনলেন বাবু?" হারকু সাহেব লীলার পা থেকে মাথা অবধি টর্চের আলো খেলিয়ে নিয়ে আবার বলল, "বাবু পুছে কেন এলি তুই?"

রঘুনাথ বিব্রত হয়ে বলল, "থাক থাক, আমার শুনার দরকার নাই, চলেন শিববাবু—"

শিবনাথ বলল, "বাবু নিজের চোখে সব দেখলেন তো?"

"লীলা কেন এল সেকথা আমি পিছে আপনাকে বলব বাবু", হারকু সাহেব শিবনাথের মুখের ওপর টর্চ ফেলে কঠিন স্বরে বলল, "শিববাবু, পরশু রোজ পয়লা শো, নয়া ক্যাম্প—এত রাত তক্ আমাকে পাহারা দিয়ে তবিয়ৎ খারাপ করবেন না।"

"পাহারা দেয়ার দরকার ছিল হারকু সাহেব, আমাদের মাথার ওপর কেমন মানুষ বসে আছে তা বাবু জানবে না?"

"হাঁ, জরুর জানবে।"

আজ কারুর সঙ্গে তর্ক গোলমাল করবার ইচ্ছে ছিল না হারকু সাহেবের। পরশুদিন এ অঞ্চলে জুয়েল সার্কাসের প্রথম শো—লীলা শিবনাথ দুজনেই আর্টিস্ট, তাদের এখন শান্ত ও সুস্থ থাকা দরকার।

এসব বিবেচনা করে হারকু সাহেব বলল, "বাবু যা বলবে তা-ই হবে। লেকিন পয়লা শো মারডার করবেন না আপনি শিববাবু, আমি হাত জোড় করে বলছি।"

রঘুনাথ দাসের মুখ এখনো বড় গম্ভীর, সে আর একবার বলল, "শিববাবু চলেন—"

"লীলা, যা—" হারকু সাহেব খুব আস্তে বলল।

রঘুনাথ আর শিবনাথ চলে যাবার আগেই হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল লীলা।

এখনো আগের মতন অন্ধকার, ঠাণ্ডা। হাওয়া খেলছে। এখন বাইরের অন্ধকার লীলার দেহ বোরখার মতন ঢেকে দিতে পারল না। মার খাওয়া একটা মানুষ যেমন করে হাঁটে তেমন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিল লীলা। তার মনে হচ্ছিল হারকু সাহেবের টর্চের চেয়েও জোরালো আলো চারদিক থেকে তার ওপর পড়েছে এবং অনেক লোকের সামনে দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে উলঙ্গ হয়ে। তারা তাকে দেখে হাসছে, বিদ্রূপ করছে, থুতু ছিটোচ্ছে। এসব মনে হলেও তাড়াতাড়ি পা চালাবার মতন জোর এখন লীলার ছিল না।

কোন সাংঘাতিক অপরাধ করে পালিয়ে আসা একটা কয়েদীর মতন নিজের তাঁবুতে ফিরেও লীলা সুস্থ হতে পারল না। তৃষ্ণায় তার গলা জ্বলছে, কুঁজো উল্টে আছে পায়ের কাছে—তার জন্যে আর জলও ছিল না।

"যেখানে ছিলে, রাতটা কাটিয়ে আসতে পারলে না সেখানে?" মশারির মধ্যে থেকে তেতো-তেতো স্বরে লীলাকে আরও দুর্বল করে তুলল নবীন।

লীলা কোন কথা বলল না, খাটে গড়িয়ে পড়ে পাশ ফিরল। সে জানত

উত্তর না পেলেও আরও অনেক বেশী বকবে নবীন। লীলা চুপচাপ পড়ে থাকল।

"কোথায় গেছিলে?"

"কেন?"

"একটু লজ্জা নেই তোমার?"

লীলা ছটফট করতে করতে খুব জোরে নবীনকে ধমক দেয়ার মতন বলল, "চুপ!"

নবীন থামল না, উত্তেজিত হয়ে মশারি টেনে তুলল, "কাল ঘাড় ধরে নিয়ে যাব বাবুর কাছে, তোমাকে জুতোর বাড়ি মারব, শালাকে খুন করব—"

লীলা আরও জোরে বলল, "চুপ!"

নবীন আর যা-যা বলছিল সেসব শুনলেও লীলা চুপ থাকল। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল এখন। লীলার মনে হচ্ছিল রঘুনাথ নবীনের গলা পেয়ে হারকু সাহেব আর শিবনাথের সঙ্গে এদিকেই আসছে।

॥ আঠার ॥

কম কথার মানুষ পুষ্পরাজ, বড় বেশী দাম্ভিক। তার দম্ভ অটুট রাখবার জন্যেই সে ঊষাকে ছাড়িয়ে এনেছে কুন্দনলালের কবল থেকে, নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে কোহিনুর ছেড়ে জুয়েল-এ চাকরি নিয়েছে।

টালিগঞ্জ ক্যাম্পে দু-চারদিন ট্র্যাপিজ করেই আরও গম্ভীর হয়ে গেল পুষ্পরাজ। আগে ঊষার সঙ্গে কথা বলবার সময় কোমলতার একটা আমেজ লেগে থাকত তার স্বরে। এখন সেসব কিছু নেই। কথা বললেই বিরক্তির কয়েকটা আঁচড় পড়ে তার চোখেমুখে, স্বরও বড় রুক্ষ হয়ে ওঠে।

ঊষার মুখ থেকে কড়া কথা বার হয় না কিন্তু জুয়েল-এ এসে সে-ও সুখী নয়। সে যত খেলা জানে, সব দেখাবার কোন সুযোগ নেই এখানে। রাইডিং বাদ, ডেন্টেল অ্যাক্ট নেই। হাতে বাঁশ রেখে ব্যালেন্সের সময় কিশোরী ওঠে বাঁশের আগায়। ঠিক মতন সে খেলা দেখাতে পারে না। বার বার ভুল করে। ঊষার ভয় হয় যে-কোন মুহূর্তে সে ঝপ করে মাটিতে পড়ে যেতে পারে।

তার পড়ে যাওয়া মানেই মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট, কেননা ঊষাকে ঘুরে-ঘুরে ব্যালেন্স করতে হয় বলে নেট থাকে না এই নম্বরের সময়।

কাল রাতের খেলায় কিশোরীর ভুলের জন্যেই পেট অনেকটা কুঁকড়ে ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হয়েছিল ঊষাকে। তার মাসেলের ওপর থেকে বাঁশ পিছলে যাচ্ছিল, আর একটু এদিক-ওদিক হলেই অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেত।

সকালবেলা উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিল ঊষার। পেটে ব্যথা, বমি আসছে থেকে থেকে, মাথা ঘুরছে। কোন রকমে উনুন ধরিয়ে রান্না চাপাল সে, পরে আবার শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে ঊষা তার মা-বাবা ভাই-বোন আর জামাইবাবুদের কথা ভাবছিল। কতদিন দেখা হয় না তাদের সঙ্গে!

ঊষার বাবা জানেও না যে সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে। কোহিনুর থেকে চলে আসবার সময় কাউকেই কোন খবর দেয়নি ঊষা—খবর দেবার মতন মনের অবস্থাও ছিল না তার।

পুষ্পরাজ যখন দিশাহারার মতন তাকে নিয়ে উঠেছিল সুন্দরমের ধর্মতলার

ফ্ল্যাটে তখন তার মনে হয়েছিল একবার বরানগরে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এলে হয়! কতটুকুই বা পথ! অশান্তি আর দুর্ভাবনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলেও খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাইরে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবার মতন একটা সুখ অনুভব করছিল ঊষা। সার্কাসের মানুষের কাছে এতদিনের অবসর কল্পনারও অতীত।

কিন্তু পুষ্পরাজ ঊষার মা-বাবার কাছে যেতে রাজী হল না। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে শুকনো গলায় বলেছিল, কোথাও চাকরি ঠিক হওয়ার আগে সে সময় নষ্ট করতে যেতে পারবে না। তা ছাড়া, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কুন্দনলাল কিম্বা তার কোন অনুচর তার নামে লাগিয়ে এসেছে ঊষার মা-বাবার কাছে-- তারা সেসব কথা তুললে মেজাজ খারাপ হবে পুষ্পরাজের, ঊষারও ভাল লাগবে না।

কোলের ওপর প্যাড নিয়ে খুব জোরে কলম চেপে ধরে একটা বড় চিঠি লেখবার চেষ্টা করছিল পুষ্পরাজ। লেখাপড়া বেশীদূর করেনি সে, লিখতে লিখতে অনেক কাটাকুটি করছিল, দু-তিনটে চিঠি অর্ধেক লিখে ছিঁড়ে ফেলে প্যাড কলম—সব সরিয়ে রেখে ঊষার দিকে তাকিয়ে তামিল বলার মতন উচ্চারণে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করল, "তবিয়ৎ ঠিক নেই হ্যায়?"

ঊষা তার যন্ত্রণাকাতর মুখ প্রসন্ন করে তোলবার খুব চেষ্টা করতে-করতে হাসল, "থোড়াসে চোট লাগ গিয়া কাল—"

"কেয়া হুয়া? কাল কুছ নেই বোলা?"

"নেই নেই, জাস্তি কুছ নেই—" মনে মনে বাংলার অশুদ্ধ হিন্দী তর্জমা করতে করতে ঊষা উঠে বসে বলল, "উ কিশোরী বহুৎ বোকা ছোকরী হ্যায় না, উসকো সাম্‌হাল দেনেকো টাইমমে হামরা পেটমে থোড়াসে চোট লাগ গিয়া—"

"পেটমে?" বিরক্তির কয়েকটা রেখায় মুখ বিশ্রীরকম তেতো-তেতো হয়ে উঠল পুষ্পরাজের। বিচলিত হয়ে সে ঊষার পাশে এসে দাঁড়াল, ইতস্তত না করে রূঢ় হাতে তার পেটের কাপড় সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক মহিনা হুয়া?"

লজ্জার একটা আভা ছড়িয়ে গেল ঊষার মুখে। তাড়াতাড়ি পেটের কাপড় নামিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখল কাছাকাছি কোন মানুষ আছে কি-না। পরে মাথা নিচু করে পায়ের আঙুল দেখতে-দেখতে আস্তে বলল, "পাঁচ মহিনা—"

ঠোঁটে আঙুল ঘষতে ঘষতে কবে ঊষার প্রসব বেদনা উঠবে তার হিসেব করে নিল পুষ্পরাজ এবং আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কোলের ওপর চিঠি লেখার প্যাড তুলে নিয়ে বলল, "টাইম বহুৎ কম। আউর কেতনা দিন নম্বর করনে সেকেগা তুম!"

হঠাৎ পুষ্পরাজের অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠার কী কারণ ঊষা বুঝল না। কোন অপরাধ না করলেও অন্যায় কাজ করার মতন একটা গ্লানি তার গলার ভেতরে ফেনিয়ে উঠছিল বলে সে তার পা দেখতে দেখতেই অস্ফুট স্বরে বলল, "লড়কা হোনেকা দিন তক হাম নম্বর করেগা।"

পুষ্পরাজ চিঠি লিখতে গিয়েও লিখতে পারল না, ঊষার কথা শুনে কলম দিয়ে কাগজের ওপর খসখস আঁচড় কাটতে কাটতে মোমের আলো নিবিয়ে ফেলার মতন ফুৎকারের ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করল, "ফুঃ!" পরে ঊষার পেটের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলল, "কেয়া বলতা তুম বেকার বাত! আউর দু-এক মহিনা বাদ কোম্পানী ছুট্টি দে দেগা তুমরা, নম্বর করনে নেই

দেগা—" সে একটু চুপ করে থেকে অসহায়ের মতন কলম কামড়ে ধরল, "কেয়া হোগা তব? রুপেয়া কা বহুৎ দরকার!"

পুষ্পরাজের হেঁয়ালীর মতন কথার অর্থ ঊষা বুঝতে পারল না। পেটের কোন ভার এখন অনুভব না করলেও, তার মন ভারী হয়ে উঠল—মুখও বিবর্ণ। বাইরে তাজা রোদ খেলছে, পুষ্পরাজের পিছনে তাঁবুর অপরিচ্ছন্ন কাপড়ের ওপর জ্যোতির মতন এক ফালি রোদ নেচে উঠছে। ঊষার গরম লাগছিল।

সে পুষ্পরাজের দুর্বোধ্য আশঙ্কা দূর করবার জন্যে আপন মনে কথা বলার মতন বলল, "রুপেয়া কা আউর কেয়া দরকার? হিঁয়া দো আদমী যো মিলতা—"

পুষ্পরাজ ঊষাকে বাধা দিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, "বহুৎ দরকার। তুমরা নম্বর বন্ধ হো যায়গা, হাসপাতালমে যানে পড়ে গা", সে তাকে সব কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘন ঘন হাত নেড়ে কথা বলছিল, "লেড়কা হোনেকা বাদ আউর দো-তিন মহিনা কাম নেই করনে সেকেগা তুম, চুপচাপ শো যানে পড়েগা—এক আয়া ভি রাখনে পড়েগা তব—"

বাইরে ফাল্গুনের হালকা রোদ খেললেও এখন ভিজে বাতাস গায়ে লাগার মতন অনুভূতি হচ্ছিল ঊষার। সে তার মা-বাবা আর ভাই-বোনদের কথা ভাবতে ভাবতে পুষ্পরাজের দুর্ভাবনা দূর করবার জন্যে বলল, "আয়াকা কুছ দরকার নেই। হামরা মা আকে বাচ্চা কো দেখে গা—"

পুষ্পরাজ বলল, "নেই আয়গা।"

"কাহে?"

পুষ্পরাজের একটা মনগড়া বিশ্বাস ছিল ঊষার মা-বাবা কিম্বা তার কোন আত্মীয়পরিজন তার সঙ্গে ঊষাকে দেখলে সুখী হবে না—তাদের সম্পর্কও স্বীকার করে নেবে না।

কুন্দনলাল তাদের বাড়ির লোকের মতন। ঊষার সঙ্গে সে যতই দুর্ব্যবহার করুক, তার মা-বাবা তা অন্যায় বলে মনে করতে পারেনি এবং তার ওপর আরও অনেক বেশী নির্ভর করতে চেয়েছিল। ঊষার ছোট দু বোন বেবি আর ডলির কোহিনুর সার্কাসে কুন্দনলালের ট্রুপেই এসে থাকবার কথা ছিল—সেকথা ঊষাই অনেকবার শুনিয়েছে পুষ্পরাজকে।

এসব কথা মনে এলেও এখন ঊষাকে কিছু বলতে ভাল লাগছিল না পুষ্পরাজের। সে সব চাপা দিয়ে অন্য কথা বলল, "আউর কেয়ারফুল হোকে নম্বর কর। অ্যাকসিডেণ্ট হোনেসে খানে নেই মিলে গা।"

"আরে, হাম কেয়া করে গা? হিঁয়াকা মাস্টার ভি আচ্ছা নেই হ্যায়। কুছ ট্রেনিং নেই দিয়া কিশোরীকো—"

পুষ্পরাজ আবার চিঠি লিখতে শুরু করেছিল, লিখতে লিখতেই ঊষা থামবার আগে হঠাৎ বলে উঠল, "কুন্দনলাল ভি একদম বুদ্ধু! কেয়া ট্রেনিং দিয়া তুমরা? জুত্তি পালিশ করনে আউর খানা পাকানে শিখলায়া। শালা বদমাশ!"

হিমে ভিজে ওঠার মতন মুখ ঊষার। আগেকার কথা সে মনে করতে চায় না। মাঝে মাঝে এমন কাটা-কাটা কথা এখনো তাকে কেন শোনায় পুষ্পরাজ, সে বুঝতে পারে না।

শরীরের সব যন্ত্রণা আয়ত্ত করে নিয়ে ঊষা উঠে দাঁড়াল, উনুনের কাছে গিয়ে দেখল রান্না কতদূর হয়েছে। একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ লাগছিল তার

নাকে। তরকারি পুড়ছে। তাড়াতাড়ি কড়ায় জল ঢালবার সময় আগুনের তাপ ঊষার মুখে লাগল। পোড়া তরকারিই সে খাওয়াবে আজ পুষ্পরাজকে—প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে যে কুন্দনলাল তাকে কিছুই শেখবার সুযোগ দেয়নি—রান্নাও না।

পুষ্পরাজের কথা যে ঊষার মনে লেগেছিল তা না ভেবেই সে কড়া মাস্টারের মতন আবার বলল, "ব্যাম্বু ব্যালেন্স বহুৎ পুরানা খেলা, তুমরা গলতি কা লিয়ে পেটমে চোট লাগা। দোসরা ক্যা কসুর মাত্ বলো—সামঝো?"

ঊষা কোন প্রতিবাদ করল না, পুষ্পরাজের কথার উত্তরও দিল না। তার ভিজে চোখ হঠাৎ পুষ্পরাজ দেখলেও কিছু বুঝতে পারবে না বলে সে ফোড়ন দিয়ে পিছন ফিরে অনেক সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

কুন্দনলালের কাছে অত্যাচার সহ্য করে কয়েকটা বছর যেমন করেই কাটাক ঊষা, সেখানে তার নিজেকে কখনো এমন নিঃসঙ্গ মনে হয়নি। সুখ আর দুঃখ এই সব অনুভূতির প্রভেদ তার কাছে ছিল না। তার দুঃখ-যন্ত্রণাকে সুখের মতন মনে করে হয়তো সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারত যদি না পুষ্পরাজ দুঃসাহসী হয়ে উঠে ভিন্ন আর এক ঋতুর স্বাদ জোর করে তার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিত।

পুষ্পরাজ কিছু পরে আবার বলল, "ব্যাম্বু ব্যালান্স বাচ্চালোগকা নম্বর। কুছ ক্রেডিট নেই হ্যায় উসমে। কমলা সার্কাসমে এক ছোকরী থা। তুমরা মাফিক—নেই, তুমরা সে থোড়া দুবলা। বহুৎ খপসুরৎ—" সে কী খেলা দেখাত তা ঊষাকে বলল পুষ্পরাজ।

ঊষা যেমন বাঁশের ওপর ছোট মেয়েকে তুলে ব্যালেন্সের খেলা দেখায় তেমন কমলা সার্কাসের সেই মেয়ে চালক আর মোটর বাইক সুদ্ধ মরণ গ্লোব তুলে নিত। গ্লোবের ভিতর শব্দ করে ঘুরত, ছোট মোটর বাইক, যে চালাত সে-ও একটি ছোট মেয়ে। দুর্ঘটনা ঘটেনি একদিনও। অবাক হয়ে গেছে দর্শক।

পুষ্পরাজের কথা শুনে মনে মনে খুব অবাক হয়ে গেলেও ঊষা মুখে কিছু প্রকাশ না করে বলল, "আচ্ছা মাস্টার হোনেসে সবকোই সব নম্বর করনে শেখতা। হাম বহুৎ জলদি-জলদি ট্র্যাপিজ শিখা নেই?"

নিজের প্রশংসা শুনে পুষ্পরাজ কিছু প্রসন্ন হয়ে বলল, "ই সার্কাস মে জাস্তি দিন খেলনেসে সব বিলকুল ভুল যায়গা। সব নম্বর পুরানা। ট্র্যাপিজ ভি সিঙ্গল, ই লোগ ক্রশ ট্র্যাপিজ কভি নেহি করে গা। মালিককা রূপেয়া জাস্তি নেই হ্যায়।"

পুষ্পরাজের নরম স্বর শুনে তার মন বুঝল ঊষা, এখন তার দিকে ফিরে আস্তে বলল, "কেয়া করে গা!"

"হিঁয়াসে ভাগনে পড়েগা—" জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করতে করতে উঠে দাঁড়াল পুষ্পরাজ, লুঙ্গির মতন করে সে ধুতি পরেছিল, তা আরও শক্ত করে বেঁধে নিল, একটা শার্ট পরে বলল, "তুমরা পেট মে বাচ্চা আকে সব গড়বড় কর দিয়া না—"

"হাম কেয়া করে গা!"

"চুপ যাও, কিস্সিকো ভি মৎ বোলো", পায়ে চটি গলাতে গলাতে পুষ্পরাজ বলল, "হাম বাহার যাতা, থোরা বাদ ওয়াপাশ আয়গা।"

"কাঁহা, রাধানাথবাবুকা রাউটিমে?"

পুষ্পরাজ বাইরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখ কুঁচকে কয়েক

মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল উষার দিকে। পরে ভারী গলায় বলল, "নেই, হাম বাজার যায়গা।"

পুষ্পরাজ বেরিয়ে যাবার পর একদিকে কাত হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল উষা। বেলা বাড়ছে। অনেক কাজ তার। সময় বড় কম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ম্যাটিনি শো-এর জন্যে তৈরী হতে হবে।

ফাল্গুনের হাওয়ার ঝলক পুষ্পরাজের অর্ধেক লেখা চিঠির ছেঁড়া টুকরো এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পা-টিপে-টিপে মানুষের আসার মতন শব্দ হচ্ছিল। স্নেহের একটা অনুভূতি এখন বড় কোমল করে তুলেছিল উষার মন। লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজের পেটে হাত বুলোতে বুলোতে কাগজের শব্দ শুনে সে হঠাৎ তা সরিয়ে নিচ্ছিল—বাইরে তাকিয়ে দেখছিল কেউ এদিকে আসছে কি না।

উষা জানে বেশী দেরী করবে না পুষ্পরাজ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। কাল রাতেই তার মদের বোতল খালি হয়ে গিয়েছিল। আজ কাছাকাছি কোন দোকানে সে নতুন বোতল কিনতে বেরিয়েছে।

ছেঁড়া কাগজের শব্দ না, আর কিছু পরে উষা এত সময় যাদের কথা ভাবছিল তারাই এসে দাঁড়াল তার সামনে। উষার তাঁবু চিনিয়ে দেয়ার জন্যে হারকু সাহেব নিজেই এসেছে তার মা আর বোনদের সঙ্গে।

হারকু সাহেব হেসে বলল, "এনারা বহুৎ দূর থেকে আপনার সাথে মিলতে এসেছেন, খানাপিনা না করে এখান থেকে যাবেন না। বসুন, মা বসুন। বস খুকুরা। বাজার মাস্টার ঠিক টাইমে খানা ভেজবে।"

হারকু সাহেবকে দেখে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়িয়েছিল উষা. তার কথা শুনে মৃদুস্বরে বলল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি যা-হয় করব—"

"না, তার কুছ দরকার নাই," হারকু সাহেব উষার পেটের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখেই বলল, "আপনার তবিয়ৎ ঠিক না, বেশী কাম করলে খেলা মারডার হয়ে যেতে পারে। আপনি চুপচাপ রেস্ট করবেন।"

হারকু সাহেবের কথা শুনে প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উষা। তার হাত-পা বুক—সব কনকন করে উঠছিল।

বেবী আর ডলি বসে পড়েছে খাটের ওপর, পা নাচিয়ে-নাচিয়ে দিদিকে দেখছে। উষার সিঁথিতে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা। বেবী আর ডলি তাদের জামাইবাবুকে দেখবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

হারকু সাহেব চলে যেতেই ঘোমটা খসে পড়ল মনোরমার। বাস থেকে নেমেই রাস্তার দোকান থেকে দুটো পান কিনে একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়েছিল মনোরমা, এখন একদিকে দাঁড়িয়ে তা চিবোচ্ছিল। তার মুখ শুকনো দৃষ্টিও অপ্রসন্ন। মনোরমাও পুষ্পরাজের অপেক্ষা করছিল।

"বস মা", কিছু পরে উষা বলল, "কেমন করে এলে এখানে, কে বলে দিল?"

"সুন্দরমবাবুর কাছে গেছিলাম, সে-ই বলল।"

উষা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোহিনূরে গেছিলে নাকি?"

"যাব না?" মনোরমা বেবী ডলিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধপ করে উষার নিচু খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে বলল, "এদের রাখবার কথা ছিল না তোর কাছে? এদের নিয়েই তো গেছিলাম—"

"আগে কেউ খবর দেয়নি তোমাদের?"

"দিয়েছিল, বিশ্বাস হয়নি।"

ঊষা বিরক্তি প্রকাশ করে একটু জোরে বলে উঠল, "কেন?"

মনোরমা চুপ করে থাকল কিছু সময়, জাবর কাটার মতন ঘসঘস করে পান চিবোল। একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, "পুষ্পরাজ কই?"

"নেই, বেরিয়েছে।"

"দেশে গেছে নাকি?" একটা সন্দেহ ফুটে উঠছিল মনোরমার চোখে। তার মনে হচ্ছিল ঊষা সব কথা ভাঙছে না তার কাছে, পুষ্পরাজের দোষ ঢাকবার জন্যে অনেক কথা লুকিয়ে যাচ্ছে।

মনোরমার কথা বলবার ধরন দেখে রেগে উঠল ঊষা, রুক্ষ স্বরে বলল, "দেশে যাবে কেন? নতুন চাকরি নিল না এ সার্কাসে? এই দেখ না তার সব জিনিসপত্তর—" একটু চুপ করে থেকে সে গলা নামিয়ে বলল, "দেশে গেলে তো আমিও যেতাম সাথে—"

ঊষা পুষ্পরাজের সঙ্গে কোহিনুর সার্কাস ছেড়ে চলে এসেছে শুনে প্রথম থেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল তার মা-বাবা। টাকা-পয়সার বড় অসুবিধা। অনেকদিন কিছুই পাঠায়নি ঊষা। তার বাবার শরীর খুবই খারাপ। ছোট দু মেয়ের খরচ আর কিছুতেই চালান যাচ্ছে না।

মনোরমা এসব কথা শুনিয়ে ঊষাকে বকাবকি করতে এসেছিল। হয় সে টাকা দিক সংসার খরচের, না দিতে পারলে বেবি আর ডলিকে রাখুক তার কাছে—তাদের খাওয়াক, খেলা শেখাক, যা খুশী করুক।

সেসব কথা প্রথমেই ঊষাকে বলল না মনোরমা। পুষ্পরাজের সঙ্গে কোহিনুর ছেড়ে এসে সে যে খুব ভুল কাজ করেছে তা তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "আর মানুষ ছিল না? কুন্দনলালের মতন মানুষ হয়—" ইচ্ছে করলেই যেন আবার পুরনো জায়গায় ঊষাকে ফিরিয়ে নেয়া যায় এমন মুখের ভাব করে কথা বলে যাচ্ছিল তার মা, "পুষ্পরাজের তিন-চারটে বউ আছে না? তোর সাথে সে কতদিন থাকবে? তোকে ফেলে একদিন পালিয়ে যাবে দেখিস—কী করবি তখন?"

মাকে অনেক দিন পরে দেখল ঊষা। সে ভেবেছিল মনোরমা তার নতুন তাঁবুর নিচে তাকে দেখতে পেয়ে মিষ্টি করে কথা বলবে প্রথম দিন, ঊষাও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের সংসারের সব খবর জেনে নেবে, বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে। এবং একটু আগে পুষ্পরাজের সঙ্গে কথা বলবার সময় যে ব্যথা জমে উঠেছিল তার মনে, তাকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল—সেসব ভুলিয়ে দেবে মনোরমা।

কিন্তু ঊষা আর স্থির থাকতে পারল না, এখানকার কোন মানুষ তার কথা শুনছে কি-না তা না ভেবেই তর্ক করার মতন মনোরমাকে খুব জোরে বলে উঠল, "কে তোমাকে বলেছে যে তার তিন-চারটে বউ আছে?"

ঊষার মেজাজ দেখে চুপ থাকল না মনোরমা। সে-ও জোরে বলল, "বলবে আবার কে? সার্কাসের সব লোক তো এ কথা জানে। কেরালা না কোথায় তার ছেলে-মেয়ে বউ নেই, বল?"

"চুপ, আস্তে—" ঊষার নাক থেকে সাপের মতন হিস হিস শব্দ উঠছিল, "তার একটা বউ থাক, দশটা বউ থাক, তা দিয়ে তোমার কী দরকার?"

"ও মা, দরকার নেই? বলিস কী রে ঊষা—" মনোরমা পান চিবোতে চিবোতে গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "তোর সব টাকা-পয়সা মেরে দিয়ে

সে তার বউগুলোকে পাঠাবে না? তাহলে তুই আমাদের দিবি কী? আমাদের পয়সার দরকার নেই?"

"তোমাদের দিইনি পয়সা?"

"কতদিন দিসনি বল তো? তোর বাপের কথা ভাবিস, বোনগুলোর কথা ভাবিস?" মনোরমা বেবীর হাত টেনে তাকে দাঁড় করাল, পিছনের দিকে ফ্রক তুলে তার জাঙিয়া দেখিয়ে বলল, "দেখ ছেঁড়া প্যান্ট পরে ঘোরে মেয়েটা। একটা ভাল জামা নেই জুতো নেই, কিচ্ছু নেই—"

"না থাক, আমি কী করব?"

"করবি না মানে?" ঊষার উত্তেজিত চোখ দেখতে দেখতে মনোরমাও উত্তেজনার ঘোরে বলল, "কারুর কথা ভাববি না তুই?"

"তোমরা কেউ ভেবেছিলে আমার কথা? কোহিনূর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলাম, কী করলাম—কতদিন কাজ ছিল না, পরের ঘাড়ে পড়েছিলাম—রাখ সে-খবর?"

মনোরমা হঠাৎ শান্ত স্বরে বলল, "কুন্দন কত সুখে রেখেছিল তোকে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি তো কে কী করবে বল?"

"কারুর কিছু করার দরকার নেই। তোমরা এলে কেন এখানে? আমি গিয়েছিলাম তোমাদের কাছে?"

মাথা হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল মনোরমার। পুষ্পরাজের হাতে পড়ে ঊষা কষ্ট পাবে বলেই সে প্রথম থেকে তাকে সতর্ক করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হল উল্টো। ঊষা রেগে গেছে। তার রাগ কখন পড়বে মনোরমা জানে না। সে রেগে থাকলে আসল প্রয়োজনের কথা মনোরমা বলতে পারবে না। বড় অভাব সংসারে, এখান থেকে শুধু হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়া চলবে না মনোরমার।

"ওরে ঊষা", কিছু পরে মনোরমা থেমে থেমে বলল, "যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেছে, একটু বুঝে শুনে চলিস। তোর টাকা তোর কাছেই রাখবি, বুঝলি?"

"এসব কথা তুমি আমাকে শোনাতে এলে নাকি মা?"

"না রে" মনোরমা শুকনো হেসে বলল, "তোর এখানে আসতে-যেতে প্রায় দু-টাকা খরচ। শুধু কথা শোনাবার জন্যে পয়সা খরচ করে কেউ এত দূরে আসে, বল?"

"তবে?"

"বুঝিস না?"

ঊষা বলল, "টাকা আমার নেই।"

মনোরমার মুখে এখন ঝাঁজের কোন প্রকাশ ছিল না, তার মনে ভাল-মন্দর কোন প্রভেদও ছিল না। ঈষৎ কাতর হয়ে সে বলল, "ওকথা বললে চলে নাকি রে ঊষা—"

"সত্যি বলছি মা, টাকা নেই।"

"মনে কিছু করিস না মা—" যেসব কথা শুভাকাঙ্ক্ষিনীর মতন রাগের ঝোঁকে অল্প আগে ঊষাকে শুনিয়েছিল মনোরমা এখন তা একেবারে ভুলিয়ে দেবার জন্যে খুব মিষ্টি করে বলল, "বড় অশান্তি, বড় অভাব। কখন কী বলি খেয়াল থাকে না। মেয়ে দুটোকে জিজ্ঞেস কর, খিদে পেয়েছে বললেই ওদের মারি। খেতে দিতে পারি না—" কিছু সময় খালি চোখে ঊষার দিকে তাকিয়ে

চুপ করে থাকল মনোরমা, পরে একটু ইতস্তত করে বলল, "ওদের তোর এখানে রেখে যাব বলে নিয়ে এসেছি—"

ঊষা চমকে উঠল, পুষ্পরাজের মেজাজের কথা ভাবতে ভাবতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না-না, এখানে না—"

"ওরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে, তুই রাখবি না?"

"এখন না মা। আমি ওর সাথে কথা বলে পরে বলব।"

মনোরমা খাটের ওপর পা তুলে ভাল করে বসল। ঊষার কথা শুনে আবার মাথার মধ্যে একটা চাপ অনুভব করছিল সে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে করতে মনোরমা বলল, "এলাম যখন, তখন আমিই না-হয় সব খুলে বলি পুষ্পরাজকে, সে কখন ফিরবে রে?"

ঊষার ইচ্ছে ছিল না যে আজই মনোরমার সঙ্গে পুষ্পরাজের দেখা হয়। ঊষাকে যেমন বলল মনোরমা পুষ্পরাজের কথা, তেমন হঠাৎ যদি তাকেও বলে তাহলে সে যে চুপচাপ সহ্য করবে না, ঊষা তা জানে। তার মা পরে যতই নরম স্বরে কথা বলুক, সংসারের দুঃখ-অভাবের কথা বলে বেবী ডলিকে এখানে রেখে যাবার চেষ্টা করুক, ঊষা এখনো তার ওপর অপ্রসন্ন হয়েই ছিল।

সে বলল, "তার ফিরতে দেরী হবে। তোমরা এখন যাও। তাকে আমি যা-হয় বলব খন।"

"তাড়িয়ে দিচ্ছিস?"

মনোরমার কথাই এই রকম, ঊষা ভাবল, নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হলে মানুষকে সে শুধু খোঁটা মারবার চেষ্টা করে। তাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়ার জন্যে সে বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা নতুন জায়গা, সব নতুন মানুষ। এখানে কাঁদুনি গেয়ে লাভ নেই—"

মনোরমা বলল, "তোর অনেক বদল হয়েছে, কী বলিস তুই আমাকে? এমন জানলে আসতাম না এতদূরে!"

ঊষা মনোরমার কথা শুনল না, তার সাদা রঙের ব্যাগ ট্রাঙ্কের ওপর থেকে তুলে দু-টাকার একটা নোট বের করে বলল, "এই নাও।"

"দু-টাকায় কী হবে রে, আর কিছু দে।"

"এখন যাও মা, আর নেই।"

অপ্রসন্ন মুখে মনোরমা দু-টাকার নোট ঊষার হাত থেকে নিয়ে বলল, "যাব কী রে, খাওয়ার কথা বলল যে!"

"বলুক, বললেই খেতে হবে! রাজী হলে কেন তুমি?"

ঊষার আশঙ্কা হচ্ছিল এখুনি এসে পড়বে পুষ্পরাজ আর তার মা বেবী ডলিকে রেখে যাবে এখানে—তাদের দেখতে আসবে প্রায়ই। এবং ওরা ঊষার আর পুষ্পরাজের সব কথা জেনে ফেলবে। সে তার মাকে কিছুই আর বলতে চায় না এখন।

মনোরমা আর বেবী ডলিকে এক রকম জোর করে ঠেলে তুলে দিল ঊষা। তাদের তার অচেনার মতন মনে হচ্ছিল, একেবারেই ভাল লাগছিল না। তাকে দেখতে, তার খবর নিতে এতদিন পরে আসেনি মনোরমা—কাজ গুছিয়ে নিতে এসেছে।

ঊষা জানে, মনোরমা আবার আসবে। কিন্তু আর কোনরকম সাহায্য সে তাকে করতে পারবে না। ঠিকই বলেছে পুষ্পরাজ, আর কিছু পরে অনেক টাকার দরকার হবে ঊষার। কে তাকে দেবে তখন! কে তাকে দেখবে।

বড় দেরী করছে পুষ্পরাজ। কে জানে সে রাধানাথবাবুর তাঁবুতে বসে মদ খাচ্ছে কি-না। নিঃসঙ্গ একটা মানুষের মতন উঁচু ট্রাঙ্কের ওপর একটা হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ঊষা। তার হাতের কাছেই মেরীর একটা বাঁধানো ছবি ছিল, কোলে যীশু। পুষ্পরাজ নম্বর করতে যাবার আগে এই ছবির সামনে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে কিছু সময়।

এখন ঊষাও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। তার চোখ খোলাই, শুধু একটা হাত পেটের কাছে এসে পড়েছিল। মনোরমার কথা ভাবছিল ঊষা। একটু ভুল বলেছে সে। তিন-চারটে নয়, একটাই বউ আছে পুষ্পরাজের—তার ছেলে-মেয়েও আছে।

ঊষা পুষ্পরাজের খাটের ওপর তার অর্ধেক লেখা চিঠি দেখল। পুষ্পরাজের মাতৃভাষায় লেখা। ছেঁড়া কাগজের কয়েকটা টুকরোও উড়ে এসেছিল ঊষার পায়ের কাছে। সে নিচু হয়ে সব তুলে নিল, মরা পোকার মতন কালো-কালো অক্ষর দেখল। এলোমেলো, দুর্বোধ্য। বাংলায় লেখা হলেও একটি বর্ণও চিনতে পারত না ঊষা। অক্ষর পরিচয় তার হয়নি।

মাঝে মাঝে এমন কাটাকুটি করে বড় বড় চিঠি লেখে পুষ্পরাজ। ঊষাকে বলে, কোহিনুরের মালিককে তাদের পাওনা টাকার তাগাদা দেয়। আজ ঊষার মনে হল তা ঠিক না। মিথ্যা কথা বলে পুষ্পরাজ। সে এই রকম চিঠি লেখে তার বউকে। কী লেখে তা জানবার একটা উৎকট আগ্রহ জাগল ঊষার। ব্লাউজ ফাঁক করে সে চিঠির ছেঁড়া সব টুকরো বুকের মধ্যে ফেলল, একটা কাগজে মুড়িয়ে প্যাডও হাতে নিল। এবং এক মুহূর্তও ইতস্তত না করে রাঘবনের তাঁবুতে যাবার জন্যে বাইরে এল।

নলিনী কিছু-কিছু লেখাপড়া জানে। প্র্যাকটিস শেষ করে ফিরে এসেছে রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়ে। ঊষা দূর থেকেই তাদের গলা পাচ্ছিল।

॥ উনিশ ॥

জুয়েল সার্কাস ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে নলিনীর। হয়তো এই ক্যাম্পেই হঠাৎ একদিন এসে পড়বে তার বাবা—রাঘবনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে কয়েকদিন থেকে বড় বিমর্ষ হয়ে আছে নলিনী।

রাঘবনের ট্রুপের প্রথম মেয়ে সে, পরে আসে শ্রীধরন। তারপর হেমলতা। সব শেষে রেবতী আর আমিনা। রাঘবন নির্দয়ের মতন মেরেছে নলিনীকে, না খেতে দিয়ে শাস্তি দিয়েছে অনেকদিন—তাহলেও তার ট্রুপের ওপর বড় মায়া নলিনীর। এখান থেকে চলে যাবার কথা মনে হলেই তার মন খারাপ হয়ে যায়।

একঝুড়ি বাসি কমলা লেবুর মতন তাঁবুর মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ছিল রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়েরা। এখন তাদের চুল রুক্ষ, শুকনো মুখ, হাতে-পায়ে ধুলো লেগে আছে। প্র্যাকটিসের পরেও ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই তাদের শরীরে। খুব খিদে পেলেও না খেয়ে খেয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সে কথা কেউ উচ্চারণ করবে না— শুধু ম্লান চোখে তাকিয়ে থাকবে নলিনীর দিকে, রান্না শেষ হওয়ার আশায় বসে থাকবে।

রান্নার আয়োজন করছে নলিনী। সকলের জন্যে খুব অল্প চাল তাকে বের করে দেয় রাঘবন। পেট ভরুক আর না ভরুক, সে যাকে যতটুকু দেবে তা-ই খেয়ে থাকতে হবে। রাঘবন কারুর ওপর অসন্তুষ্ট হলে খাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বলে উঠবে, "আজ তোর খাওয়া বন্ধ।"

ময়লা জামা-কাপড় একটা বালতির মধ্যে জড়ো করছে হেমলতা। শ্রীধরন রাঘবনের কালো ভারী জুতোয় কালি লাগিয়ে জোরে জোরে ব্রাশ করছে। আমিনা আর রেবতীর বয়স কম, প্র্যাকটিস করে তাঁবুতে ফিরে এসেও রাঘবনের হুকুম মতন ছোট ছোট বল হাতে নিয়ে তারা জাগলিং করে যাচ্ছে।

"এ নলিনী", একটা চিঠি পড়তে পড়তে কড়া স্বরে রাঘবন বলল, "তোর বাপকে আজ লিখে দিলাম, নিয়ে যাক তোকে। আমি নতুন মেয়ে নিয়ে আসব।"

"আমি যাব না মাস্টার।"

"না, যাবি না", মুখ বিকৃত করে চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে রাঘবন বলল, "তোর বাপকে চিনিস না তুই? খালি টাকা আর টাকা! টাকা ছাড়া সে আর কিছু জানে নাকি?"

মশলার একটা কৌটো খুলতে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল নলিনী। তার দাঁত বড় সুন্দর। নকলের মতন। কথা বলবার সময় নলিনীর দাঁত ঝকমক করে উঠল, "মাস্টার, তুমি বাবাকে টাকা পাঠাও না?"

"জানিস না তুই?" এত সময় আস্তে কথা বলছিল রাঘবন, এখন চীৎকার করে উঠল, "যখনই চায় তখনই পাঠাই।"

"তবে আমাকে নিয়ে যেতে চায় কেন?" নলিনী মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলল, "নতুন সার্কাসে একা একা আমি কাজ করব না।"

"নতুন সার্কাসে তোকে দিয়ে মজা বুঝুক তোর বাবা! আমিও দেখব কে কত টাকা দেয়!"

"বাবা এলে আমি বলব, আমি যাব না।"

রাঘবন শুকনো হাসল, পরে রুক্ষ স্বরে বলল, "মাসে তিরিশ টাকা দিতে চাইলাম, রাজী হল না তোর বাপ। বলে, মেয়ে বড় হয়েছে, দেখতে ভাল, তিন চারটে নম্বর করে—আড়াই শো টাকা না দিলে মেয়েকে রাখব না তোমার ট্রুপে—"

নলিনী বাধা দিয়ে বলল, "তুমি যা-ই দাও মাস্টার, তুমি আমাকে খেলা শিখিয়েছ—"

"সে সব কথা বুঝবে তোর বাপ?" আমিনার হাত থেকে একটা বল পড়ে গিয়েছিল, তা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এসেছিল রাঘবনের পায়ের কাছে।

সে আমিনার গালে জোরে একটা চড় মেরে নলিনীর দিকে ফিরে বলল, "তোর খাওয়ার খরচ নেই? জামাকাপড়ের খরচ নেই? আমিও দেখব তিরিশ টাকার বেশী কোথা থেকে পায় তোর বাপ! হুঃ, আড়াই শো টাকা!"

নলিনীর কাছে তিরিশ টাকা যা, আড়াই শো টাকাও তা-ই। যেখানেই তাকে নিয়ে যাক তার বাবা, সে খুশী হবে না। রাঘবন তাকে যত কম খেতে দিক, এখানে সে খেতে পায়। অন্য জায়গায় এমন খাওয়া জুটবে কিনা, তা সে জানে না। তা ছাড়া এখানে সকলেই তাকে ভালবাসে। হেমলতা শ্রীধরন আমিনা রেবতী তার আপনার লোকের মতন। এদের ছেড়ে, এই সার্কাস ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবলেই মুখ শুকিয়ে আসে নলিনীর।

রাঘবন বলল, "আমি ডাকঘরে যাচ্ছি। এই যে, তোর বাপের চিঠি আজ ছাড়ব।"

"না, মাস্টার।"

"চুপ নলিনী", রাঘবন ধমক দিয়ে বলল, "তোর বাপ এলে যা-হয় বলবি। তোদেরও চিনি আমি। সব সমান বদমাশ। বাপের সামনে মুখে কথা ফোটে কি না আমিও দেখব।"

নলিনী খুব করুণ করে বলল, "আচ্ছা।"

যত কথা এখন রাঘবনের সঙ্গে বলল নলিনী, তত কথা বলবার সাহস আর কারুর নেই। নলিনীরও আগে ছিল না, এখন চলে যাবার কথা ওঠে বলেই তার সাহস বেড়েছে।

রাঘবন পোস্ট অফিসে বেরিয়ে যাবার পর কারুর সঙ্গে আর কথা বলল না নলিনী, চুপচাপ রান্না করতে থাকল। আমিনা আর রেবতীর হাতে বল নাচছে। ঘষ ঘষ করে জুতো ব্রাশ করছে শ্রীধরন।

হেমলতা তার বালতি হাতে তুলে বাইরে যেতে গিয়েও গেল না, নলিনীর পাশে এসে বলল, "আমাকে কবে আমার বাবা নিয়ে যাবে, জানি না। নলিনী, তুই যেতে চাস না কেন?"

নলিনী আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "মাস্টারকে দেখতে পাব না, তোদের কাউকে দেখতে পাব না, কোথায় যাব!"

"মা-বাবার কাছে থাকবি, তোর ভাই-বোনদের দেখবি।"

নলিনী রান্না করতে করতে হাসল, "বাড়িতে রাখবার জন্যে বাবা আমাদের নিয়ে যাবে নাকি ভাবছিস? কেন দিয়েছে সার্কাসে জানিস না? বাড়িতে খাওয়া নেই রে হেম!"

এত সময় হেমলতার শুধু তার বাড়ির কথা মনে হচ্ছিল, অভাবের জন্যে তাকে যে সার্কাসে আসতে হয়েছে তা সে ভুলে গিয়েছিল। এখন আবার সব মনে হল হেমলতার। সে একটা নিশ্বাস ফেলে পলকে একবার শ্রীধরনকে দেখে নিল।

এ সময় রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়েরা কিছু অসাবধান, হালকা কথা বলে হাসাহাসি করে। আজ হেমলতার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল শ্রীধরন। খিদিরপুর ক্যাম্পে তার সঙ্গে শেষবার সে কথা বলেছে, শ্রীধরন অনেকবার চেষ্টা করলেও মুখ ঘুরিয়ে সরে গেছে হেমলতা—একটাও কথা বলেনি।

রাঘবনের জুতো পালিশ করবার পরে শ্রীধরন নিচু হয়ে দেখল চকচকে চামড়ায় মুখ দেখা যায় কিনা, তারপর হেমলতার কাছে এসে বলল, "এ হেম, আয়না চাই?"

হেমলতা শ্রীধরনের কথার উত্তর দিল না, সে বেরিয়ে যাচ্ছিল—ইতস্তত করল না শ্রীধরন, জুতো খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে তার হাত থেকে বালতি কেড়ে নিয়ে বলল, "আমার কথা শুনতে পাস না?"

"নলিনী", হেমলতা চীৎকার করে উঠল, "ওকে বল আমার বালতি দিয়ে দিতে।"

"দেব না, যাঃ!"

"আমার কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে, মাস্টার আমাকে বকবে—"

শ্রীধরন হঠাৎ স্বর নামিয়ে নিল। হেমলতার বালতি ছেড়ে দিয়ে তার একটা

হাত শক্ত করে ধরে বলল, "হেম জানিস, তুই আমার সঙ্গে কতদিন কথা বলিস নি?"

হেমলতা কিছু বলবার আগেই রান্না করতে করতে নলিনী বলল, "কেন তুই ওকে মার খাওয়ালি? খিদিরপুর ক্যাম্পে ওর নামে মাস্টারের কাছে লাগিয়েছিলি, মনে নেই?"

হেমলতার হাত ছেড়ে দিল শ্রীধরন, বিমূঢ় হয়ে গেল। সবই মনে আছে শ্রীধরনের। কিন্তু হঠাৎ তার কী হয়েছিল সেদিন তা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। রাঘবনের কাছে সে অনেক মার খেয়েছে, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে—মার খাওয়ার ভয় তার খুব বেশী নেই। খিদিরপুর ক্যাম্প থেকে চলে আসবার দিন যেখানে তাদের থাকতে বলে গিয়েছিল রাঘবন সেখান থেকে প্রজাপতি ধরবার জন্যে তাকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হেমলতা। রাঘবন তাদের ঠিক জায়গায় দেখতে না পেয়ে খুব রেগে গিয়েছিল। শ্রীধরন হঠাৎ তাকে বলে দিয়েছিল, সে জায়গা ছেড়ে যায়নি, হেমলতা তাকে অন্য দিকে যেতে বলেছিল।

হেমলতার দিকে এখন তাকাতে পারল না শ্রীধরন, নলিনীর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে দোষ স্বীকার করল, "নলিনী, আমি হেমের নামে মাস্টারের কাছে লাগাইনি, তুই বিশ্বাস কর। আমার মুখ থেকে সত্যি কথাটা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল—"

হেমলতা রেগে বলে উঠল, "কী সত্যি কথা? তুই চুপ করে থাকলেই পারতিস—"

"হেম!"

"তোর সঙ্গে আমি কথা বলব না, কখখনো না। তুই ভীতু, তুই আবার আমাকে মার খাওয়াবি—"

"না হেম, এবার থেকে আমি নিজে মার খাব—তুই দেখিস", শ্রীধরন একটু চুপ করে থেকে বলল, "সেদিন আমি যদি জানতাম যে মাস্টার তোকে অত জোরে মারবে—"

"না, জানতিস না? মাস্টার কখনো আস্তে মারে?"

হেমলতা অনেকদিন পর আজ আবার শ্রীধরনের সঙ্গে কথা বলছে বলে তার স্বরে একটা আবেগ থরথর করে উঠছিল। রাঘবন শ্রীধরনকেও যে হেমলতার চেয়ে বেশী জোরে অনেকবার মেরেছে তা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে সে বলল, "হেম, তুই কথা বলিস না বলে মন ঠিক নেই আমার, খেলায় রোজ ভুল হয়ে যায়, মাস্টার কত মারে, দেখতে পাস না?"

"বেশ করে।"

"বলবি তো। আমি মার খেলে তোর খুব মজা লাগে, না?"

শ্রীধরন হেমলতার বালতি ওপরে তুলে পরেই আবার খুব জোরে তা নিচে ফেলল।

"তোর মজা লাগে, তুই ভীতু!"

শ্রীধরন খুব জোরে বলল, "না। হেম, মাস্টার আমাকে মারুক, মারতে মারতে মেরে ফেলুক—আমি তোর নাম আর কখনো করব না, তুই দেখিস!"

শ্রীধরন যত জোর দিয়েই বলুক, তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না হেমলতা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তার দিকে, তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে হাসল। তারপর বালতি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে

বাইরে কলের কাছে গেল।

শ্রীধরন ভাবছিল সে-ও যাবে কি না তার সঙ্গে সঙ্গে। কলের কাছে এখন কেউ নেই, রোদও না। চার পাশ ছায়ায় ভরে গেছে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলল শ্রীধরন। তার হাতে জুতোর কালি লেগে আছে। সে হাত সামনে মেলে কলের দিকে যাচ্ছিল। হেমলতা কিছু জিজ্ঞেস করলে সে তাকে তার কালি লাগা হাত দেখিয়ে বলবে, তার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আসেনি—হাতের ময়লা ধুয়ে ফেলতে সেও কলের কাছে এসেছে।

নলিনীর সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। অল্প রান্না, শুধু ডাল ভাত—ডালের মধ্যে লঙ্কা পেঁয়াজ আর দু-একটা আলু। রাঘবন থাকলে মাঝে মাঝে বেশী করে নুন ছিটিয়ে দেয়—ছেলেমেয়েরা কম খায় তাহলে - ওবেলার জন্যে কিছু বাঁচিয়ে রাখা যায়।

এখনো হাতে বল নাচাচ্ছে আমিনা আর রেবতী। তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল নলিনী। রাঘবন না ফিরে আসা অবধি তারা থামতে পারবে না, খেতেও পাবে না কেউ—যাকে যেমন ইচ্ছে ভাত কিংবা রুটি খেতে দেবে রাঘবন।

"নলিনী", কিছু পরে বাইরে দাঁড়িয়ে ঊষা ডাকল। ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল সে, রাঘবন থাকলে ঢুকত না—নলিনীকে ডেকে নিয়ে যেত তার তাঁবুতে।

নলিনী ঊষাকে দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল, তার ডাক শুনে বাইরে এসে হেসে বলল, "কী?"

"মাস্টার কই?"

"ডাকঘরে গেছে। এখুনি আসবে। কিছু দরকার আছে?"

"না না", খুব মিষ্টি করে হাসল ঊষা। তার বুকের মধ্যে পুষ্পরাজের চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো খচখচ করে উঠছিল, তা অনুভব করতে করতে সে বলল, "দরকার আমার তোমার সাথে।"

"কী দরকার?"

কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ঊষা, অল্প কাত হয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে দেখল পুষ্পরাজ ফিরে আসছে কিনা। পরে খুব নিচু স্বরে নলিনীকে বলল, "কিছু কাজ আছে তোমার এখন?"

"না।"

"আমার রাউটিতে যাবে?"

নলিনী হেসে মাথা নাড়ল, "না, মাস্টার এসে পড়লে বকবে," এখন রান্না হয়ে গেছে, বাইরে যেতে পারে না নলিনী। সে না থাকলে মুঠো মুঠো ভাত চুরি করে খাবে রেবতী আর আমিনা। খাবার সময় কম ভাত দেখলে রাঘবন তাকেই বকবে। এসব কথা ভেবে খুব ইচ্ছে করলেও নলিনী ঊষার তাঁবুতে যেতে পারল না।

এখনো ইতস্তত করছিল ঊষা। তার ভয় হচ্ছিল, লজ্জা হচ্ছিল। একবার ভাবল কাকে কী লিখেছে পুষ্পরাজ সে সব তার জানবার দরকার নেই, চুপচাপ আবার তাঁবুতে ফিরে গেলেই হয়। হয়তো এখন ফিরে এসেছে পুষ্পরাজ, কে জানে!

কিন্তু কৌতূহল বেশী সময় দমন করে রাখতে পারল না ঊষা, রাঘবনের তাঁবুর ভেতরে ঢুকে নলিনীকে জিজ্ঞেস করল, "লেখাপড়া জান নলিনী, পড়তে পার?"

"আমার ভাষা পড়তে পারি।"

চিঠি লেখার যে প্যাড কাগজে মুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ঊষা তা নলিনীর হাতে দিয়ে বলল, "এসব কী লেখা?"

"এ তো আমার ভাষা।"

ঊষা অধীর হয়ে বলল, "কী লেখা আছে, পড় না?"

প্রথমে অস্ফুট উচ্চারণে আপনমনে পুষ্পরাজের চিঠি পড়ল নলিনী, পরে ঊষার দিকে তাকিয়ে বলল, "বলব?"

"হ্যাঁ। কাকে লিখেছে, কোহিনুর সার্কাসের মালিককে?"

"না না", নলিনী হাসল, "কে লিখেছে চিঠি?"

ঊষার আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য ছিল না, সেও নলিনীর পাশে দাঁড়িয়ে প্যাডের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "পড়।"

চিঠি শেষ হয়নি। আরও অনেক লিখবে পুষ্পরাজ। কিন্তু আর কিছু জানবার দরকার নেই ঊষার। অসমাপ্ত চিঠি থেকে সে যেটুকু জানতে পারল তা-ই অনেক। সব বুঝে গেছে নলিনী। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল ঊষার। আগে যদি সে বুঝতে পারত এসব কথা পুষ্পরাজ লিখবে তার বউকে তাহলে ঊষা আসত না নলিনীর কাছে। এখন কেমন করে এখান থেকে নিজের তাঁবুতে ফিরে যাবে তা ভাবতে পারছিল না বলেই সে জড়ের মতন দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রিয়াপেট্টা অর্থাৎ প্রিয়তমা—এক-একটি কথার অর্থ ঊষাকে বুঝিয়ে পুষ্পরাজের অর্ধেক লেখা চিঠি পড়ে দিয়েছে নলিনী। পুষ্পরাজ তার বউকে লিখেছে, খুব গোলমালের মধ্যে ছিলাম, অনেকদিন তোমাকে খবর পাঠান হয়নি। খুব ভাবনা করছ নাকি? আমি ভাল আছি। ভাবনা কর না।

একটা বোকা মেয়ের জন্যে আমাকে কোহিনুর সার্কাস ছাড়তে হয়েছে। এখন আমি তার দেখাশোনা করছি। কুন্দনলাল নামে একটা বদমাশ লোকের সঙ্গে ঊষা থাকত। একদিন সে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। তখন কুন্দনের সঙ্গে খুব ঝগড়া হয় আমার। ঊষার পেটে বাচ্চা আছে। কোথায় যাবে বেচারী। আমি তাকে ট্র্যাপিজ শিখিয়েছিলাম বলে সে আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করে। এখন জুয়েল সার্কাসে ঊষা আমার ট্রুপেই আছে। সে যা মাইনে পাবে সবই আমার। আমি এখন থেকে বেশী টাকা পাঠাব তোমাদের। ঊষার দেখা-শোনা আর বেশী দিন করব না। তার মন একটু ঠিক হলেই তাকে তাড়িয়ে দেব—

চিঠির প্যাড আবার কাগজে মুড়িয়ে নিতে ঊষার অনেক সময় লাগল। সব জেনে গেছে নলিনী তাহলেও তার দিকে তাকিয়ে হাসল ঊষা, খুব আস্তে বলল, "সব মিথ্যা।"

নলিনী বলল, "তোমার বাচ্চা হবে নাকি?"

"দূর, না।"

কিছুদূরে কলের কাছে জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে খেলা করছে হেমলতা আর শ্রীধরন। ওদের ঝগড়া একেবারেই মিটে গেছে। তাদের দেখতে দেখতে নলিনী ভাবল ঊষার চিঠি পড়ে দিয়ে সে ভুল করেছে, তাকে সব কথা না বুঝিয়ে দিলেই হত।

ঊষা আর একটাও কথা বলল না নলিনীর সঙ্গে, কোনদিকে তাকিয়ে দেখল না, দিনের আলোয় চলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। পেটে বড় যন্ত্রণা,

মাথাও ঘুরছে। চিঠি লেখার প্যাডটা গরম লোহার মতন তার হাতে লাগছে। ঊষা নিজের তাঁবুতে ফিরে এল।

তারও আগে ফিরে এসেছিল পুষ্পরাজ। ঊষা দেখল বিছানা বালিশ উল্টে সে তার চিঠি লেখার প্যাড খুঁজছে। ঊষা এখন সেটা লুকিয়ে রাখবার কোন চেষ্টা করল না, পুষ্পরাজের দিকে তা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই লেও।"

পুষ্পরাজ ঊষার হাত থেকে প্যাড কেড়ে নিয়ে আগে দেখল তার চিঠি ঠিক আছে কি-না, পরে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল "কাঁহা গিয়াথা ?"

ঊষা তাকিয়েছিল পুষ্পরাজের দিকে। তার দৃষ্টিতে ব্যথা ছিল, ঝাঁজ ছিল এবং একটা অবিশ্বাস তার দেহকে ট্র্যাপিজের মতন শূন্যে দুলিয়ে দিচ্ছিল। মিথ্যা কথা বলবার আগে সে এক মুহূর্তও ইতস্তত করল না, পুষ্পরাজের কথার উত্তরে বেশ স্পষ্ট করেই বলল, "যমুনাকা রাউটিমে গিয়াথা।"

"হামরা প্যাড লেগিয়া কেঁও?"

"মাকো চিঠ্‌টি লিখনে কা লিয়ে—" একবার যখন মিথ্যা কথা বলতে পেরেছে পুষ্পরাজকে তখন আবার বলতে বাধল না ঊষার এবং দরকার হলে সে আরও বলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকল।

পুষ্পরাজ কিছু নরম হয়ে বলল, "দোসরা কা রাউটিমে যানা ঠিক নেই হ্যায়, এইসা মৎ যাও—"

তাকে বাধা দিয়ে ঊষা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সে নিজে যায় কেন, কিন্তু তার আগেই হারকু সাহেব আবার এল, সঙ্গে দুজন চাকর—তাদের হাতে খাবারের ছোট বড় থালা। ঊষার মা আর বোনদের খাওয়ার কথা বলেছিল হারকু সাহেব, এখন তাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে।

হারকু সাহেব তাঁবুর মধ্যে ঊষার মা আর বোনদের না দেখতে পেয়ে কাছাকাছি অন্যান্য তাঁবু দেখতে দেখতে বলল, "আপনার মা আউর খুকুরা কোথা গেল?"

পুষ্পরাজ হারকু সাহেবকে দেখে হাসতে হাসতে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, এখন অবাক হয়ে গেল, "কৌন?"

"এনার মা এল, খুকুরা এল। আমি তাদের জন্যে ইসপেসল্ খানা তৈয়ার করবার অর্ডার দিলাম—"

পুষ্পরাজকে ঊষা এখনো বলবার সুযোগ পায়নি যে একটু আগে তার মা বেবি আর ডলিকে নিয়ে এসেছিল। হারকু সাহেব তাদের জন্যে খাবার না নিয়ে এলে তার মার কথা পুষ্পরাজকে বলত না ঊষা, চুপচাপ থাকত।

সে খুব আস্তে বলল, "মা চলে গেছে।"

"কেন গেল? আমি খানা খেয়ে যেতে বললাম—"

ঊষা হঠাৎ ভাবতে পারল না কী বলবে হারকু সাহেবকে। তার বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। এবং এখনো পুষ্পরাজের চিঠির এক-একটি অক্ষর তার মনে কাঁটার মতন বিঁধছিল বলে সে কেঁদে উঠতে চাচ্ছিল।

"তুমরা মা আয়াথা?" বিস্ময় প্রকাশ করার মতন পুষ্পরাজ জিজ্ঞেস করল।

"হাঁ।"

"এতনা জলদি গিয়া কেঁও?"

ঊষা হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে অনেক ভেবে বলল, "মা আবার আসবে। বাবার শরীর খুব খারাপ তাই বেশীক্ষণ থাকতে পারল না—"

"খানা কী হবে তবে?"

"আপনারা খাবেন।"

"হাঁ-হাঁ," হারকু সাহেব হেসে বলল, "আমার খাওয়া ফিনিশ। আপনারা দুইজনে চালান।"

চাকর দুজন মাটিতে থালা নামিয়ে রাখল। হারকু সাহেব ইচ্ছে করেই এদের সঙ্গে খেল না। এখন সে রঘুনাথের তাঁবুতে যাবে। শিবনাথ তার কাছে যা-যা লাগিয়েছে সব শুনে নেবে সে। তারপর তাকে নিজের কথা বলবে।

হারকু সাহেব চলে যাবার পর স্থির হয়ে থাকতে পারল না পুষ্পরাজ, ঊষার খুব কাছে এসে তাকে গালাগাল করার মতন কর্কশ স্বরে বলল, "তুমরা মা আয়াথা, হারকু সাহেব খানা ভেজ দিয়া—তুম হামরা কুছ নেই বলা কেঁও? ই ক্যায়সা বাত?"

ঊষা সরে গেল, পুষ্পরাজের চিঠির প্যাড নিজের চোখের সামনে তুলে ধরে সে-ও ঝগড়া করার মতন বলল, "তুম নেই থা, হাম ক্যায়সে বোলেগা?"

"হাম নেই রহনেসে হারকু সাহেব কেঁও আতা হামরা রাউটিমে?" ঊষার হাত থেকে চিঠির প্যাড কেড়ে নিয়ে পুষ্পরাজ বলল।

"হ্যাম কেয়া জানে!"

"তুম বোলায়া থা?"

ঊষা পুষ্পরাজের কথার উত্তর দিল না। তার ক্ষুধাতৃষ্ণা সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। এত পরে ঊষার মনে হল অনেক দূর থেকে অনেক পরে বেবী ডলিকে নিয়ে এখানে এসেছিল তার মা, সে তাদের এক ফোঁটা জলও দেয়নি—নিষ্ঠুরের মতন তাড়িয়ে দিয়েছে।

এখন তাদের কথা ভেবে ঊষার কান্না পাচ্ছিল।

॥ কুড়ি ॥

দুএকদিন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু-কিছু চেয়ার খালি ছিল; গ্যালারিতেও জায়গা পড়ে ছিল অনেক, সব টিকিট বিক্রি হয়নি। হতাশ হয়েছিল রঘুনাথ। শিবনাথের ওপর আরও রেগে গিয়েছিল হারকু সাহেব। এত কাছাকাছি ক্যাম্প করলে লোকসান তো হবেই। খিদিরপুর থেকে টালিগঞ্জে আসবার কী দরকার ছিল! যদি এ ক্যাম্পে লোকসান হয় তাহলে শিবনাথের জন্যেই হবে। এখানে আসবার জন্যে তারই উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী।

এসব কথা তুলে রঘুনাথের সঙ্গে একটা আলোচনা করবার সুযোগ খুঁজছিল হারকু সাহেব—নিজের দোষ কাটিয়ে সে-রাতের অপমানের শোধ নিতে চাচ্ছিল সকলের সামনে শিবনাথকে অপদস্থ করে।

কিন্তু সুযোগ এল না। মানুষ আসতে লাগল হু-হু করে। একসঙ্গে এত রকমের মানুষ আর কখনো দেখেনি জুয়েল সার্কাসের খেলোয়াড়রা। সুন্দর, বিচিত্র এক-একটি মুখ। দামী এসেন্সের গন্ধ। খোঁপার বাহার। কত রকমের শাড়ির ঝলমলানি! খেলা দেখাবার সময় খেলোয়াড়রা চারপাশে তাকিয়ে নেয়, তৃপ্তির একটা রেশ নতুন উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের মনে। আরও বেশী সময় নিয়ে খেলা দেখাবার ইচ্ছায় তারা নিখুঁত নম্বর করে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী টাকা আর কোন ক্যাম্পে তুলতে পারেনি

রঘুনাথ দাস। টালিগঞ্জের জমি নেয়া হয়েছে মাত্র এক মাসের জন্যে। মনে মনে লাভের হিসেব করতে করতে রঘুনাথ ভাবল, এখানে জুয়েল সার্কাস তিন-চার মাস থাকলেও ভীড় কমবে না।

চাঁদনী আর সুরেযের বাকি টাকা কাল সন্ধ্যায় শোধ করে দেয়া হয়েছে। আর যত ধার আছে তা-ও কিছু-কিছু মিটিয়েছে রঘুনাথ। তার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে এই ক্যাম্পেই ভারী ঋণের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে। তিন মাসের জন্যে এখন এ জমি পাওয়া যাবে কি-না রঘুনাথ জানে না, পাওয়া গেলে তার সব ধার সে শোধ করে দিতে পারবে।

জুয়েল সার্কাসের মালিক রঘুনাথ, সে খেলোয়াড় নয়। শুধু হাততালি শুনে তার মন ভরে না। লোকসান হলে যেমন তাকে চড়া সুদ দিয়ে টাকা ধার করে রোজকার খরচ মেটাতে হয় তেমন লাভ হলে সার্কাস আরও বড় করে তোলবার কথাও তাকে ভাবতে হয়। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু-কিছু সঞ্চয়ের কথাও তার মনে হয়। লিলুয়ার বাড়িতে আরও দু-একটা ঘর সময় থাকতে-থাকতে তুলতে হবে—ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে।

টালিগঞ্জের ক্যাম্পে দু-চারদিন কেটে যাওয়ার পর একা-একা বিমর্ষ হয়ে বসে থাকবার কথা নয় রঘুনাথের। যদিও সে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে, দামী ধুতি লুটিয়ে পড়েছে তার নতুন লাল চটির ওপর, তাহলেও রঘুনাথের শিরা বড় দুর্বল। ভীত অস্থিরচিত্ত একটা মানুষের মতন ঘন ঘন সিগ্রেটে টান দিয়ে সে যেন শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল।

রঘুনাথের তাঁবু এখন খালি। আজ খুব ভোরে যশোদা ছেলেমেয়েদের নিয়ে লিলুয়ায় চলে গেছে। সার্কাসের গাড়ি নিয়ে সুবলবাবু তাদের পেঁাছে দিতে গেছে—এখনো ফিরে আসেনি। রঘুনাথ জানে, যশোদা শিগগির আর কোন ক্যাম্পে আসবে না—তার দাদা কৈলাসকে লিলুয়ার বাড়িতে ডেকে রঘুনাথের নিন্দে করবে এবং হঠাৎ এক রাতে তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবে এই ক্যাম্পে—রঘুনাথের তাঁবুতে কোন মেয়ে আছে কি-না তা জানবার জন্যে।

কয়েকদিন থেকেই রঘুনাথের সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিল যশোদা। সে-রাতে শিবনাথ এসে কয়েকবার আস্তে ডেকেছিল রঘুনাথকে—তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হারকু সাহেবের তাঁবুতে। যশোদা সব শুনেছিল, সব দেখেছিল। শিবনাথের সঙ্গে রঘুনাথ যখন কিছু দূরে চলে গেল তখন আস্তে আস্তে যশোদাও বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। অন্ধকারে এবং ঘুম চোখে স্পষ্ট করে কিছু না দেখতে পেলেও সে দেখেছিল হারকু সাহেবের তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যা বোঝবার তা বুঝে নিয়েছিল যশোদা। তাঁবুতে ফিরে পাগলের মতন ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের টেনে-টেনে দূরে সরিয়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করছিল রঘুনাথের। এবং সে ফিরে আসতেই তাকে শুতে দিল না যশোদা, তার জায়গায় বসে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল, শুনি?"

মধ্যরাতে যশোদার গলার স্বর বড় তীক্ষ্ণ, তা ভেসে যাচ্ছিল অনেক দূরে অবধি। সন্ত্রস্ত এবং বিরক্ত হয়ে যথাসম্ভব আস্তে রঘুনাথ বলল, "চুপ যশো—"

"উঃ, হুমকি মারা হচ্ছে", যশোদা মাথা দোলাতে-দোলাতে উঠে দাঁড়াল, রঘুনাথের কাছে এসে আরও জোরে কথা বলল, "আমাকে গেরাহ্যি কর না,

আমার চোখের ওপর অন্যের রাউটিতে মেয়েমানুষ আনিয়ে ফুর্তি মার—এত বুকের পাটা!"

নিজের ক্ষমতা, এমন কি তার অস্তিত্বের কথাও ভুলে যাচ্ছিল রঘুনাথ। অনেক রাতে যশোদার সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেকে ছোট একটা পোকার মতন মনে হচ্ছিল, যশোদা যেন তাকে তার ভারী পায়ের চাপে শেষ করে দিতে পারে।

অন্তিম মুহূর্তে মানুষের গলা থেকে যেমন কাতর স্বর ওঠে তেমন করে রঘুনাথ বলল, "ঝুট বাত আমাকে শুনাবে না। যা খুশি হবে তা বলবে না—"

"বলব না মানে? একটু লাজ হল না তোমার? মনে ভেবেছিলে আমি নাক ডাকিয়ে ঘুম মারছি, না?"

রঘুনাথ মেজাজ খারাপ না করে স্থির স্বরে বলল, "তুমি মেয়েমানুষ, লাজ তোমার থাকবার দরকার। আমার সার্কাসের কাজ অনেক, সবের ভিতর তুমি নাক ঢুকাবে না—"

রঘুনাথের কথা শেষ হওয়ার আগেই যশোদা বলে উঠল, "মাঝ রাতে অন্যের রাউটিতে মেয়েমানুষের সাথে কী কাজ তোমার বুঝি না আমি?"

"চুপ যশো, চুপ! আমাকে শিবনাথ ডেকে নিল না?" যশোদার সঙ্গে সে রাতে সব কথা আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল না রঘুনাথের এবং সে জানে যে এমন মানুষ যশোদা, সব ভেঙে বললেও সে তার কথা বিশ্বাস না করে আরও বেশী চীৎকার করবে।

"কেন ডাকল তোমাকে?" যশোদা বলল, "আগে থেকে ব্যবস্থা না থাকলে এত রাতে মালিকের ঘুম ভাঙাবার সাহস হয় তার?"

"এসব কথা আমাকে শুনাবে না—" অল্প অল্প বিরক্ত হচ্ছিল রঘুনাথ, যশোদার শাসন সে সহ্য করতে পারছিল না, গলার স্বর কিছু তুলে রঘুনাথ বলল, "সব কথা আমি তোমাকে শুনাব না—শুনাতে পারি না—"

"আমি কানা? ঘাস খাই?"

"চুপ থাক যশো, রাত অনেক হল।"

"ওসব ফুটানি আমার কাছে মারবে না", যশোদার গলা হঠাৎ ভারী হয়ে এল, কাঁদবার ভঙ্গী করে সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, "ও দাদা, একবার এসে দেখে যাও, কার হাতে তুলে দিলে আমাকে!"

রঘুনাথের ভয় হচ্ছিল, কাছাকাছি তাঁবু থেকে হঠাৎ কেউ বোধ হয় ছুটে আসবে। কিন্তু ভীতির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্বেষও তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। দুর্নামকে সে ভয় করে। সার্কাসের প্রত্যেক মানুষ—তারা নিজেরা যেমনই হোক, শুধু মালিক বলে রঘুনাথকে সমীহ করে না, তাকে শ্রদ্ধা করে চরিত্রবান বলে। সে কথা সব সময় মনে থাকে রঘুনাথের এবং যশোদা যখন সন্দেহ করে তখন একটা যন্ত্রণাদায়ক অনুতাপ তাকে অলস ও অকর্মণ্যের মতন করে তোলে। তার নিজের সার্কাসের মানুষের সামনে বার হতে লজ্জা হয় রঘুনাথের। সংসারের সব দায়িত্ব মুখ বুজে এতদিন পালন করে এলেও এখন এক-একবার সব ভেঙেচুরে আবার নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চায় সে। এবং তার আরও মনে হয়, উখড়ার মেলায় জীবন শেষ হয়ে গেলেই ভাল হত।

এত কথা মনে এল বলে যশোদার কথা শুনে রঘুনাথ হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতন বলে ফেলল, "কৈলাসবাবুর সাথে দেখা হলে তাকে আমিও সেই রকম বলব—কার সাথে সাদি দিল আমার!"

"কী, আমি খারাপ?"

"না, আমিই খারাপ", ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠেছিল রঘুনাথ, এখন কিছু না ভেবে রাগের ঝোঁকে বলল, "তোমার সাথে থাকলে কোন মানুষ ভাল থাকতে পারে না। তোমার দাদা আমাকে বাঁচিয়ে দিল বটে—আর তুমি শেষ করে দিলে। খুব হল। আমার আর বাঁচবার দরকার নাই।"

"উঃ", এখন কান্নার অনুভূতি শুকিয়ে গিয়েছিল যশোদার। তার গলা থেকে বিদ্রূপের দ্রুত একটা শব্দ ছুটে এল। রঘুনাথের পাশে আর শোবে না বলে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল যশোদা, কিছু পরে বিকৃত স্বরে বলতে থাকল, "দাদার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বেলা খুব যে বাঁচবার সাধ হয়েছিল! এখন আমি পথের কাঁটা, হাড় জ্বালাচ্ছি তোমার, না?"

"চুপ যশো, চুপ—" রঘুনাথের গলায় তৃষ্ণা ঠেলে উঠছিল বলে সে শুকনো স্বরে থেমে থেমে বলল, "তোমার জন্যে আমি ঘর বানিয়ে দিলাম, তুমি সেখানে থাকবে। সার্কাসের তাম্বুতে এসে আমার মেজাজ এই রকম খারাপ করবে না।"

"কী বললে?" অন্ধকারে রঘুনাথের মুখ ঝাপসা দেখালেও যশোদা বেড়ালের মতন মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, "এত বড় কথা তুমি বলতে পারলে আমাকে—তাড়িয়ে দেবার কথা বললে?"

কিছু নরম হয়ে রঘুনাথ বলল, "তুমি আমার দুর্নাম করবে কেন?"

"উঃ, বাবু বদমাশি করবেন, আমাকে একা ফেলে রাউটির বাইরে যাবেন আর আমি মুখ বুজে থাকব! বেশ, তোমার মতন মানুষের সাথে থাকার দরকার নাই আমার। ছোট মেয়েটার জ্বর না হলে কাল ভোরেই চলে যেতাম—"

সে রাতে আর কোন কথা বলেনি রঘুনাথ। যশোদা আরও অনেক কিছু বলে গেলেও সে ঘুমবার ভাণ করে পড়েছিল। তাকে সে জোর করে আটকাবে না, সে যাক লিলুয়ায় ফিরে। বয়েস বাড়ছে রঘুনাথের, ধৈর্যও কমে আসছে। এখন অনেক কাজ তার, অনেক দায়িত্ব। যশোদা কাছে থাকলে তার কথা শুনে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে রঘুনাথ, তার মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হয়—অসুস্থ মানুষের মতন সে যায় এদিক থেকে ওদিক, কোন কাজে মন দিতে পারে না।

সে রাতের পর যশোদা একটাও কথা বলেনি রঘুনাথের সঙ্গে। কথায় কথায় হাত চালিয়েছে ছেলেমেয়েদের ওপর, তাদের লক্ষ করে চীৎকার করে উঠেছে। কোম্পানীর মেয়েদের তার সংসারের কোন কাজ করতে দেয়নি—বকাবকি করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রঘুনাথও এ ক'দিন কোন চেষ্টা করেনি যশোদার সঙ্গে কথা বলবার। মনের মধ্যে তার পৌরুষকে সযত্নে লালন করে সে নীরব ছিল। এবং যশোদার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করার প্রয়াস তার শিরা অনেকাংশে নিস্তেজ করে রাখলেও টালিগঞ্জের ক্যাম্পে আশাতিরিক্ত অর্থলাভের আনন্দ মনে মনে উপভোগ করে সে একা-একাই তা সবল করে তোলবার ইচ্ছায় আরও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল।

আজ খুব ভোরে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করে দিয়েছিল যশোদা এবং রঘুনাথের সঙ্গে কথা না বলে কৌশল করে তাকে লিলুয়ায় যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছিল কেননা গাড়ির দরকার। সুবলবাবু কিংবা আর কেউ সঙ্গে গেলে ভাল হয়—ছেলেমেয়েদের দিয়ে সেকথাও রঘুনাথকে বলিয়েছিল যশোদা।

যশোদার যাবার আয়োজন দেখে তাঁবু থেকে আজ একবারও বাইরে যায়নি

রঘুনাথ, তার পাশে পাশে ফিরছিল। যশোদা তাকে কিছু না বললেও প্রথম থেকেই বুঝেছিল রঘুনাথ, আজ সে চলে যাবে। এক-একজন ছেলেমেয়েকে কোলে তুলে আদর করছিল রঘুনাথ।

এক সময় ঝগড়া মিটিয়ে সম্পর্ক সহজ করে নেওয়ার ইচ্ছায় যশোদার পাশে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ বলল, "সময় এখন বড় ভাল যশো, অজগরকে আমার প্রণাম দিবে।"

যশোদা ঝনঝন করে থালাবাসন একটা বেতের ঝুড়ির মধ্যে ফেলল, আপন মনেই মাথা দোলাল এবং বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী বলল, রঘুনাথ বুঝল না।

"কী বল যশো?"

চাবির গোছা আঁচলে শক্ত করে বাঁধছিল যশোদা, বাঁধা হয়ে গেলেও সে তা টেনে টেনে দেখে এক ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ করছিল। এখান থেকে চলে যাবার জন্যে যশোদা বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তার মুখ তিক্ত, কঠিন—সেখানে কোমলতার কোন আভাস ছিল না। রঘুনাথের গলার স্বর যশোদার চেহারা আরও নীরস করে তুলল এবং সে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে গাড়ির আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করে বোবার মতন হয়ে থাকল।

রঘুনাথ হাসল, "আমি যাব তোমার সাথে?"

গাড়ির শব্দ হচ্ছিল। দূর থেকে একবার হর্ন বাজাল সুবলবাবু। অনন্ত দুটো বড় ভাঁড়ে চা নিয়ে এসেছিল, রঘুনাথ তা খালি করে দিয়েছে। যশোদা খায়নি। তার চায়ের ভাঁড় থেকে পাতলা ধোঁয়া উঠছিল।

রঘুনাথ অপ্রস্তুতের মতন আবার বলল, "তোমার চা পড়ে থাকল যশো, খেলে না?" সে সাবধানে গরম ভাঁড় যশোদার মুখের সামনে এনে বলল, "চা খাও।"

এখনো কথা বলেনি যশোদা, হাতের ঝাপটায় ভাঁড় ফেলে দিয়েছিল। গরম চা পড়েছিল রঘুনাথের হাতে, তা হলেও সে যন্ত্রণার একটা শব্দ উচ্চারণ করেনি, হাসতে হাসতেই বলেছিল, "এমন চুপচাপ চলে যাবে? দোষ আমার কী হল যশো?"

যশোদার বাক্স বিছানা গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে এক-একবার অনন্ত আসছিল—এক-একটা জিনিস পলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। সুবলবাবু এসে রঘুনাথের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেল। সূর্য উঠেছে, এখনো রোদ এসে না পৌঁছলেও বড় বড় গাছের পাতা চিকচিক করছে। ভিজে ভিজে ঘাস। রঘুনাথ বাইরে তাকিয়ে এসব দেখল।

"যশো?"

তাঁবুতে এখন কেউ নেই, চলে যাবার আগে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল যশোদা, মড় মড় করে চায়ের ভাঁড় পা দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে চারপোলের বড় তাঁবুর দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দেওয়ার মতন চেপে চেপে বলল, "আগুন জ্বলে যাবে!"

খুব আস্তে কথা বলেছিল যশোদা, সব শুনতে পেল না রঘুনাথ। কিন্তু অশুভ একটা ইঙ্গিতের ছায়া ফুটে উঠেছিল যশোদার চোখে। ধর্মভীরু এবং সংস্কার বিশ্বাসী রঘুনাথ তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে যশোদার খুব কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "যশো, কী কথা বললে?"

এখনো যশোদা রঘুনাথের দিকে দেখল না, চারপোলের তাঁবুর দিকেই

যেন পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। রঘুনাথের মনে হল তার সে চোখ থেকে একটা দুঃসহ তেজ ঠিকরে পড়ছে। যশোদার এমন শান্ত এবং হিংস্র মূর্তি কখনো দেখেনি রঘুনাথ।

সে ব্যাকুল হয়ে ছেলেমানুষের মতন বলে উঠল, "এ যশো, ওই তাম্বুর কী গলতি হল? ওই দিকে তুমি এই রকম করে দেখবে কেন?"

এত পরে রঘুনাথের সঙ্গে খুব স্পষ্ট করে কথা বলল যশোদা। এখনো তার পাথরের মতন চোখ বড় তাঁবুর দিকে, পায়ের নিচে মাটির ভাঁড়, মড়মড় করছে—সেই আওয়াজ যশোদার গলার স্বরের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে তাল রাখছিল।

কথা বলতে বলতে কোমরে দু হাত রেখেছিল যশোদা, অভ্যাসমতন মাথা দোলাতে দোলাতে বলছিল, "আগুন জ্বলে যাবে! সব ছারখার হয়ে যাবে—"

রঘুনাথ বাধা দিয়ে বলল, "যশো!"

যশোদা থামল না। কিছু না ভেবে কোনদিকে না তাকিয়ে সে তীক্ষ্ন ও কর্কশ স্বরে বলল, "এত অধর্ম ভগবান সইবে না—কখনো না। যার টাকায় প্রাণ বাঁচল তার কোন দাম যে দেয় না—"

রঘুনাথ অজস্র মানুষের জীবন ভিক্ষা করার মতন যশোদার হাত ধরবার চেষ্টা করে খুব নরম গলায় বলল, "আমাকে তুমি তোমার খুশীমতন গালাগাল কর যশো, আমি সব মেনে নেব—কিন্তু আগ লাগার কথা তুমি কেন বলবে? আমার সার্কাস জ্বলে গেলে কত মানুষ বেকার হয়ে যাবে—তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদল না তোমার! এ যশো, আমার চার পোলের তাম্বুর দিকে আঁখ রাখবে না তুমি, আঁখ ফিরাও—"

যশোদা ঘোমটা টানল। রঘুনাথের মিনতির মতন কাতর স্বর শুনে কোন পরিবর্তন হল না তার মুখের। সে গাড়িতে এসে বসল। রঘুনাথও এসেছিল তার পেছন পেছন। যশোদা তার দিকে দেখল না, ঘোমটা আরও টেনে ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখ নামিয়ে থাকল।

সার্কাসের গাড়ি যশোদাকে নিয়ে লিলুয়ায় চলে যাবার পর চারপোলের তাঁবুর কাছে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল রঘুনাথ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। ট্রাম-বাস চলতে শুরু করেছে। প্র্যাকটিসের জন্যে তাঁবুর মধ্যে এর মধ্যেই এসেছে কেউ-কেউ। রঘুনাথ পায়ের দুপ দুপ শব্দ শুনল, মাথা তুলে আকাশ দেখল এবং মনে মনে বলল, ভগবান আমার মনে কোন পাপ নেই। তুমি সব জান। যশোদা শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করে জুয়েল সার্কাসকে অভিশাপ দিয়ে গেল! হে ভগবান, তার কথা যেন মিথ্যা হয়—আমার জুয়েল সার্কাস যেন ঠিক থাকে!

এত সকালে ওঠে না রঘুনাথ। কিন্তু যশোদা চলে যাবার পর সে আর ঘুমতে পারল না, শুয়ে-শুয়ে ছটফট করল কিছু সময়। তার চোখেমুখে উদ্বেগ ও উত্তেজনা ফুটে উঠেছিল। তারও লিলুয়ায় ছুটে যাবার ইচ্ছে হল। যশোদাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে নয়, পুণ্যবান অজগরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারলে যশোদার অভিশাপ কেটে যেত ঠিক।

অভ্যাস না থাকলেও সকালবেলা স্নান সেরে নিল রঘুনাথ, সিল্কের পাঞ্জাবি পরে ছোট ছোট সোনার বোতাম গাঁথল—যদি সম্ভব হয় আজই কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে-ও লিলুয়া ঘুরে আসবে। তাঁবুতে একা-একা বসে গাড়ির অপেক্ষা করছিল রঘুনাথ।

শিবনাথ তার কাছে এল আরও অনেক পরে। সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখতে পেয়ে ডাকল রঘুনাথ। একা-একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না তার। শিবনাথের বদলে অন্য কাউকে দেখলেও এখন রঘুনাথ কাছে ডাকত। এখন নতুন ক্যাম্পের নানা আলোচনা করে সে তার মনের ভার লাঘব করতে চাচ্ছিল।

"এই সকাল বেলা কোথা যান শিববাবু?" রঘুনাথ তার বিমর্ষ ভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্যে জোর করে হাসল।

শিবনাথও হাসল। রঘুনাথের পাশে আর একটা খালি চেয়ার ছিল, হাত দিয়ে তা কাত করল শিবনাথ, "ক্ষিধে পেয়ে গেছে, কিছু খেয়ে আসি—"

"আরে বসুন শিববাবু, এখানে আমি আনাব খাবার—" রঘুনাথ জোরে ডাকল, "অনন্ত, এ অনন্ত—আরে বাচ্চু, ইধর আও—" দু'জনের জন্যে চা আর জিলিপি সিঙাড়া আনতে বলে সে বলল, "আপনার তো খুব নাম হল শিববাবু এই ক্যাম্পে, জোর হাততালি পেলেন—"

শিবনাথ ঘষ ঘষ করে গলা চুলকোতে চুলকোতে হালকা স্বরে বলল, "কোন ক্যাম্পে হাততালি আমি পাইনি বাবু?"

"ঠিক বাত। কিন্তু এই ক্যাম্পে মানুষের মুখ দেখলেন? বড় বড় লোক, ভদ্র মানুষ সব। রাস্তার উপর কত গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল কাল—"

শিবনাথ বলল, "দেখেছি। পাড়াটা ভদ্রলোকের তো। অনেক সাহেব-মেমও সার্কাস দেখতে এসেছিল।"

"হাঁ-হাঁ, দেখলাম। ক্যাম্পের জন্যে এইবার খুব ভাল জায়গা ঠিক করলেন আপনি!"

"যে যেমন মানুষ, সে তেমন জায়গা ঠিক করবে তো—" সামনে ঝুঁকে পড়ে এক পায়ের ওপর আর এক পা রাখল শিবনাথ, হারকু সাহেবকে খোঁচা মারবার সুযোগ পেয়ে বলল, "আমাদের মাথার ওপর এমন একজন মানুষকে আপনি রাখলেন বাবু যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই জানে না।"

"আমি সব জানি শিববাবু।"

"তা এবার একটা কিছু করুন, হাতে-হাতে লোকটার বদমাশি প্রমাণ করে দিলাম তো—" কথা বলতে বলতে গলার স্বর তুলছিল শিবনাথ, "কেন, আমি সার্কাস চালাতে পারি না? আমার ওপর বিশ্বাস নেই আপনার?"

"আছে, শিববাবু আছে—" রঘুনাথ হেসে বলল, "আপনি আমার পয়লা নম্বরের আর্টিস্ট, আপনার উপর আস্থা থাকবে না আমার?"

"তবে ও লোকের নিচে আমাকে রাখলেন কেন?"

"আপনি সকলের উপরে আছেন শিববাবু—" রঘুনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ঘাবড়াবেন না।"

"না বাবু, আমি ঘাবড়াই না", শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি যার-তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে ছুটি দিতে চান—"

রঘুনাথ শিবনাথের হাত ধরে বলল, "চুপ, শিববাবু, চুপ। এইসব কথা শুনলে আমার মন বড় বিগড়ে যায়। মানুষ ভুল করে তো বটে!"

রঘুনাথকে তাহলেও আঘাত করবার সুযোগ হারিয়ে যেতে দিল না শিবনাথ, হাসতে-হাসতেই বলল, "লীলাকে কার রাউটিতে রাতের বেলা দেখলেন? সেই মানুষকে ছুটি দেয়ার কথা আপনি ভাবলেন না?"

বাচ্চু চা আর জিলিপি-সিঙাড়া নিয়ে এসেছিল, কাঠের একটা ছোট গোল

টেবিল শিবনাথের দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে রঘুনাথ বলল, "সেই রকম মানুষের মতন আপনি আপনাকে ভাববেন না শিববাবু, আপনার সঙ্গে তার ডিফারেন্স বহুৎ। আপনি লিখাপড়া জানা ভদ্দর লোক—"

"সেই জন্যেই তো দুঃখ হয়—"

"না না, ঝুটমুট দুঃখের কোন কারণ নেই—" রঘুনাথ বলল, "মিঠাই খেয়ে নিন শিববাবু।"

একটা সিঙাড়া হাতে তুলে নিয়েছিল শিবনাথ, তা মুখের কাছে এনে সে বলল, "ফের যদি আপনার কাছে মিছে কথা লাগিয়ে ও আমাকে অপমান করে তাহলে আমি ঠিক বলছি বাবু, আমি ওর সব দাঁত খুলে নেব—"

"না না, আপনার নামে সে আর কিছু বলবে না।"

থেকে থেকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল শিবনাথ—হুস হুস শব্দ হচ্ছিল। চা আর খাবার খেতে খেতে সে হঠাৎ অন্যমনস্কের মতন হয়ে গেল। যমুনার সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়নি তার। এই ক্যাম্পে আসবার পর সে-ও তাকে এক-দিনও ডাকেনি। চা খেতে-খেতে শিবনাথ ভাবল, আজ সে একবার যাবে রাধানাথবাবুর তাঁবুতে—যমুনার খবর নেবে।

"বাবু?" চায়ের কাপ হাতে কিছু পরে শিবনাথ খুব আস্তে ডাকল।

"বলেন শিববাবু?"

"আপনি আমার ওপর সেদিন অত রাগ করেছিলেন কেন? সে কী লাগিয়েছিল আপনার কাছে?"

শিবনাথকে বাধা দিয়ে অনুনয় করল রঘুনাথ, "চুপ থাকবেন শিববাবু, আমি পরে সব বুঝতে পারলাম—আমারও বড় কষ্ট হল!"

রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বলল, "আমার জীবনে পাপ নেই, অন্যায় নেই, আমি পরের বউকে রাতের বেলা রাউটিতে ধরে আনি না। বাবু, আপনি যা শুনেছেন—"

শিবনাথের কাঁধে হাত রেখে আবার বলল রঘুনাথ, "চুপ থাকবেন শিববাবু, সেসব কথা ভুলে যাবেন!"

শিবনাথের গলার স্বর নেমে এল, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ আপন মনেই ফিসফিস করে উঠল, "বাবু, আমি যমুনাকে বিয়ে করব—"

রঘুনাথ শিবনাথের পিঠে জোরে-জোরে থাবড়া মেরে হা-হা করে হাসল, "বড় ভাল কথা শুনালেন শিববাবু! এই কথাটা আগে শুনলে কোন গোলমাল হত না, সব মানুষকে আমি চুপ থাকতে বলতাম—" কথা বলতে বলতে নিজেই চুপ হয়ে গেল রঘুনাথ, আঙুল তুলে ইশারা করল শিবনাথকে।

শিবনাথ বাইরে তাকিয়ে দেখল হারকু সাহেব রাধানাথবাবু আর যমুনাকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথের তাঁবুর কাছে এসে পড়েছে।

॥ একুশ ॥

আজ খুব সকালে হারকু সাহেব রাধানাথবাবুর তাঁবুতে গিয়েছিল। হাওয়া সিরসির করে উঠছিল। ভোরের আলো ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে। পাঁচিলের ওপাশে একতলা-দোতলা বাড়ি থেকে ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী পাতলা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। কোথাও পাখি দেখতে পাচ্ছিল না হারকু সাহেব, রাস্তায় বড় বড় গাছের পাতার ভিতরে কিচিরমিচির রব উঠেছিল।

রাধানাথবাবুর ঘুম তখনো ভাঙেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে হারকু সাহেব উঁকি দিয়ে তালি-দেওয়া নোংরা মশারি দেখল। রাধানাথবাবুর একটা হাত ঝুলে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়েছিল রাধানাথবাবু—হঠাৎ দেখলে মড়ার মতন মনে হয়। হাসি আর যমুনা প্র্যাকটিসের পোশাক পরে নিচ্ছিল, হারকু সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা-ও দেখল।

ভোরের পাতলা আলো, হালকা হাওয়া ঘুমের অনুভূতি এনে দিচ্ছিল হারকু সাহেবকে। এখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা কিন্তু শরীর বড় যন্ত্রণা-কাতর—ভারী চোখ, গলা শুকনো, চলাফেরা করতে গেলেই কপালে টান পড়ছে। এখন তার কোন কাজ নেই, ইচ্ছে করলে অনেক সময় সে ঘুমিয়ে নিতে পারত।

হারকু সাহেব ঘুমতে পারল না। ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং কিছু পরেই এসে দাঁড়াল রাধানাথবাবুর তাঁবুর সামনে। আরও আগে থেকে রঘুনাথের তাঁবুর দিকে লক্ষ রাখছিল হারকু সাহেব। সার্কাসের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। হারকু সাহেব যশোদাকে চলে যেতে দেখল।

কাল রাতেও ঘুম হয়নি হারকু সাহেবের। প্রথমে নবীনকে খুব বকাবকি করে সে। পরে নোয়েল খান আর বাজারমাস্টার শ্যামসুন্দরের সঙ্গে অনেক সময় কাটায়। তারা চলে যাবার পর হারকু সাহেব এত হিংস্র এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল যে ঘুমনো সম্ভব ছিল না।

সে রাতের সব ঘটনা জোর করে চাপা দিয়ে রাখলেও প্রতিশোধ নেবার একটা উৎকট ইচ্ছা হারকু সাহেবকে ভিতরে ভিতরে বড় অস্থির করে তুলেছিল। বস্তুত, তার সার্কাস জীবনের এতদিনের মধ্যে মালিকের সামনে এমন চূড়ান্তভাবে অপমানিত হওয়ার কথা সে কল্পনা করতে পারেনি। সে রাতে শিবনাথ তাকে মুখের ওপর লাথি মেরে গেছে। হারকু সাহেব পাল্টা আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

যেদিন ঊষার মা এসেছিল সেদিন এ সব কথা তোলবার ইচ্ছে থাকলেও রঘুনাথের তাঁবুর কাছে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গিয়েছিল হারকু সাহেব। তার মনে হয়েছিল নিজের রাগ হিংসা মান-অপমান, এমন কি আত্মসম্মান নিয়েও কথা বলবার সময় এখন নয়। হারকু সাহেবের কাছে তার নিজের চেয়ে অনেক বড় জুয়েল সার্কাস। সুদিন এসেছে টালিগঞ্জ ক্যাম্পে, লাভের অঙ্ক বাড়ছে প্রত্যেক দিন এবং প্রসন্ন হয়ে উঠেছে রঘুনাথের মেজাজ। হয়ত সে-রাতের কথা তার মনেও নেই। হারকু সাহেব ইতস্তত করল, যশোদার গলার স্বর শুনল। তারপর এক সময় সোজা ফিরে গেল তার নিজের তাঁবুতে, শুয়ে থাকল।

তবে আর অপেক্ষা করা চলে না কেননা, রঘুনাথের সঙ্গে বড় মাখামাখি হয়েছে শিবনাথের। তার স্পর্ধা এতদূর বেড়েছে যে, হারকু সাহেবকে দেখলে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, অন্যদিকে তাকিয়ে হুস হুস করে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ে, কথা বলে না। হারকু সাহেব দু-একবার তার সঙ্গে দরকারী কথা বলতে গিয়েছিল, সে উত্তর দেয়নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

রঘুনাথের প্রিয়পাত্র হলেও শিবনাথকে বেশী দিন এ সার্কাসে থাকতে দেবে না হারকু সাহেব। যাকে সে শত্রু বলে জানে এবং যে তাকে জেনারেল ম্যানেজারের সম্মান দেয় না প্রথম থেকেই তার সঙ্গে একত্র বাস করবার ইচ্ছে ছিল না হারকু সাহেবের। আজকাল স্ট্রংম্যানের অভাব নেই। ভদ্র বাড়ির অনেক নতুন নতুন ছেলে আসতে চায় সার্কাসে। হারকু সাহেব তাদের কাউকে বেছে নেবে। বড় বেশী মাইনে নেয় শিবনাথ, নতুন ছেলে পাওয়া যাবে অনেক কম টাকায়। সার্কাসের ব্যয় সংক্ষেপের দিকটাই হারকু সাহেব আগে দেখবে। এবং রঘুনাথের মন ভাঙাবার জন্যে সে সাহায্য নেবে যমুনার।

রাধানাথবাবু হাসি আর যমুনা ট্র্যাপিজ করবে শুনে যেদিন হারকু সাহেবকে নেমন্তন্ন করেছিল সেদিন যমুনা তাকে বলেছিল সে একদিন শিবনাথের সব কথা চুপে চুপে বলবে, তার তাঁবুতে আসবে এবং দরকার হলে সে রঘুনাথের সামনেও দাঁড়াবে। কাল রাতে যমুনার কথা আবার মনে পড়েছিল হারকু সাহেবের। এবং সেই সব কথা ভেবেই সে আজ এত ভোরে তার তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজই কিছু পরে হারকু সাহেব যমুনা আর রাধানাথবাবুকে নিয়ে রঘুনাথের সামনে দাঁড়াবে।

লীলার দুঃসাহসের জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া সোজা। সে ব্যবস্থা হারকু সাহেব নিজেই করবে। এখন না। আর কিছু সময় যাক। শেষ হোক টালি-গঞ্জের খেলা। হারকু সাহেব কাউকে বলবে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ চুপে চুপে লীলাকে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে পঙ্গু করে দিতে, পরে তাকে তাড়িয়ে দেবে—নবীনকেও।

কিন্তু আজ সকালেই যমুনার কাছে আসত না হারকু সাহেব। লাভের অঙ্ক আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে সে নিজে প্রসন্ন হয়ে থাকত, সার্কাসের সব মানুষকে খুশী রেখে পরিবেশ সহজ এবং আরও সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করত—এখন সে-ই তার একমাত্র কাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আক্রোশের জন্যে ভাবনায় ভাবনায় সারা রাত না ঘুমিয়ে এত ভোরে বাইরে বেরিয়ে আসবার মানুষ হারকু সাহেব নয়।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় শিবনাথ তাকে আবার খোঁচা মেরেছে। সার্কাস চলছিল তখন। এক-একটি নম্বরের পর হাততালির তুমুল আওয়াজ হচ্ছিল। চারপাশে অসংখ্য মানুষের তৃপ্ত মুখের দিকে দিকে তাকিয়ে সাফল্যের অদ্ভুত একটা স্বাদ হারকু সাহেব আবছা অন্ধকার স্বল্প পরিসর জায়গায় দাঁড়িয়ে আপন মনেই অনুভব করছিল এবং আত্মতৃপ্তিতে সে এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তার খেয়াল ছিল না সে তন্ময় হয়ে লীলার খেলা দেখছে।

ভিন্ন কোন প্রদেশের মেয়ের মতন দেখাচ্ছিল লীলাকে। সুর্মা টানা বড় বড় চোখ। উরুর আভা উছলে উঠছিল। তার উদ্ধত বুকের ওপর হলুদ কাঁচুলির জরী মুক্তোর মতন ঝিকমিক করছিল। অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী হাসছিল লীলা—পায়ের তলায় বল নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছিল রঙীন একটা মাছের মতন। তাকে দেখতে দেখতে হারকু সাহেব ভাবছিল এমন মেয়ে

কোন সার্কাসে আছে! মানুষ পাগল হবে, মাতাল হবে—বার বার আসবে বল ড্যান্স নম্বর দেখতে। আরও কিছু পরে অতর্কিত কোন মুহূর্তে হারকু সাহেবের মুখ থেকে প্রশংসার অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হল, "বাঃ, বাঃ!"

এবং ঠিক তখন সিগ্রেটের এক ঝলক ধোঁয়া এসে পড়ল হারকু সাহেবের মুখের ওপর, তার গলার ভিতর সুড় সুড় করে উঠল, কাশি এল। পকেট থেকে রুমাল টেনে মুখ ফিরিয়ে কাশতে গিয়ে হারকু সাহেব তার কাছেই শিবনাথকে দেখল। ক্রুর এবং বিদ্রূপের দৃষ্টি শিবনাথের। হারকু সাহেবের মনে হয়েছিল সে ইচ্ছে করেই তার মুখের ওপর সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়েছে।

কাশতে গিয়েও কাশল না হারকু সাহেব, জোরে গালে রুমাল চাপল এবং যথাসম্ভব স্থির থাকবার চেষ্টা করে শিবনাথের কাছে এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বলল, "আপনি এখন এখানে এলেন?"

অচেনা একটা মানুষের মতন কয়েক মুহূর্ত হারকু সাহেবের পা থেকে মাথা অবধি দেখল শিবনাথ, ছাই ঝাড়ল এবং দাঁতে সিগ্রেট চেপে কৈফিয়ত চাওয়ার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "আমার খুশী!"

"শিববাবু, ঝুটমুট আঁখ দেখলাবেন না, আমার বাত শুনেন। আপনি আর্টিস্ট লোক, আপনাকে পাবলিক চিনে। এখানে এই রকম ঘুরাফিরা করলে মানুষের কাছে আপনার প্রেসটিজ কম হয়ে যাবে—"

ঠোঁট দিয়ে জ্বলন্ত সিগ্রেট নাচিয়ে শিবনাথ লীলার দিকে আঙুল দেখিয়ে রূঢ় স্বরে বলল, "আপনি যাকে দেখছেন, তাকে দেখুন—ওই যে। আমাকে দেখবেন না—" সে গলা আরও তুলে বলল, "আপনার খুশী হলে আমার নামে বাবুর কাছে লাগাবেন—বুঝলেন?"

হারকু সাহেব জানে না এর পরেও সে কেমন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রঙীন মাছের মতন লীলার দেহ তখন ঝাপসা, হারকু সাহেব চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মতন হাততালি ঝরছিল, জলের ভয়ে মানুষ যেমন করে ছুটে পালায় তেমন করে বাইরে বেরিয়ে এল হারকু সাহেব। আসবার সময় সুবলবাবুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্ষিপ্তের মতন চীৎকার করে বলল, "আভ্‌ভি নবীনকে আমার রাউটিতে ভেজবেন।"

যে মেজাজ এত সময় দমন করে রেখেছিল হারকু সাহেব, নিজের তাঁবুতে ফিরে আসবার পর তা একটা লাগাম ছেঁড়া তেজী ঘোড়ার মতন যেখানে-সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সে জলের গেলাস ছুঁড়ে ফেলল দূরে, লাথি মেরে চেয়ার উল্টে দিল এবং দু হাত পিছনে ঝুলিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যেতে যেতে আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, "আমাকে আঁখ দেখলাবে তুমি! শালা, কুত্তির বাচ্চা! আমি টালিগঞ্জ ক্যাম্পে গোর বানাব তোমার। যমুনা জুত্তি লাগাবে তোমার মুখে, আমার নাম জে. হারকুলিস!"

সুবলবাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে নবীন এসেছিল অল্প পরেই এবং হারকু সাহেবের চলাফেরা দেখে তাকে তার পুরোপুরি মাতাল বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়েছিল নবীন। হারকু সাহেব তাকে কেন ডেকেছে সে কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করবার সাহস তার ছিল না।

হারকু সাহেব নবীনকে দেখে তার ওপর নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার গলা চেপে ধরে তাকে পিছনে ঠেলে নিয়ে গেল, গালে চড় মারল, পেটে ঘুষি মারল, তার পায়ে ও পিঠে লাথি চালাল এবং এলোমেলো ভাষায় খুশী

মতন বলতে থাকল, "শালা তুই মরদ না আওরাত? তোর বিবি রাতের বেলা আমার রাউটিতে রেণ্ডির মতন মজা মারতে এল আর তুই চুপচাপ থাকলি? বেয়াকুফ!"

হারকু সাহেব এতদিন পর হঠাৎ নবীনকে যে এমন করে মারতে পারে তা সে ভাবতে পারেনি। মার খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না নবীন। হারকু সাহেবের হাত ও পায়ের ধাক্কায় সে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল।

রিং মাস্টার মদনমোহনের সঙ্গে আজকাল বাঘের খেলার সময় নবীনকেও রিং-এ যেতে হয় বলে সে-ও প্যাণ্ট শার্ট পরেছিল। পড়ে গিয়ে গায়ে ধুলো লেগেছিল তার। নবীন প্যাণ্ট শার্টে ময়লা দাগ দেখল। তা হলেও স্থির হয়ে থাকল সে, হাত নেড়ে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলবার কোন চেষ্টা করল না।

কিছু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বড় করুণ চোখে হারকু সাহেবের দিকে নবীন তাকিয়ে থাকল। তার গলায় খুব জোরে হারকু সাহেবের শক্ত আঙুলের চাপ পড়েছিল। গাল জ্বলছে, হাতে-পায়েও লেগেছে। কিন্তু তা হলেও এখনো মার খাওয়ার ভয় ছিল না নবীনের। তার মনে হচ্ছিল খুব লাগলেও মার খেয়ে সে যেন অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে—তার মাথা থেকে অস্বাভাবিক একটা ভার হঠাৎ নেমে গেছে।

মনে মনে অনেক হালকা হয়ে উঠলেও হারকু সাহেবের এমন নির্দয় হয়ে ওঠার কারণ খুঁজে পেল না নবীন। কোন কথা না বললেও তার দৃষ্টিতে ক্লান্ত একটা জিজ্ঞাসা স্থির হয়ে ছিল। নবীন জানতে চাচ্ছিল কী সে করেছে যার জন্যে হারকু সাহেব তাকে চোরের মতন মারল। যে চেয়ার লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিয়েছিল হারকু সাহেব তা আবার ঠিক করে রাখবার ইচ্ছে হচ্ছিল নবীনের।

হারকু সাহেব আবার নবীনের কাছে এসে চীৎকার করে বলল, "একটু শরম হল না তোর? তোর বিবি রাতের বেলা বাহার ভাগবে আর তুই নাক ডাকাবি?"

নবীন মুখ নামিয়ে থাকল। আরও পরে আঙুলের শব্দ করে সে তার প্যাণ্টের ধুলো ঝেড়ে বলল, "হারকু সাহেব, আমি জেগেছিলাম, আমি সব জানি—"

হারকু সাহেবের শক্ত হাত আবার নবীনের গালে পড়ল। এখন গালে হাত বুলোতে থাকল সে, কিছু দূরে সরে গেল। সার্কাস রিং-এ তখন ভাল্লুকের খেলা হচ্ছিল। গীটারে একটা বিলিতি সুর তুলেছিল মোহনলাল। থেকে থেকে মদনমোহনের চাবুকের শব্দও উঠছিল, চটাস—চটাস!

হারকু সাহেব বলল, "আমি কেন সাধি দিলাম তোর? বিবিকে রাতের বেলা আমার রাউটিতে ভেজবার জন্যে?"

নবীনের স্বরে নালিশ করার আভাস ছিল। সে হারকু সাহেবের দিকে দেখল না, বাইরে তাকিয়ে মদনমোহনের চাবুকের আওয়াজ শুনতে শুনতে বলল, "লীলা আমার কথা মানে না—"

"এটা মরদের বাত হল?" যে চেয়ার উল্টে গিয়েছিল, তার ওপর আর একটা লাথি চালাল হারকু সাহেব, "আওরাত মরদের বাত মানে না! তুই শালা জেনানা আছিস? বিবিকে লাথি লাগিয়ে সিধা বানাতে পারিস না?"

নবীন অসহায়ের মতন একটা কাতর নিশ্বাস ছেড়ে খুব নিচু গলায় বলল,

"হারকু সাহেব, আমি তাকে অনেক বকেছি, অনেক মেরেছি—সে সিধা হবে না—"

"চোপ রও! আওরাতের মতন বাত আমার সামনে বলবি না। ফের যদি লীলা আমার রাউটিতে আসে—আমার প্রেসটিজ শালা শিবনাথের কাছে আউর বাবুর কাছে বিলকুল ফিনিশ করে দেয় তবে তোদের নোকরি আমি খতম করে দিব—"

প্রহারের ব্যথার মধ্যে, এত দুঃখ আর অশান্তির মধ্যে ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল ইঙ্গিত কাঁপছিল নবীনের মনে—সে রিং মাস্টার হবে। এবং এখন চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় নবীন ব্যাকুল হয়ে বলল, "আমার দোষ নেই হারকু সাহেব, লীলার জন্যে আমাকে বেকার বানাবেন না।"

"সব দোষ তোর", হারকু সাহেব নবীনকে এক ঝটকায় দূরে ঠেলে দিয়ে মাতালের মতন বলল, "আমার বিবি এমন রেণ্ডির মতন হলে আমি তাকে মারডার করে দিতাম জরুর।"

নবীনের চোখ ঠাণ্ডা, মুখ বিবর্ণ। মার খেয়ে তার সব ভয় ভেঙে গিয়েছিল বলে এখন সে লীলার পক্ষ নিয়েই কথা বলল, "লীলার ওসব ভয় নেই হারকু সাহেব।"

নবীনের কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল হারকু সাহেব, আপন মনে পায়চারি করল কিছু সময় এবং পরে নবীনের কাছে এসে চাপা স্বরে বলল, "এমন বিবিকে মারডার করতে পারিস না তুই?"

"না।"

"কেন, বল?"

কিছু সময় ইতস্তত করল নবীন। হারকু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে, মাথা নিচু করে মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে অভিযোগ করবার মতন বলল, "তার কী দোষ?"

"দোষ নাই? কী তুই বলিস নবীন? একজনের বিবি দোসরা মরদের কাছে রাতের বেলা চুপেচাপে এলে ধরম থাকে তার? লীলা রেণ্ডির মতন কাজ করল আর তুই এখনো বলিস তার কোন দোষ নাই? শালা উজবুক!"

নবীন মাথা তুলল এবং হারকু সাহেবের মুখ থেকে বারবার লীলার সম্পর্কে একই কথা শুনছে বলে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "লীলাকে রেণ্ডি বলবেন না হারকু সাহেব।"

"তবে কী বলব রে শালা?"

নবীন জানত হারকু সাহেব তাকে আবার মারবে কিন্তু মনে মনে সে লীলার ওপর এখন অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল বলে সাহস করে স্পষ্ট বলল, "লীলা আমাকে বিয়ে করতে চায়নি, আপনি জোরাজোরি করেছিলেন—"

হারকু সাহেব নবীনকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "চুপ থাক! আমার যা খুশী হল আমি তা করলাম। এখন তাকে যদি তোর মতন বেয়াকুফ শায়েস্তা করতে না পারে—"

নবীন ভাঙা-ভাঙা স্বরে এখনো লীলার দোষ কাটিয়ে নেবার জন্যে বলল, "আমার ওপর লীলার কোন টান নেই। হারকু সাহেব, সে আমাকে ভালবাসে না—"

"গাড়ির চাক্কার তলে পড়ে মর শালা—" হারকু সাহেব নবীনের ঘাড়ে হাত

রেখে তাকে তাঁবুর বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, "নিজের বিবিকে মানাতে পারিস না, তুই বাঘ মানাবি কী রকম করে বল?"

নবীন শুকনো হেসে বলল, "বাঘ আমি ঠিক মানাব হারকু সাহেব, দেখে নেবেন—"

"নিকাল যা!"

নবীন হারকু সাহেবকে আঘাত করবার কোন চেষ্টা করেনি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। হারকু সাহেব জানে সে যার ওপর যত খুশী অত্যাচার করুক না কেন, একমাত্র শিবনাথ ছাড়া তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস আর কারুর নেই।

কিন্তু নবীন চলে যাবার পর হারকু সাহেব প্রহার-জর্জরিত মানুষের মতন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা অনুভব করছিল এবং তার মনে হচ্ছিল অনেক সময় সে আর বাইরে বার হতে পারবে না। সে বসতে পারছিল না, চলাফেরা করতে পারছিল না এবং তার স্নায়ু-শিরা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এলেও হারকু সাহেব শুয়ে পড়বার কথাও কল্পনা করতে পারল না।

এখন, আজ রাতেই এমন একটা কিছু করা দরকার যা হারকু সাহেবকে আবার সুস্থ ও সবল করে তুলবে। নবীনের মন মেয়েমানুষের মতন নরম। লীলা তাকে মানে না—মানবে না। তাকে ডেকে ভুল করেছে হারকু সাহেব।

নবীন লীলাকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে শাসন করবার ক্ষমতা তার নেই। ইচ্ছে করেই সে-রাতে সে লীলাকে হারকু সাহেবের কাছে ঠেলে দিয়েছিল কি-না কে জানে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতে হারকু সাহেবের মন জ্বলতে লাগল এবং সে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ঝিমোতে থাকল।

আর একটু পরেই বাঘের খেলা হবে, মদনমোহনের সঙ্গে রিং-এ চলে যাবে নবীন। লীলা তাঁবুতে একা, হয়তো এখন বিশ্রাম করছে। দু হাত মুঠো করে মুখের সামনে তুলে আনল হারকু সাহেব, লীলাকে শাস্তি দিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? নবীন সব জানে, সে কিছু করবে না। হারকু সাহেব নিজে কিছু করতে গেলেই এখন কথা উঠবে। শিবনাথ হাসবে, রঘুনাথ আরও অসন্তুষ্ট হবে তার ওপর। হারকু সাহেব ধরা পড়ে যাবে, অপদস্থ হবে।

তাঁবুর মধ্যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হিংস্র জানোয়ারের মতন হয়ে উঠল হারকু সাহেব।

॥ বাইশ ॥

সকাল বেলা রাধানাথবাবুর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাল রাতের অস্থিরতা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনার কথা এখনো ভুলতে পারছিল না হারকু সাহেব। সে রাধানাথবাবুর সামনে যমুনার সঙ্গে খুব সতর্ক হয়ে কথা বলবার চেষ্টা করছিল বলে অল্প সরে গিয়ে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করল।

একবার ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল হারকু সাহেবের। রাধানাথবাবুর তাঁবুতে এসে যমুনাকে নানা কথা বুঝিয়ে কী দরকার রঘুনাথের কাছে তাকে টেনে নিয়ে যাবার! এক সময় সে নিজেই স্পষ্ট করে তাকে বলবে, লীলা কেন এসেছিল তার কাছে এবং জানতে চাইবে শিবনাথ কেন সাহস করে তার নামে

বাবুর কাছে লাগাবে—হারকু সাহেব কৈফিয়ত চাইবে।

এবং রঘুনাথকে রূঢ় ভাষায় বলবে, শিবনাথবাবুকে ছুট্টি দিতে হবে আপনার। আমার সামনে তার নাক-কান ডলতে হবে। আপনার খুশী হলে আপনি তাকে কোম্পানীতে রাখবেন আউর আমাকে ছুট্টি দিবেন।

আমি জুয়েল সার্কাসকে বহুৎ বড়া বানালাম, দোসরা ছোটা কোম্পানীকেও আমি জোর চালু করে দিব ফের—ওই হিম্মৎ আমার আছে। আমার নোকর আমাকে আঁখ দেখলাবে আউর আমি চুপচাপ থাকব—বাবু, আমি সেইরকম আদমী না!

হারকু সাহেব চাকরি দিতে পারে মানুষকে, একটা ছোট সার্কাসকে বড় করে তোলবার ক্ষমতা তার আছে বলেই তো রঘুনাথ তাকে জেনারেল ম্যানেজার করে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। শিবনাথ আসলে তার চাকর ছাড়া আর কী!

ভোরের বাতাস অল্প অল্প করে এক সময় হারকু সাহেবের চড়া মেজাজ নিবিয়ে দিল। একে-একে জেগে উঠছে অনেক মানুষ। কেউ কেউ হঠাৎ হারকু সাহেবকে রাধানাথবাবুর তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে যাচ্ছে—ত্রস্ত হাত তুলে সেলাম জানাচ্ছে তাকে। হারকু সাহেব কারুর দিকে তাকাচ্ছে না, ভদ্রমানুষের বাড়ির দিকে খালি চোখে তাকিয়ে অল্প হেসে সেলামের উত্তর দিচ্ছে।

"হারকু সাহেব নমস্কার", প্র্যাকটিসে যাবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসেই হারকু সাহেবকে দেখতে পেল যমুনা, তার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে হাসল।

যমুনার পাশে হাসিও ছিল, সে প্র্যাকটিসের পোশাক টেনে-টেনে ঠিক করে নিচ্ছিল। হারকু সাহেবকে দেখলেই সে ভয়ে চুপ হয়ে যায়।

"হাঁ-হাঁ, নমস্কার", প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে নিয়ে হারকু সাহেব হাসল, যমুনার আরও কাছে সরে এসে বলল, "রাধানাথবাবু এখনো ঘুমাচ্ছে—আমি বহুৎ জলদি এলাম—"

"বাবাকে তুলে দেব?"

"হাঁ যমুনা, তাকে উঠাতে হবে—" তার কথা শুনে যমুনা আবার তাঁবুর ভেতরে ঢুকছিল, হারকু সাহেব বাধা দিয়ে বলল, "শুন শুন যমুনা, তোমার সাথে আমার বহুৎ জরুরী বাত আছে।"

"বলুন না?"

"আমি সেইসব বাত বলতে এলাম—" হারকু সাহেব অল্প ইতস্তত করে বলল, "তুমি বলেছিলে আমার রাউটিতে যাবে, শিববাবুর বদমাশির সব বাত বলবে—"

হারকু সাহেবের কথার মাঝে যমুনা বলে উঠল, "হাসি, যা বাবাকে তুলে দে।"

"প্র্যাকটিসে যাবি না দিদি?"

হারকু সাহেব হেসে বলল, "না হাসি, আজ তুমি একেলা প্র্যাকটিস করবার লিয়ে যাবে। পুষ্পরাজ আউর করালীবাবুকে বলবে, আমি আজ যমুনাকে ছুট্টি দিলাম—" হঠাৎ কী ভেবে সে বলল, "থাক থাক, কুছ বলবার দরকার নাই, আমি পিছে ওদেরকে বলে দিব।"

রাধানাথবাবুকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে যমুনার কথা মতন তাঁবুর ভেতরে গেল না হাসি, তা ভুলে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে চলে গেল। যমুনা

তাকে আর ডাকল না। রাধানাথবাবুকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে নয়, সে হাসিকে অন্য কারণে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

হারকু সাহেবের কিছু-কিছু কথা শুনেই যমুনা বুঝতে পেরেছিল শিবনাথ তাকে যা-যা বলেছে তা সে স্পষ্ট করে শুনতে চাইবে এবং যমুনা কী করতে চায় তা-ও জানতে চাইবে।

ভোরের নরম আলোয় ভিজে মাটিতে খালি পা ঘষতে ঘষতে যমুনারও জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল, তার জন্যে আর কী করবে হারকু সাহেব—কবে সে জুয়েল সার্কাসের সার্কাস কুইন হবে।

লীলাকে ট্র্যাপিজে নেয়া হয়নি বলে যমুনার মনে ফেনার মতন অদ্ভুত এক কৃতজ্ঞতা বুজবুজ করে উঠছিল যা তার অন্য সব বোধ ম্লান এবং ভোঁতা করে তুলছিল। নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে হারকু সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিল যমুনা—এ সময় লীলা তাকে দেখলে হয়তো অহঙ্কারের ছোঁয়া যমুনার মুখ আরও সুন্দর—আরও তৃপ্ত করে তুলত।

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও লীলা নেই।

যমুনা বলল, "এখন যাব আপনার রাউটিতে?" হঠাৎ সে মুখ নামিয়ে ভিজে মাটিতে পা ঘষতে ঘষতে লাজুক মেয়ের মতন হাসল, "সেকথা বলতে আমি অনেক আগেই যেতাম, তবে—"

"কী যমুনা?"

"আমার ভয় করছিল হারকু সাহেব", শিবনাথের তাঁবু দেখতে দেখতে যমুনা বলল, "কত রকম মানুষ আছে এখানে, কে কী ক্ষতি করে ঠিক কী, আমি ভয়ে আপনার কাছে যেতে পারিনি।"

হারকু সাহেব যমুনার কথা শুনে জোরে হেসে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তাহলে এ সময় আর পাঁচজনের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে বলে সে ইচ্ছে করেই হাসল না, আবার প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু-পা এগিয়ে এসে আস্তে বলল, "আজ আমি তোমার সব বাত শুনতে এলাম। আজ তুমি বাবুর রাউটিতে যাবে—সব শুনাবে। রাধানাথবাবু ভি যাবে। এখানে আর দাঁড়াবে না যমুনা, রাউটির ভিত্তর চল্, রাধানাথবাবুকে উঠাও, আজ দুষমনের সাথে আমার মোকাবিলা হবে।"

যমুনার মুখে বিবর্ণ একটা আভা ফুটে উঠেছিল। সার্কাস কুইন হওয়ার স্বপ্ন, লীলার ওপর একটা অমানুষিক ঈর্ষা এবং শিবনাথের ওপর নির্ভর না করতে পারার দৈন্য—এইসব অনুভূতি তাকে হারকু সাহেবের সঙ্গে রাধানাথ-বাবুর খাটের কাছে যন্ত্রের মতন টেনে নিয়ে এলেও হঠাৎ যমুনার শরীর ও মন বিদ্রোহ করে উঠছিল। রাধানাথবাবুর ঘুম ভাঙাতে এসে সে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

বাইরে জোরে হাসতে পারেনি হারকু সাহেব, তাঁবুর মধ্যে এসেও হাসল না কিন্তু এখন তার মুখ বড় প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাকে বসতে বলবার কথা যমুনার খেয়াল না থাকলেও আর একটা খাটের ওপর বসে পড়েছিল সে এবং দাড়িতে হাসি আর যমুনার রঙীন শাড়ি ও সার্কাসের জরির পোশাক দেখতে দেখতে আপন মনেই হাসছিল।

"কী হল যমুনা? বাবাকে উঠাও!"

প্র্যাকটিসের পোশাক ছেড়ে নেয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল যমুনার। পিছন ফিরে

থাকলেও সে বুঝতে পারছিল হারকু সাহেবের দু-চোখ তার দেহ এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিচ্ছে। কিন্তু এখন পোশাক বদলাবার সুযোগ নেই। যমুনা হারকু সাহেবের দিকে ফিরে বলল, "হারকু সাহেব, বাবুর কাছে গিয়ে আমি কী করব—কী বলব?"

"শিববাবু রাতের বেলা তোমার রাউটিতে এসে জোর-জবরদস্তি করেছে, খারাপ-খারাপ বাত বলেছে আউর আমাকে আউট করবার মতলব করেছে—এইসব বলবে—"

হারকু সাহেব যা বলল তা ঠিক নয়। সব কথা ভাবতে ভাবতে যমুনার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা কন কন করে উঠছিল। তার কাছ থেকে শিবনাথ জোর করে কখনো কিছু আদায় করতে চায়নি। যমুনা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, আমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে এবং সে-ই তাকে জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার জন্যে জোর করেছে।

শিবনাথের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবার সময় নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছিল যমুনা। সে এই সার্কাসের আর সব মেয়েদের চেয়ে অনেক ওপরে থাকবার জন্যেই শিবনাথের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

যমুনা এখন বুঝতে পারল, দোষ শিবনাথের নয়, দোষ তারই! শিবনাথ কথা রাখতে পারেনি বলে কোন কারণ না জেনেই সে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছে হারকু সাহেবের সামনে। সেকথা যমুনা ভুলে গেলেও হারকু সাহেব মনে রেখেছে এবং রাগের ঝোঁকে বলা সেইসব কথা রঘুনাথকে শোনাবার জন্যে তাকে তার সামনে টেনে নিয়ে যেতে এসেছে।

এমন সব ভাবনা শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ার মতন যমুনার মনে কাঁটা ফোটার অনুভূতি এনে দিলেও হারকু সাহেবের কথা অস্বীকার করবার মতন মনের জোর এখন যমুনার ছিল না এবং সে বলতে পারল না যে শিবনাথের কোন দোষ নেই, তাকে জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার জন্যে যমুনাই জোর করেছে—হারকু সাহেবের বিরুদ্ধে কথা বলিয়েছে।

একটা ব্যথায় মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেও যমুনা হারকু সাহেবকে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলবার চেষ্টা করল, "আজ থাক না হারকু সাহেব। বাবুর সামনে যেতে আমার ভয় লাগে—"

"আরে, ভয়ের কী আছে যমুনা—" হারকু সাহেব কিছু বিমর্ষ হয়ে সিগ্রেট ধরাতে-ধরাতে বলল, "দুষমন রাখতে নাই, দেরি হলে খুব মুশকিল হবে।"

তাহলেও যমুনা করুণ মুখে বলল, "আপনি যা-হয় বলুন না বাবুকে, আমাকে ডাকলে আমি না হয় যাব তখন—"

"আরে না না, আমার সাথ-সাথ তোমরা যাবে। সব বাত বাবুকে শুনাবে—" হারকু সাহেবের চোখ কয়েক মুহূর্ত সিগ্রেটের আগুনের ওপর স্থির হয়ে থাকল, "তোমার মুখের বাত শুনলে বাবুর বিশোয়াস জোর হবে—বাবু বহুৎ খুশ হবে।"

এখনো অঘোরে ঘুমচ্ছে রাধানাথবাবু। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে যমুনা আরও নিবে আসছিল—তার মনে হচ্ছিল এই একটি মাত্র মানুষের জন্যেই সে এমন যন্ত্রণার কুণ্ডে হিমসিম খাচ্ছে, তার দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে বলেই খুশী মতন কাজ করবার অধিকার নেই যমুনার। এখনো সে ভাবছিল হারকু সাহেবকে সত্যি কথা বলে দেবে কি-না।

হারকু সাহেব আবার বলল, "যমুনা, রাধানাথবাবুকে উঠাও, তুমি তৈয়ার হও—"

যমুনা রাধানাথবাবুর মাটিতে ঝুলে পড়া হাত ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে কয়েকবার জোরে ডাকল, "বাবা, বাবা—"

রাধানাথবাবু চোখ খুলল, কয়েক মুহূর্ত লাগল তার ঘোর কাটাতে এবং যমুনাকে দেখে ধড়মড় করে সে উঠে বসে বলল, "কী—কী হয়েছে? আরে, হারকু সাহেব যে! কখন এলেন মাইরি—" রাধানাথবাবু উৎসুক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল আজও হারকু সাহেব মদের বোতল নিয়ে এসেছে কি-না।

হারকু সাহেব বলল, "উঠেন রাধানাথবাবু, জলদি তৈয়ার হোন। আমরা এখন বাবুর রাউটিতে যাব।"

"সেখানে কেন মাইরি সক্কালবেলা? কী গোলমাল হল?"

"গোলমাল কুছ হল না রাধানাথবাবু", হারকু সাহেব হালকা হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল, "গোলমাল যে করে আমরা সে-মানুষকে ফিনিশ করবার লিয়ে যাব—শিববাবুর বাত আপনার খেয়াল নাই?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খেয়াল আছে", খাট থেকে নেমে লুঙ্গি ঠিক করতে করতে রাধানাথবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "ওকে একেবারে ফিনিশ করে দিন। শিবনাথ খুব বদমাশ।"

যমুনা রাধানাথবাবুকে শাসন করবার মতন গলায় বলে উঠল, "বাবা চুপ কর, যা-তা বকবে না।"

"না না যমুনা, রাধানাথবাবু চুপ থাকলে চলবে না। সে তোমার বাপ আছে। বাবুর সামনে তাকেও বলতে হবে—"

"আলবাত বলব", হঠাৎ হারকু সাহেবের মুখের কাছে মুখ এনে রাধানাথ-বাবু খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বলব হারকু সাহেব?"

যমুনা বলল, "যা বলবার আমিই বলব। বাবা কিছু জানে না হারকু সাহেব।"

হারকু সাহেব হাসল এবং কিছু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি বাহার আছি। আপনারা জলদি-জলদি কাপড়া পিনে লিন। দো-চার মিনিটের ভিত্তর বাবুর রাউটিতে যেতে হবে—"

যমুনা আর একবার বলল, "আজই যেতে হবে?"

"হাঁ হাঁ। এখন মালিকানি নাই, বাত-চিত করার ভাল টাইম আছে। যমুনা তোমার ভাল হবে।"

যমুনা শুকনো হাসল, "কী হবে?"

"বাবু খুশ হলে আমি তোমাকে সার্কাস কুইন বানিয়ে দিব, বহুৎ জাস্তি রুপেয়া দিব।"

যমুনা হারকু সাহেবের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর লীলা কী করবে?"

লীলার নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে হারকু সাহেবের মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে গেল—সব উৎসাহ জুড়িয়ে গেল। জ্বলন্ত সিগ্রেট দূরে ভিজে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সে কঠিন স্বরে যমুনাকে বলল, "লীলাকে আমি ছুট্টি দিয়ে দিব।"

হারকু সাহেবের কথা যমুনার মন থেকে সব সঙ্কোচ সব ব্যথা যেন শিকড়-

সুদ্ধ উপড়ে টেনে আনল। যদিও সে লীলার যে চাকরি যাবে তা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না তাহলেও জয়ের একটা নিষ্ঠুর উল্লাস তাকে সুন্দর করে মিথ্যা বলবার জন্যে প্রস্তুত করে নিল। এখন রঘুনাথের তাঁবুতে গিয়ে শিবনাথের বিরুদ্ধে কথা বলতে কোন আপত্তি ছিল না যমুনার।

আর একটা সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল হারকু সাহেব, যমুনা তার সামনে এসে বলল, "একটু বসুন, আপনার জন্যে চা আনাই।"

"আরে না-না, আভি আউর টাইম নাই। খানাপিনা পিছে হবে। জলদি-জলদি বাবুর কাছে চল যমুনা।"

রাধানাথবাবু আর যমুনার তৈরি হয়ে নিতে খুব বেশী সময় লাগল না। রাধানাথবাবু আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিল, যমুনা তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হলেও চুপ করে থাকল। হারকু সাহেব তাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা জানলেও সব যেন রহস্যের মতন—কাপড় বদলাতে বদলাতে এক-একবার অশান্ত হয়ে উঠছিল যমুনা। সে যেন একজন ঘুমন্ত মানুষের বুকে ছুরি চালাতে যাচ্ছে। তার হাত কাঁপছিল।

হারকু সাহেব আগে আগে যাচ্ছিল, তার পিছনে যমুনা। সব শেষে রাধানাথবাবু। সে খুব আস্তে হাঁটছিল।

তাজা রোদ উছলে উঠেছে, বড় বটের মাথায় আগুন লাগার মতন। পুলিস ফাঁড়িতে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হল। পাখির ভীত রব শুনতে শুনতে কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যমুনা, তার চটির ঘায়ে পাথরের ছোট একটা টুকরো অনেক দূরে ছিটকে গেল।

যমুনা এগিয়ে গেলেও দু-একবার পিছন ফিরে পাথরের সেই ভিজে ছোট টুকরো দেখল এবং তখন তার চোখে রাধানাথবাবু, হারকু সাহেব আর সার্কাসের ছোট বড় সব তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জাম ঝাপসা হয়ে আসছিল।

রঘুনাথের তাঁবুর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যমুনা। অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শিবনাথ তাকিয়ে আছে তার দিকে। নিজেকে সামলে নিতে কিছু সময় লাগল যমুনার। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সে মনের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণার অনুভূতি ফেনিয়ে তোলবার খুব চেষ্টা করছিল।

শিবনাথ কোন মূল্য দেয়নি তার কথার। নিজের যশের কথাই ভেবেছে—স্বপ্ন দেখেছে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার। এবং ভীতুর মতন এখান থেকে তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছে। তার সঙ্গে কেন পালিয়ে যাবে যমুনা?

হাসি যেমন স্বপ্ন দেখে বিয়ে করে সংসার করবার, যমুনা তেমন দেখতে পারে না। পুরনো ক্যাম্প ভেঙে নতুন জায়গায় চলে আসার মতন পাকা বাড়ি থেকে রাধানাথবাবু তাদের নিয়ে এসেছে সার্কাসের তাঁবুতে। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে খুব কষ্ট হলেও এখন যমুনা নিজেকে পুরোপুরি সার্কাসের মেয়ে বলেই মনে করতে পারে এবং এতদিনে তার বিশ্বাসও দৃঢ় হয়েছে যে চার দেয়ালের আড়ালে সংসার করা এ জীবনে আর হবে না। তাকে থাকতে হবে সার্কাসের তাঁবুতে—যেতে হবে নতুন-নতুন জায়গায়, নিয়ম মতন খেলা দেখাতে হবে। দুর্ঘটনা ঘটলে উপোস করে মরতে হবে।

শিবনাথের বিষণ্ণ দৃষ্টি যমুনার মনের মধ্যে এইরকম সব ভাবনার ঝাপটা হঠাৎ বৃষ্টির মতন নামিয়ে আনল। সে এখন সার্কাসের মেয়ে। তার রূপ

আছে, বয়স আছে, সাহস তো আছেই। সে কেন লীলার পিছনে পড়ে থাকবে—কেন সার্কাস-কুইন্ হবে না!

শিবনাথ তাকে শুধু আশ্বাস দিয়েছিল, আর কিছু করতে পারেনি। হারকু সাহেব তার গুণের দাম দেয় বলেই তাকে ট্র্যাপিজে নিয়েছে আর সার্কাস কুইন করে দেবার কথাও বলেছে। শিবনাথ কথা রাখেনি, হয়তো হারকু সাহেব কথা রাখবে। তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিল না যমুনা।

এত বড় সার্কাস যে গড়ে তুলেছে তার কথার দাম আছে বৈকি। শিবনাথের উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি মন থেকে মুছে ফেলে যমুনা এখন হারকু সাহেবের ওপরই নির্ভর করে লীলাকে হারিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

শিবনাথ যে রঘুনাথের তাঁবুতে বসে-বসে চা খাচ্ছে তা যেন লক্ষ্যই করল না হারকু সাহেব, একটু জোরে বলে উঠল, "এই যে বাবু, যমুনা আউর রাধানাথবাবু আপনার সাথে বাত চিৎ করবার লিয়ে এল—"

"হাঁ-হাঁ, আসুন—" রঘুনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "যমুনার খুব নাম হল, বড় ভাল ট্র্যাপিজ খেলছে।"

হারকু সাহেব নিজেই কয়েকটা চেয়ার ঘষে-ঘষে টেনে আনল, "এইখানে বসুন রাধানাথবাবু, বস যমুনা। বাবু, আপনিও বসুন।"

রঘুনাথের সঙ্গে শিবনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন সে-ও বসল। হারকু সাহেবের সঙ্গে এদের এ সময় এখানে আসতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে শিবনাথ। একটু আগেই সে রঘুনাথকে যমুনার কথা বলেছে এখন তা ভাবতে ভাবতে লজ্জা পেল শিবনাথ এবং রাধানাথবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

"কী খবর বলেন রাধানাথবাবু?" রঘুনাথ ভেবেছিল হাসি আর যমুনা হয়তো আরও বেশী মাইনে চায় তাই সকালবেলা এসেছে তার কাছে।

"খবর ফাইন বাবু, বড় ভাল আছি মাইরি—" শিবনাথের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রাধানাথবাবু বলল, "আপনার সঙ্গে আমার অনেক প্রাইভেট টক আছে—"

শিবনাথ বুঝল না যে রঘুনাথকে লক্ষ করে কথা বলছে রাধানাথবাবু, সে হেসে বলল, "আমার সঙ্গে?"

"আরে না", মুখ দিয়ে বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করে রাধানাথবাবু বলল, "তোমার সঙ্গে আমার আবার প্রাইভেট কথা থাকবে কী হে! তোমার সব কীর্তি ফাঁস করব আজ বাবুর কাছে—"

রাধানাথবাবুর কথা শুনতে শুনতে যমুনার মুখ অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিল। রঘুনাথের তাঁবুতে বসে থাকলেও সে তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "বাবা, চুপ কর।"

রাধানাথবাবুর এমন রূঢ় ব্যবহারের অর্থ বুঝতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হল শিবনাথের। পরে সে বুঝল, এসব হারকু সাহেবের কাজ। তার সঙ্গে এখন কথা বলবার প্রবৃত্তি হল না শিবনাথের। সে শুধু মাটিতে জোরে পা ঠুকে শব্দ করল।

যমুনাকে শিবনাথ আস্তে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে যমুনা?"

যমুনা শিবনাথের কথার উত্তর দিতে পারল না, চুপচাপ বসে থাকল। এখানে শিবনাথের উপস্থিতি তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। সে জানত রঘুনাথ কিম্বা হারকু সাহেব তাকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করলে সে কথা বলতে পারবে না।

রঘুনাথ বুঝল ব্যাপার জটিল হয়ে উঠবে। তার মনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সকালবেলা গোলমালের আশঙ্কায় তার শিরা ঝিম ঝিম করতে লাগল। রঘুনাথ আরও বুঝতে পারছিল তার শরীর ভেঙে আসছে—কিছুদিন বিশ্রামের দরকার। এখন সে মনে মনে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করল।

তুমুল কলহ এড়িয়ে যাবার জন্যে রঘুনাথ শিবনাথের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে উঠল, "শিববাবু, এরা আমার সাথে প্রাইভেট বাত বলতে এল, আপনি ফের পরে আসুন—"

রঘুনাথ স্পষ্ট করে চলে যাবার কথা বললেও শিবনাথ উঠতে পারল না। সে দেখতে চাচ্ছিল কতদূর যায় হারকু সাহেব এবং যেন তার কবল থেকে যমুনাকে রক্ষা করবার জন্যে বেশ জোরেই বলল, "আমি বোকা নই বাবু, সকলের সব ফন্দি-ফিকির বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। প্রাইভেট টক আবার কী? ওসব আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারবার মতলব। যদি কারুর সাহস থাকে তো বলুক যা বলবার আমার সামনে—" যমুনা আছে বলেই একটু বেশী জোরে কথা বলে শিবনাথ তার শক্তির পরিচয় দেবার চেষ্টা করছিল এবং তাকে বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে রঘুনাথ কিম্বা হারকু সাহেব—সে কাউকেই মানে না।

শিবনাথের দম্ভ ও মেজাজের এমন প্রকাশ দেখে হারকু সাহেবের মতন মানুষের পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও সে তর্ক করল না তার সঙ্গে। কেননা শিবনাথ তাকায়নি হারকু সাহেবের দিকে, তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেওনি, সে রঘুনাথের সঙ্গে কথা বলছিল।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে হারকু সাহেব রঘুনাথকেই বলল, "আমি বাহার যাচ্ছি বাবু। যমুনা আউর রাধানাথবাবু আপনাকে কী বলবে শুনেন—"

"না, আপনি যাবেন না", হারকু সাহেবের একটা হাত টেনে রাধানাথবাবু বলল, "আপনি জেনারেল ম্যানেজার না?"

হারকু সাহেব হেসে বলল, "বাবু তো আছে।"

শিবনাথ হঠাৎ খুব নরম স্বরে যমুনাকে জিজ্ঞেস করল, "যমুনা, আমি চলে যাব এখান থেকে?"

যমুনার মুখ সাদা-সাদা। ভীত, বিবর্ণ। হয়তো সে এ সময় শিবনাথের কথার উত্তর দিতে পারত না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল রাধানাথ-বাবু, "এই শাট আপ!"

শিবনাথও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার ওপর আপনি রেগে গেলেন কেন রাধানাথবাবু?"

"খবরদার আমার মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করবে না—"

যমুনা আর একবার ডাকল, "বাবা!"

শিবনাথ বলল, "আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন তো?"

"কী আবার জিজ্ঞেস করব? আমি কিছু জানি না ভেবেছ?"

"কী জানেন?"

রাধানাথবাবু ইতস্তত না করেই বলল, "লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে রাউটিতে যাওনি তুমি? তাকে ফুসলে বাইরে বের করে নিয়ে যেতে চাওনি?"

"না, সব মিথ্যা!"

"মিথ্যা? এই যমুনা, বল—"

বড় অস্বস্তি হচ্ছিল রঘুনাথের। এত সময় সে বিমূঢ় হয়ে বসে ছিল, এখন রাধানাথবাবুকে শান্ত করবার জন্যে হঠাৎ বলল, "শিববাবুর সাথে যমুনার সাদি হবে রাধানাথবাবু—"

বিয়ের কথায় আরও রেগে গেল রাধানাথবাবু, কাঠের চেয়ার অনেকটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, "সাদি হবে, না ঘোড়ার ডিম হবে। লোকটা বদমাশ। আপনার কাছে সব মিথ্যা বলে দোষ কাটাতে চায়—"

শিবনাথের আর ধৈর্য থাকল না, কার দোষ তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার মতন মনের অবস্থাও তার আর ছিল না, সে যমুনার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ কিন্তু অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, "যমুনা, এখন লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকবার সময় নয়, তুমি কথা বল—"

"ফের আমার মেয়ের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস?"

"আপনি চুপ করুন!"

"কেন হে? বাপ চুপ করে থাকবে আর—"

শিবনাথ আর শান্ত স্বরে কথা বলতে পারল না, রাধানাথবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে শাসন করবার মতন বলল, "আপনি কেমন বাপ তা জানতে কারুর বাকি নেই, বুঝলেন? মেয়েকে সামনে খাড়া রেখে কার ঘাড় ভেঙে ক' বোতল গিলেছেন, বলুন?"

"তোর বাপের ঘাড় ভেঙেছি, শালা!"

"কী বললেন?" শিবনাথ রাধানাথবাবুর আরও কাছে এসে দু-হাতে তার কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হিংস্র গলায় বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন, খুন করে ফেলব—"

রঘুনাথ উঠে এসে শিবনাথের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "এটা কী রকম হচ্ছে শিববাবু? ছি ছি, ওনারা আমার রাউটিতে এলেন বাতচিত করার জন্যে—যান, আপনি বাহার যান।"

হারকু সাহেব শিবনাথের সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেও খুশী হয়েছিল। একটা কথাও বলতে হয়নি তাকে, যা বলবার রাধানাথবাবুই বলে দিয়েছে রঘুনাথকে। এখন যা বোঝবার সে বুঝে নিক, এবং পরিচয় পাক শিবনাথের চরিত্রের।

রাধানাথবাবু শিবনাথের হাতের চাপে ভয় পেল না, আরও জোরে বলল, "বদমাশ! আমি থানায় যাব যমুনাকে নিয়ে—"

"যান, যান—মাতাল কোথাকার!"

যা হয় হোক, যমুনা প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিল রঘুনাথের তাঁবুতে এসে খুব দরকার না হলে একটাও কথা বলবে না এবং এত সময় সে চুপ করেই বসেছিল। কিন্তু শিবনাথের অভদ্র আচরণ আর সহ্য করতে পারল না যমুনা, সে এখন রাধানাথবাবুর ওপর জন্মগত একটা আকর্ষণ অনুভব করছিল। যমুনা আরও ভাবল শিবনাথকে এ সময় সে যদি দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দেয় তাহলে হারকু সাহেবও খুশী হবে।

যমুনা বলল, "শিববাবু, আমার বাবাকে যা-তা কথা শোনাবেন না। অনেক হয়েছে। এবার থামুন!"

যমুনার গলার স্বর শুনে চমকে উঠল শিবনাথ। এবং কিছু পরে সে থেমে থেমে বলল, "উনিই তো আগে আমাকে যা-তা বলতে শুরু করলেন—"

"কিছু ভুল বলেছে বাবা?"

"কী বলছ যমুনা?"

"বুঝতে পারছেন না?" যমুনা ঝগড়া করার মতন রুখে উঠল, "বেশী ঘাঁটাবেন না আমাকে—বুঝলেন?"

শিবনাথ যমুনার সঙ্গে তর্ক করল না, খুব জোরে কথাও বলল না, সে আস্তে বলল, "তোমরা সকলেই সমান। আচ্ছা, আমিও দেখে নেব—" ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হারকু সাহেবকে একবার দেখে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

রাধানাথবাবু হাঁপাচ্ছিল। মুখ নামিয়ে বসেছিল যমুনা। এখন সে একেবারে শান্ত হয়ে গেছে।

কারুর দিকে তাকাতে পারছিল না রঘুনাথ। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বড় তাঁবু দেখতে দেখতে যশোদার কথা ভাবছিল সে—"আগুন জ্বলে যাবে। সব ছারখার হয়ে যাবে—"

॥ তেইশ ॥

সিংহর কান্না বড় অদ্ভুত। গর্জনের রেশ আছে, একটা চাপা আক্রোশ ফেনিয়ে-ফেনিয়ে বাতাসে কাঁপছিল কিন্তু বিক্রমের প্রকাশ নেই।

সারাদিন থেকে থেকে মুমূর্ষু ভোলা কেঁদে উঠছিল। দিনের বেলা এত স্পষ্ট করে তার কান্না শোনা যায়নি। বাস্-ট্রামের আওয়াজ হচ্ছিল, গাড়ি ট্যাক্সির হর্ন বাজছিল—শব্দের এক-একটা ক্লান্তিকর ঢেউ শ্রবণের পর্দার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছিল বলে জানোয়ারের আর্তনাদ বেশী দূর ছড়িয়ে যেতে পারেনি।

প্রথম অন্ধকারেও মৃতপ্রায় একটা সিংহর অদ্ভুত কান্নার ধ্বনি এমন অভিভূত করে তুলতে পারেনি লীলাকে। তখন ব্যাণ্ড বাজছিল খুব জোরে, হাততালি পড়ছিল, লীলার মন উন্মুখ, দেহ অর্ধনগ্ন। তার মনের কান্না যন্ত্রণা, ছুরির ফলার মতন এক-এক অনুভূতি ঢাকা পড়েছিল অসংখ্য দর্শকের চোখের দৃষ্টিতে, জোরালো আলোর কড়া আঁচে। তখন জানোয়ারের কান্না শোনবার এবং তা শুনে অভিভূত হওয়ার সময় ও মন লীলার কোনটাই ছিল না।

এখন চারপাশ বড় নীরব। অন্ধকারও গাঢ়। বাইরে আলোর কোন রেখা কোথাও পড়ে আছে কি-না বোঝা যায় না। এক-একবার রাতের গাছগুলো নিঃশ্বাস ছাড়ার মতন ফাল্গুনের অস্থিরতা ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছিল এবং এখনো মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে হাতি নিজের দেহের ওপর লেজ ও কানের ঝাপটা মেরে বিরক্তি প্রকাশ করছিল।

খুব আস্তে, চেপে চেপে নিশ্বাস ফেলছিল লীলা। ইচ্ছে করে না, লীলার মনে হচ্ছিল তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও যেন ভয়াবহ একটা ক্লান্তির মতন একবার তার দেহ ও মনের ভিতরে গিয়ে তাকে অবশ আচ্ছন্ন করে তুলছে, পরেই বেরিয়ে এসে অন্ধকার আরও ঘন, আরও অর্থবহ করে তাকে জানোয়ারের মতন যন্ত্রণা দিচ্ছে।

এক-একবার চোখ বন্ধ করছিল লীলা—ভোলার কান্না তার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল এবং এক-একবার চোখ খুলে লোহার সিক ঘেরা একটা

খাঁচার কথা ভাবতে-ভাবতে সে-ও কাতর আর্তনাদের মতন চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছিল।

কিন্তু তার চোখ শুকনো, খট-খটে, হাত-পা অসাড়। লীলা মড়ার মতন পড়েছিল। তার বাঁ হাত বুকের ওপর, ডান হাত ঈষৎ বেঁকে কপালের ওপর পড়েছে। চিৎ হয়ে সে শুয়েছিল। পা টান-টান, তার এক পায়ের ওপর আর এক পা। লীলা সিংহের কান্না শুনছিল। তা শুনতে শুনতে তার মন থেকে রোমকূপ থেকে রক্তের কণিকা থেকে এবং দেহের এক-এক খাঁজ থেকে তার প্রেম দম্ভ তেজ সাহস যশোলিপ্সা—এই সব আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি ফোঁটা ফোঁটা শীতল কান্নার মতন গাঢ় অন্ধকারে ঝরে যাচ্ছিল।

লীলার মতন কিছু দূরে আর একটা খাটে নবীনও বড় চুপচাপ হয়ে পড়ে আছে। তারও সাড়া নেই, নড়াচড়ার শব্দও নেই। তারও নিঃশ্বাস হয়তো খুবই আস্তে আস্তে পড়ছে কেননা লীলা কিছু শুনল না।

সিংহর কান্না, অন্ধকার এবং মড়ার মতন নবীন তাঁবুর মধ্যে একটা রহস্যময় ভীতিও ছড়িয়ে দিচ্ছিল। লীলার মনে হচ্ছিল আর একটু পরে আজ রাতেই চারপাশ আরও নীরব হয়ে যাবে, অন্ধকার আরও ঘন, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং এক সময় সিংহর কান্নাও সে আর শুনতে পাবে না।

লীলার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে নবীন। এক-একবার সে শুধু তার দিকে তাকায়। রাগ নেই নবীনের দৃষ্টিতে, ঘৃণাও না—তার চোখের ভাষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না লীলার কাছে। হয়তো নবীন তাকে মেরে ফেলবার কথাই ভাবছে।

মৃত্যুর কথা মনে হলেও ভয় হয় না লীলার। তবে নবীন না, মারতে হলে হারকু সাহেবই তাকে মারুক। মরার কথা ভাবলেও হারকু সাহেবের ভাবনা আসে লীলার মনে।

খুব রাগ হয়েছে হারকু সাহেবের। লীলা জানে সে তার সাহস দেখে প্রথম প্রথম খুব খুশী হয়েছিল, পরে শিবনাথ বাবুকে অত রাতে টেনে না নিয়ে এলে এমন মড়ার মতন তাঁবুর মধ্যে পড়ে থাকতে হত না লীলাকে, আগের মতন সে আবার হারকু সাহেবের কাছে লুকিয়ে-লুকিয়ে যেতে পারত।

হারকু সাহেব তাকে মেরে ফেলতে চাইলে সে গলা উঁচু করে তার মুখের ওপর বলত, "মরার ভয় আমার নেই, মরলেই আমি বাঁচব হারকু সাহেব।"

খুব ভয়ে ভয়ে লীলা ছিল কয়েকদিন। সে ভেবেছিল হারকু সাহেব হঠাৎ এসে হাজির হবে তাদের তাঁবুতে, জিনিসপত্র বাইরে টেনে-টেনে ফেলে দেবে, বলবে, "আভ্ভি নিকালো—" কিম্বা রঘুনাথ ডেকে পাঠাবে নবীনকে। ধমকাবে, তাড়িয়ে দেবে।

এখনো কেউ আসেনি, কিছু বলেনি। কিন্তু এই নীরবতার মধ্যেও ভয়ঙ্কর একটা উপসংহারও যেন স্থির হয়েছিল। কেউ তাকে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও লীলার মনে হচ্ছিল, এমন করে আর চালানো যাবে না। একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে—সব তোলপাড় হয়ে যাবে।

ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারাল লীলা, তার সব বোধ আস্তে আস্তে এক সময় ভোঁতা হয়ে এল। দেহের মতন মনও অসাড়। তার খেলায় যেন কোন কৃতিত্বের প্রকাশ নেই, হাততালির আওয়াজ বড় বিরক্তিকর—তার মধ্যে কোন মোহ নেই। জানোয়ারের মতন খাঁচার মধ্যে আপন-মনেই বন্ধ হয়ে থাকল লীলা।

একবার, তার মনে হয়েছিল সে যেমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে হারকু সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমন করেই যাবে শিবনাথের সামনে। ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে নয়, সে মাথা উঁচু করে কৈফিয়ত চাইবে তার কাছে, "এটা কী করলেন শিববাবু? বড় মানুষ আপনি, লেখাপড়া জানেন, আমার মতন একটা দুঃখী মেয়েকে এমন করে বাবুর সামনে অপদস্থ কেন করলেন?"

কপালের ওপর আস্তে আস্তে হাত ঘষছিল লীলা, খসখস একটা শব্দ উঠছিল। শেষবারের মতন খুব জোরে সিংহ কেঁদে উঠেছিল, এখন আরও চুপচাপ। কিন্তু এখনো খুব উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও নবীনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল না লীলা। তার যে সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল, সে-সব খুব তীক্ষ্ম না হয়ে উঠলেও লীলার মনে হচ্ছিল চারপাশের অখণ্ড নীরবতা চুপেচুপে তাকে আবার প্রবল এক অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বড় উত্তেজিত হয়ে উঠছিল লীলা এবং এমন করে শুয়ে থাকতে এখন তার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ খাটের ওপর উঠে বসল নবীন। লীলা দেখল সে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে নবীনের মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পারল না লীলা, সে কল্পনা করে নিতে পারল, এখন তার মন হিংস্র—খুন করার নেশায় অন্ধ।

আজ না, দু-একদিন আগে আর এক রাতে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে তার খাটের কাছে এসেছিল নবীন, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল এবং ঈষৎ জড়ানো স্বরে দু-একবার একটা কথাই উচ্চারণ করেছিল, "রেণ্ডি!"

সেদিন প্রথম লীলার মনে হয়েছিল নবীন তাকে খুন করবে। কিন্তু একটাও কথা বলেনি লীলা, নবীনের সঙ্গে ঝগড়া করবারও তার ইচ্ছে হয়নি। হয়তো সে বুঝতে পারেনি যে, লীলা জেগেই ছিল।

পরে, সে-রাতে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে লীলা ঘুমতে পেরেছিল। নবীন তাকে যত বড় কথাই বলুক, যত দুর্নাম দিক—তার অস্ফুট এবং ভয়ঙ্কর উচ্চারণ লীলার মনে অদ্ভুত এক তৃপ্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল। একটা ভীতু মানুষ যেন তার সব ভালবাসা, সব মোহ ও আকর্ষণ খসিয়ে ফেলে তাকে হঠাৎ মুক্তি দিতে পেরেছে। তন্দ্রার মতন একটা ঘোরে পূর্ব জীবনে পৌঁছে যেতে পারছিল লীলা। এবং তার শিয়র থেকে প্রেতচ্ছায়ার মতন নবীন যখন সরে গেল তখন মন্ত্র পড়বার মতন নিজেরই উদ্দেশে লীলা তারই উচ্চারিত ছোট একটা কথা বারবার বলতে চেয়েছিল, "রেণ্ডি।"

সেই মুহূর্তে—ঘুম না, জাগরণ না, তার চেতনার সরব জগৎ থেকে ক্ষণিকের অবসর ছেঁকে তুলতে তুলতে মেয়েমানুষকে চূড়ান্ত অপমান করবার অশ্লীল কথাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে তার মাথার মধ্যে বেজে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল এত পরে তার সম্পর্কে সতীত্বের সব চেয়ে বড় বিশেষণ প্রয়োগ করতে পেরেছে নবীন।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে এখন নবীনকে লীলার বড় ভাল লেগে যাচ্ছিল এবং তার জন্যে সে একটা মমতাও অনুভব করছিল। আর একটু পরে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে হয়তো আজও তার কাছে আসবে নবীন, কয়েক মুহূর্ত তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ নির্বিকার সন্ন্যাসীর মতন, পরে

সেই কথাটা সে আবার তাকে শুনিয়ে যাবে। তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে শুয়েছিল লীলা।

মাটিতে নামল নবীন। হাত ও পা টান-টান করে আলস্য ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিল, লীলার কাছে এল না। তাঁবুর কাপড় সরিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে থাকল। তার নড়া-চড়ার কোন শব্দ নেই। লীলার মনে হল ইচ্ছে করেই সে সাবধানতা অবলম্বন করছে। হয়তো তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে নবীন। আপনমনেই হাসল লীলা। আশ্চর্য, এখন নবীনের হাতে মরতেও তার কোন আপত্তি ছিল না।

নবীন বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লীলা স্থির থাকতে পারল না, একটা অস্বাভাবিক কৌতূহলের বশেই হঠাৎ বলে ফেলল, "কোথায় যাও?"

নবীনের মুখের ওপর এবং তার গোটা দেহের ওপর অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বলে এখনো তাকে অপচ্ছায়ার মতন মনে হচ্ছিল লীলার। তার মুখ স্পষ্ট করে সে দেখতে পারল না কিন্তু বুঝল এত রাতে লীলার স্বর শুনে চমকে উঠেছে নবীন। তার মাথা ঈষৎ নড়ে উঠেছিল এবং সে বাইরে যেতে পারল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল নবীন। নড়ল না। কথা বলল না।

আর শুয়ে থাকতে পারল না লীলা। নবীন দু-একদিন কথা না বলে থাকলেও সাহস করে মান ভাঙাবার ইচ্ছায় সে তার কাছে এসে হাত ধরে টানল এবং চোখে মুখে কৌতুক ছিটিয়ে হালকা গলায় বলল, "কথা নেই কেন গো মুখে? বোবা নাকি তুমি?"

এখনও নড়তে পারল না নবীন। লীলার এমন স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে লীলার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারল না। অপরাধীর মতন বিমূঢ় হয়ে থাকল।

কিন্তু লীলার এমন আকস্মিক স্পর্শ তার মনের মধ্যে সিংহের কান্নার মতন থমথমে একটা গর্জন ফেনিয়ে তুলছিল। তার দৃষ্টি বাইরে কিছু দূরে সিংহের খাঁচার দিকে। খাঁচাও অন্ধকারে ঝাপসা। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না নবীন।

"কথা বলবে না?" নবীনের মুখের কাছে মুখ আনল লীলা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তাঁবুর কাপড় নবীনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দিল এবং তাকে খাটের কাছে ঠেলে এনে এক ধাক্কায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "এত রাতে কোথায় যাও?"

কিছু পরে অন্য দিকে তাকিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কথা বলার মতন ফিস ফিস করে উঠল নবীন, "কেন?"

নবীনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তার গালে মুখ ঘষতে ঘষতে পাগল একটা মেয়ের মতন খুব হাসল লীলা, "আমি সব জানি।"

"কী?"

লীলা কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে থাকল, পরে নবীনকে ছেড়ে দিয়ে কিছু দূরে সরে এল, "আমাকে মেরে ফেলার কথা ভাব, না?"

নবীন লীলার কথা শুনে তার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেলল। অল্প অল্প হাসছিল লীলা। তাকে দেখতে দেখতে নবীন বলল, "কেন?"

"আমি কী জানি, বাঃ—" নবীনের দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল তা দেখে অস্থির হয়ে লীলা বলে উঠল।

নবীন হাসল, "হারকু সাহেব তা-ই বলে বটে।"

"কী?"

"তোমাকে খুন করার কথা।"

লীলা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। হারকু সাহেবের নাম শুনে তার মুখও নিবে এসেছিল। জড়ের মতন এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার খুব চেষ্টা করছিল বলে সে আবার নবীনের কাছে সরে এসে তার গা ঘেঁষে বসল।

কিছু পরে মুখ অনেকটা তুলে তার একটা হাত জোর করে টেনে নিজের গলার ওপর রেখে লীলা নবীনকে বলল, "চাপ দাও না গো।"

"দিলে কী হবে?"

"আমি মরব।"

লীলার উন্মুখ যৌবন মনে মনে উপভোগ করতে করতে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল নবীন, সে তাকে নিবিড় করে চেপে ধরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, "না।"

"কেন গো? এত পাপ করেছি, আমাকে মেরে ফেলবে না তুমি?"

লীলাকে বুকের ওপর তুলে নিল নবীন, দু-হাত দিয়ে তাকে খুব জোরে বাঁধল, এবং ভয়ঙ্কর এক প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হলেও থেমে থেমে বলল, "বউকে যে খুন করতে পারে সে করুক, আমি পারি না—" নবীন লীলাকে আদর করতে থাকল অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতন।

নবীনের কাছ থেকে কোনদিনও এমন আদর-সোহাগ চায়নি লীলা। নবীনের দেহ ও মনের এই রকম উলঙ্গ উৎকট প্রকাশ তার কাছে বড় যন্ত্রণার। অল্প আগে সে তার প্রতি নবীনের ঘৃণা ও আক্রোশের কথা ভেবে একটা তৃপ্তি অনুভব করেছিল এবং তার ধারণা হয়েছিল সে তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছে—খুন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এখন লীলা বুঝল তার ধারণা ভুল। নবীন আছে যেমনকার তেমন। এমন পুরুষ তাকে রাতের পর রাত উপভোগ করবার অধিকার রাখে বলে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল লীলার।

লীলা অসহায় মেয়ের মতন খুব করুণ করে নবীনের কানের কাছে মুখ এনে বলল, "আগে চলে যাবার কথা বলেছিলে না?"

নবীন কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"ঘর-সংসারে। বলেছিলে না, সার্কাস ভাল না? এখানে মানুষ থাকে?"

লীলা কিছু উষ্মা প্রকাশ করে বলল, "সার্কাস ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করার কথা বলে কত ঝগড়া করেছ—মনে নেই?"

নবীন হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "হুঁ, তা কী?"

"চল না গো, আমরা সার্কাস ছেড়ে পালিয়ে যাই?"

নবীন হেসে বলল, "তুমি যাবে না—"

"যাব, মাইরি বলছি।"

একটা নিশ্বাস ফেলল নবীন, খুব আস্তে কথা বলল, "কোথায় যাবে লীলা? যাবার কোন জায়গা আছে নাকি?"

"নেই?"

"না।"

"আমি রাজি আছি মাইরি," নবীনের বিশ্বাস জাগাবার জন্যে গলার স্বর আরও খানিকটা তুলে লীলা বলল, "সার্কাসে থাকতে আর মন চায় না। এই

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি যাব—ঠিক যাব। আমি রান্না করব, বাসন মাজব—সব করব—"

নবীন লীলাকে বাধা দিয়ে আবার হাসল, "দূর, এখন যাব কী গো? বাঘ-সিংহর সাথে খেলব না? রিং-মাস্টার হব না?"

বাঘ সিংহর কথায় ভোলার কান্নার কথা মনে পড়ে গেল লীলার। সে জিজ্ঞেস করল, "সিংহটা কেমন করছিল, একবার দেখলে না?"

"যাচ্ছিলাম তো, তুমি না আটকালে—যেতে দিলে কই!"

লীলা পাশ ফিরে পড়ে থাকল। এত সময় সে ভুল ভাবনা করে এসেছে—তাকে খুন করবার কল্পনাও করতে পারেনি নবীন। তার মতন জেগে-জেগে সে-ও সিংহর কান্না শুনছিল এবং খাঁচার কাছে যাবার জন্যেই বাইরে পা বাড়িয়েছিল।

নবীনের ঘৃণা ও আক্রোশের কথা মনে করে তার প্রতি যে মমতা জেগে উঠেছিল লীলার, এখন তা বাসি হয়ে এল। নবীনের পাশে আর বেশী সময় তার থাকবার ইচ্ছে হল না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওঠবার শক্তি ছিল না লীলার। এক খাট থেকে আর একটা খাটের দূরত্ব যেন অনেক, লীলা নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারল না। তার ভয় হচ্ছিল এখুনি মেজাজ খারাপ হবে এবং নবীন ভালবাসার আর দু-একটা কথা বললেই আবার ঝগড়া-তর্ক শুরু হবে। লীলা সিংহর কান্না শোনবার জন্যে কান পেতে থাকল।

লীলার গায়ের ওপর তখনো নবীনের একটা হাত ছিল। গাঢ় সুখে এখন সে নীরব, ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। কথা বলবার মতন অবস্থা তারও ছিল না। লীলার ঘাড়ের কাছে নবীনের নিশ্বাস সুড়সুড়ির মতন ফুটছিল। এখন তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল লীলা। পুলিস ফাঁড়িতে ঘণ্টা বাজল।

আর কিছু পরে, লীলা ও নবীন হারকু সাহেবের কড়া গলার আওয়াজ শুনে ছটফট করে উঠল। নিজের তাঁবুর মধ্যে থেকে না, সিংহর খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে মধ্যরাতে ক্ষিপ্তের মতন চীৎকর করে উঠল হারকু সাহেব, "এ মদন-বাবু, এ শালা রিং মাস্টার—আও, জলদি আও! দেখো, শালা কেতনা লোকসান কর দিয়া কোম্পানীকা—"

লীলা ভয় পেয়ে বলল, "কী হল গো?"

খাট থেকে লাফিয়ে নামল নবীন, ধুতি ঠিক করতে করতে বলল, "যাই দেখে আসি—"

সবচেয়ে আগে হারকু সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াল নবীন। পরে এল মাহুত অনন্ত কাশী বাচ্চু জোসেফ—একজন ছুটল রঘুনাথকে খবর দিতে। রিং মাস্টার মদনমোহন এল সকলের শেষে।

হারকু সাহেবের টর্চের আলো এখনো খাঁচার মধ্যে কাঁপছিল। সেই আলোয় নবীন দেখল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ভোলা। তার দেহ টান-টান, গলার নিচে মাংসের স্তূপ বড় বীভৎস। ভোলার চোখ খোলা, কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে, এখনো শুকনো দাগ লেগে আছে। সিংহী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহকে দেখছে। সার্কাসের সব মানুষ খাঁচার কাছে এসেই বুঝল ভোলা মরেছে।

হারকু সাহেব রিং মাস্টার মদনমোহনের মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে বিদ্রূপ করার মতন বলল, "ব্যস, ফিনিশ! আভি খুশ হলেন?"

অঘোরে ঘুমচ্ছিল মদনমোহন। কাশীর ডাকাডাকিতে উঠে এসেছে। তার নিজের শরীর কয়েকদিন থেকে ভাল নেই। জ্বর হয়েছে। হারকু সাহেবের কথার অর্থ বুঝল না মদনমোহন। তার খুশী হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে!

হারকু সাহেব টর্চ নিবিয়ে দিল। অন্ধকারে মানুষগুলো ছায়ামূর্তির মতন। তারা হারকু সাহেবের আদেশের অপেক্ষা করছিল। সিংহর মৃত্যুর খবর পেয়ে রঘুনাথ এদিকে এগিয়ে আসছে। কোন দোষ না থাকলেও মদন-মোহন বুঝতে পারছিল তাকে আরও অনেক কড়া কথা শুনতে হবে—যেন সে-ই বিষ খাইয়ে ভোলাকে মেরেছে।

"ভোলা চলে গেল বাবু", হারকু সাহেব আবার খাঁচার মধ্যে টর্চের আলো ফেলে রঘুনাথকে বলল, "ওই দেখেন।"

রঘুনাথ কাতর একটা শব্দ করল, "খুব খারাপ হল। দিন ভাল চলছিল এই ক্যাম্পে—এখানেই বেচারা শেষ হল—" সে কপালে হাত ছুঁইয়ে যারা-যারা তার কাছে ছিল তাদের প্রত্যেককেই লক্ষ করে বলল, "এখানে যা লিখা আছে তা তো হবেই—মানুষ কী করবে বলেন!"

হারকু সাহেব বলল, "সার্কাসের মানুষের মায়া দয়া কিচ্ছু নাই বাবু। বেচারা ভোলা সাঁঝ থেকে চিল্লাচ্ছিল, একটা লোকও খবর করল না। বেচারার মুখে একটুক পানি-টানি দিলে কত ভাল হত। আমি এসে দেখলাম সব ফিনিশ।"

রঘুনাথ তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলল, "মদনবাবু, আমি আপনাকে ওয়ার্নিং দিলাম—"

"সে আগে অনেক দেয়া হল—" কিছু শোক কিছু শাসন হারকু সাহেবের ভারী গলার স্বর অদ্ভুত করে তুলল, "এখন ডিশমিশ। শুনেন মদনবাবু, কাল সকালবেলা এখান থেকে ভেগে যাবেন, আপনার মতন মানুষ আমার সার্কাসে আউর থাকবে না—"

জ্বরের ঘোরে মাথা দপদপ করে উঠল মদনমোহনের। সে জানে হারকু সাহেব যা বলেছে তা করবেই। কিন্তু কাল সকালে কোথায় যাবে মদনমোহন! তার যাবার কোন জায়গা নেই। চেনাজানা মানুষ, আত্মীয়-বন্ধু—তার কেউ নেই। অন্ধকারে তার চোখ ভিজে উঠল।

"বাবু—হারকু সাহেব", এই আস্তানা অন্তত আর কিছুদিন আঁকড়ে ধরে রাখার ব্যাকুল ইচ্ছায় মদনমোহন বলল, "আমি কোথায় যাব?"

"ভোলা যেখানে গেল সেইখানে যাবেন—"

মদনমোহন রঘুনাথের পায়ের ওপর পড়তে গেল, "আমাকে কিছুদিন টাইম দিন বাবু, যতদিন ক্যাম্প আছে—"

"না-না," মদনমোহনের কান্নার মতন স্বর এবং খাঁচার মধ্যে ভোলার নিথর দেহ হারকু সাহেবকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলল, "আপনার সাথে যে দোস্তি করবে, সে ভোলার মতন ফিনিশ হবে। আউর কোই বাত নেই, কাল সকালে ভাগবেন। এ নবীন—"

"এই যে হারকু সাহেব?"

"সহদেব আউর বাহাদুরকে বলবি মদনবাবুর হিসাব চুকিয়ে দিবার জন্যে। আউর তুই এখন পুরা তৈয়ার তো? কাল থেকে তুই শালা রিং মাস্টার। ব্যস, এ বাচ্চু, এ কাশী, গাড্ডা বানাও। ভোল্লাকো নিকালো। আভ্‌ভি

মাট্টি দেনা চাইয়ে।”

ভদ্র পাড়ার মধ্যে তাঁবু পড়েছে। কাছাকাছি অনেক বাড়ি, অনেক মানুষ। রাতের অন্ধকারেই ভাল, দিনের বেলা গর্ত খুঁড়ে সিংহকে কবর দিলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে আশেপাশের মানুষ—এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখবে।

হারকু সাহেবের কথা মতন একটু পরেই শাবল কোদালের আওয়াজ উঠল। সার্কাসের জমির এক কোণে কয়েক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে ধরাধরি করে নামিয়ে দেয়া হল ভোলার হাড় জিরজিরে দেহ। কাজ শেষ করে মাটি চাপা দিতে সময় লাগল ঘণ্টা তিন-চার। হাওয়া ঝির ঝির করছে। ভোর হয়ে এল।

সকলে তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার পরেও সিংহের কবরের ওপর একটা মূর্তির মতন কিছু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পদচ্যুত রিং মাস্টার মদনমোহন। শেষ রাতের হাওয়ায় তার বুকের হাড় কনকন করছে, জ্বর বাড়ছে। সে পা ঘষল, চোখ তুলে আকাশ দেখল এবং আরও কিছু পরে হঠাৎ নিচু হয়ে জানোয়ারের মতন নখ আঁচড়াতে-আঁচড়াতে মাটি তুলে হাত মুঠো করল এবং চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভাঙা, অস্পষ্ট স্বরে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে থাকল।

“আর শালার মানুষ হওয়ার দরকার নাই আমার। ফের দুনিয়ায় এলে আমাকে তুমি জানোয়ার বানিয়ে দিবে ভগবান। না মরলে কোম্পানী জানোয়ারকে ডিশমিশ করবে না।”

মুঠি শিথিল হয়ে ঝুরঝুর করে মাটি পড়তে থাকল মদনমোহনের হাত থেকে, “তোকে অনেক চাবুক মেরেছি ভোলা! তুই-ও শালা আমাকে ফিনিশ করে গেলি—একদম ডিশমিশ!”

রুগীর মতন বিকারের ঘোরে এই রকম সব কথা বলে যাচ্ছিল মদনমোহন। তার বুকের ভিতর কান্না নিঙড়ে উঠছিল। কিন্তু চোখ শুকনো, কাঁদবার একটুও ইচ্ছে ছিল না মদনমোহনের।

॥ চব্বিশ ॥

হঠাৎ অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে যমুনা। জালের ওপর লাফিয়ে ওঠবার সময় তার কোমর চেপে আস্তে ঠেলা দিয়েছিল যুগল, যমুনা দড়ির সিঁড়ির কাছে এল এবং তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তরতর করে চলে এল পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচুতে—ট্র্যাপিজের কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর।

একধারে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা তার পাশে ঊষা আর হাসি। আরও দুজন মাদ্রাজী ছেলে আছে—কোহিনূর সার্কাস থেকে পুষ্পরাজ বেশী মাইনের কথা বলে নিয়ে এসেছে তাদের। পুষ্পরাজই তাদের শিক্ষাগুরু—তার কথা মতন তারা চুপেচুপে জুয়েল-এ চাকরি নিয়েছে। আর কারুর দিকে না, যমুনার চোখ ছিল পুষ্পরাজের দিকে।

কিছুদূরে যমুনার সামনাসামনি দোলনার মতন আর একটা ট্র্যাপিজ। সেখানে পা ঝুলিয়ে একা বসে আছে পুষ্পরাজ। মাত্র আর কয়েক মুহূর্ত। তার কাছ থেকে সঙ্কেত পেলেই শুরু হবে শূন্যে সন্তরণ। বিশ মিনিটের

সব চেয়ে রোমাঞ্চকর খেলা। শেখবার সময় অনেকবার বলেছে পুষ্পরাজ সময়ের নির্ভুল হিসেব দরকার। এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক হলেই হাত ফসকে ঝুপ করে নিচে পড়বে। নিচে মস্ত বড় জাল থাকলেও বেকায়দায় পড়লে সাংঘাতিক চোট লাগতে পারে।

এসব কথা অতবার শোনাবার দরকার নেই। যমুনা সার্কাসে নতুন আসেনি। সে জানে অন্যান্য খেলায় সময় সম্পর্কে এত বেশী সচেতন থাকতে হয় না বটে কিন্তু হাত-পা ফসকে জালের ওপর পড়লেই আঘাত এড়ান যায় না—মৃত্যুও হতে পারে।

কিন্তু এখন পুষ্পরাজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ট্র্যাপিজের কথা যমুনা ভাবছিল না। মাটি থেকে অনেক ওপরে কাঠের ছোট একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে সে তার কৃতিত্বের কথা ভেবে আপন মনেই কড়া আনন্দের স্বাদ পাবার চেষ্টা করছিল।

হারকুসাহেব বলেছে, এর পরের ক্যাম্পে তাকে সার্কাস কুইন করে দেয়া হবে। পরের ক্যাম্পে যেতে আর কতদিন বাকি আছে যমুনা মনে মনে তারও হিসেব করছিল। বেশী বাকি নেই, হয়তো আর দিন দশ বারো, কেননা টালিগঞ্জে জমি নেওয়া হয়েছে ঠিক এক মাসের জন্যে। হারকু সাহেব আরও বলেছে, চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু একমাসের বেশী এ-জমিতে আর খেলতে পারা যাবে না। জমির মালিক কিছুতেই রাজী নয়।

যমুনা যা চেয়েছিল তা পেয়েছে, যেমন হতে চেয়েছিল তেমন হয়েছে। হারকু সাহেব তার কাছে এখন ভগবানের মতন। এত তাড়াতাড়ি আর সকলকে ছাড়িয়ে তাকে কে আর এত ওপরে তুলে আনতে পারত! খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিবনাথের ক্ষমতার কথা জেনে গেছে যমুনা। তার ওপর নির্ভর করে থাকলে এ সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হত, তা ছাড়া লীলার মতন মেয়েকে দাবিয়ে রেখে রাতারাতি এত উঁচুতে উঠে আসতে পারত না। শিবনাথের সংগে আবোল-তাবোল বকে তাকে ভালবেসে ভুল করেছিল যমুনা। তবে এখন তার সুখ এই যে চাকা ঘুরে গেল বড় তাড়াতাড়ি এবং তার ভুল ভাঙল—লীলাকে সে ঠেলে নিচে ফেলে দিল। লীলার ওপর খানিকটা ঈর্ষা এখনো সম্ভবত আছে যমুনার।

"রেডি?" হাঁটুতে ট্র্যাপিজ আঁকড়ে মাথা নিচে ঝুলিয়ে সঙ্কেত করল পুষ্পরাজ। প্রথমেই যমুনার পালা। সে দু-হাত দিয়ে ট্র্যাপিজের লোহার রড শক্ত করে ধরে স্যুয়িং নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হল।

কয়েকদিন আগেও প্রথম স্যুয়িং ছিল ঊষার। যমুনা ঠিক জানে না কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস হারকু সাহেব পুষ্পরাজকে বলে দিয়েছে, তাকে প্রথম স্যুয়িং করবার সুযোগ দিতে। এখনো ভল্ট দিতে পারে না যমুনা। খুব দেরী লাগবে না, আর কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই সে দুবার ভল্ট দিয়ে অন্য ট্র্যাপিজের রড ধরতে পারবে। তারপরই সে হয়ে যাবে ঊষার সমান-সমান। এবং আর একটু চেষ্টা করলেই সে হয়তো একদিন তিনবারও ভল্ট দিতে পারবে।

তখন ঊষাও তাকে ঈর্ষা করবে। যমুনা ঠিক বুঝতে পারে না ঊষা এখনো তাকে ঈর্ষা করে কি-না। কয়েকদিন থেকে সে বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। যমুনার দিকে তাকিয়ে আগের মতন হাসে না বেশী, কথাও বলে না।

পুষ্পরাজ তাকে শুনিয়ে প্রায়ই যমুনাকে বলে, "তুমারা মাফিক আর্টিস্ট ইণ্ডিয়ামে জাস্তি নেই হ্যায়। এতনা জলদি-জলদি ট্র্যাপিজ কোই শিখতা নেই।"

সুয়িং দিয়ে আবার প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল যমুনা। পা নাচাতে-নাচাতে ট্র্যাপিজ ক্লাউন যুগল গেল এবার। তার মাথার টুপি খুলে পড়ল নিচে, জালের ওপর। ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করছে যুগল, যেন খুব ভয় পেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, দর্শকরা এখন চুপ—যুগলের ভাঁড়ামি দেখে হাসছে না।

কেন ক্লাউন হতে গেল যুগল যমুনা তা-ও জানে না। কম বয়েস তার, অনেক খেলা জানে। এমন কোন মানুষ হঠাৎ ক্লাউন হতে যায় না কিন্তু যুগল কোন আপত্তি করেনি, এক কথায় রাজী হয়ে গেছে। তাকেও খুব ভাল লাগে যমুনার। কম কথা বলে সে, ছেলে হিসেবে একটু বেশী লাজুক। অন্য খেলার সময় এরিনায় এলে কোন রকমে কাজ সেরে ফিরে যায় যুগল, দর্শকদের হাত নেড়ে অভিবাদন করলেও মুখ তুলে তাকায় না কারুর দিকে। হারকু সাহেবের প্রিয়পাত্র বলে যমুনাও তাকে পছন্দ করে।

"এত খেলা জানেন আপনি", যমুনা একদিন তাকে বলেছিল, "দুম করে ট্র্যাপিজের ক্লাউন হলেন কেন? এ খেলাটাও শিখে নিলে হত না? ভয় লাগে নাকি?"

"ভয়?" মাথা চুলকোতে চুলকোতে হেসেছিল যুগল, যমুনার মুখের দিকে তাকায়নি, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল উঁচু করে শুকনো মাটি দেখতে দেখতে বলেছিল, "আরে দিদি, সেসব আমার নেই। মরি তো মানুষের সামনে মরব, খেলা দেখাতে দেখাতে মরব। বিছানায় শুয়ে ধুঁকে-ধুঁকে ফিনিশ হয় মেয়েমানুষ—"

যমুনা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, "এই চুপ!"

"মাইরি দিদি, রাগ করলেন?"

"আমি কি বিছানায় ধুঁকে-ধুঁকে মরব?"

"আরে না না, আপনার—আপনার বোনের সাহস কত! ট্র্যাপিজ খেলার সময় দেখি না।"

"দেখেন নাকি?"

"কে না দেখে! মাস্টার কী বলেছে, ইণ্ডিয়ায় আপনার মতন সাহস কারুর নেই, তা-ও শুনেছি।"

যমুনা যুগলের কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিল, হাসিকে এক সময় বলেছিল, "একদিন ওকে রান্না করে খাওয়া না-রে।"

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করেছিল হাসি। প্রথমে ভাঙতে চায়নি, পরে খুব নিচু স্বরে যমুনাকে বলেছিল, "জানিস দিদি, ও ভারী অসভ্য।"

"কেন রে?"

"আমাকে সব যা-তা বলে, গায়ে হাত দেয়—"

হাসির স্বরে মৃদু অনুযোগ ছিল, রাগ কিম্বা বিরক্তি ছিল না। যমুনা হাসির কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিল চুপেচাপে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে তারা। কিছু সময় কোন কথা বলতে পারেনি যমুনা, মোহনলালের কথা মনে পড়ছিল বলে তার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল। বয়েস কম হাসির, ভাল-মন্দ বোঝবার মতন বুদ্ধি হয়নি। যুগলের সঙ্গে মাখামাখি করবার আগে মোহনলালের কথাটাও তার ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল, "যুগলকে মনে ধরেছে তোর?"

"যাঃ!"

"ন্যাকামি রাখ, আমার কাছে ঠিক কথা বল?"

"আমি কী জানি", হাসি অভিযোগ করবার মতন স্বরে বলেছিল, "ওই তো আমার সাথে যেচে-যেচে কথা বলে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে—"

"করুক না, ছেলে তো ভালই—" হঠাৎ যমুনা জিজ্ঞেস করেছিল, "মোহনলালের সাথে কথা নেই তোর?"

হাসির মুখ যমুনার কথার ঝাপটার পলকে ভিজে-ভিজে নরম হয়ে এল। সে যমুনার কথায় উত্তর দিল অনেক পরে, দোষ স্বীকার করবার মতন ঠাণ্ডা গলায়, "সার্কাসে থাকবার ইচ্ছা নেই তার। ঘরে থাকবার সাধ—"

"তা কী?"

"তা-ও তো কিছু বলে না। বাবাকে রাখবার কথা বলেছিলাম একদিন, চুপ করে ছিল।"

"বাবার দায় ঘাড়ে নেবে কে রে? যুগল নেবে নাকি ভাবিস? বাবার কথা ভেবে তুই নিজের পায়ে কুড়ুল মারবি?"

যমুনার কথা শুনে সব সঙ্কোচ মুছে গিয়েছিল হাসির মন থেকে। সে তাকে অবজ্ঞা করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ মারব।"

"তবে মর!"

কিছু পরে হাসি যমুনাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে আরও বলেছিল, "মোহনবাবুকে যেমন বলেছি, যুগলবাবুকেও তেমন বলব—বাবার ভার যে না নেবে সে যেন আমার সাথে পীরিত করার বাসনা না করে।"

"উঃ, দরদ কত!" হঠাৎ মেজাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল যমুনার, রাধানাথ বাবুকে নিজের খেয়ালে আঘাত করবার জন্যে সে মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলেছিল, "মানুষ তোর সাথে পীরিত করবে না বাবার সাথে করবে?"

"দু-জনের সাথেই করবে।"

"সব দেখব আমি!"

যমুনা ভেবেছিল হাসি আর কথা বলবে না, চুপ করে থাকবে। কিন্তু হয়তো যুগল আর মোহনলালকে নিয়ে তার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল বলে সে যমুনাকে ধমক দেয়ার মতন চড়া গলায় বলেছিল, "তুই তোর নিয়ে থাক দিদি। বাবার কথা বাদ দে, আমার কথা বাদ দে—"

কয়েক মুহূর্ত আবাক হয়ে হাসির মুখের দিকে তাকিয়েছিল যমুনা, তার বিরূপ হয়ে ওঠার কারণ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি, পরে সে-ও খুব জোরে বলে উঠেছিল, "নিজেকে নিয়ে থাকব না তো কাকে নিয়ে থাকব, শুনি? তোর পীরিতের বাপ ভাববে আমার কথা?"

"কার কথা ভাবিস তুই?" হাসি তীক্ষ্ন গলায় নিজের মনের সব জ্বালা যমুনার মুখের ওপর ঢেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, "শিবুদার কথা ভাবিস?"

যমুনা আর সহ্য করতে পারেনি, ধৈর্য হারিয়ে হাসির চুল ধরে তার গালে জোরে একটা চড় মেরে বলেছিল, "ছোট মুখে বড় কথা, বড় বাড় বেড়েছিস হাসি, সাবধান!"

"মারলে কী হবে?" হাসি কিছু দূরে সরে গিয়ে কান্না-কান্না গলায় বলেছিল, "তুই আমাকে মারবি, বাবাকে মারবি—মানুষের নামে মিছে কথা লাগিয়ে—"

"কার নামে মিছে কথা লাগিয়েছি, বল?"

"শিবুদার নামে তুই বলিসনি হারকু সাহেবের কাছে, বাবুর কাছে? তার মতন ভাল মানুষ হয়—" একটু চুপ করে থেকে বাইরে তাকিয়ে হাসি স্বর

কিছু নামিয়ে বলেছিল, "এখন আমার সাথে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন চেনেই না!"

"কে আগে লাগিয়েছে তার নামে? তোর পীরিতের বাপ না—" প্রথম কয়েকটা কথা আস্তে বলেছিল যমুনা, পরে ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় হাসির মুখের কাছে মুখ এনে চিৎকার করার মতন বলে উঠেছিল, "লাগিয়েছি, বেশ করেছি। মিছে কথা বলে ধোঁকা দেয় যে মানুষ, তাকে মাথায় নিয়ে নাচব? সে তোকে না চিনলে কী এল-গেল। তোরই বা দরকার কী তার সাথে কথা বলবার!"

"না, দরকার আর কী।"

হাসিকে চড় মেরে থামিয়ে দিতে চাইলেও এখনো এক-একবার অস্থির হয়ে পড়ে যমুনা। ট্র্যাপিজের রড যেন বড় পিছল, তার হাত ফসকে যেতে চায়। স্যুয়িং নেয়ার সময় উরুতে হঠাৎ টান পড়ে ব্যথা হয়। আলো তার চোখে ঝাপসা হয়ে যায়। এক ট্র্যাপিজ থেকে পিছন ফিরে আর এক ট্র্যাপিজে যাবার সময় তার মনে হয় সে পড়বে জালের ওপর—অক্ষম হয়ে যাবে। সার্কাস কুইন সে সম্ভবত কোনদিনও হতে পারবে না। সকলের চেয়ে ওপরে যা দিয়ে ওঠে মানুষ, যেমন করে ওঠে, যমুনা তেমন করে ওঠেনি—একজন ভাল মানুষের ঘাড়ের ওপর পা রেখে সে শেয়ালের মতন উঠে এসেছে। সে-মানুষ তাকে ক্ষমা করবে না।

এসব কথা যখন যমুনার মনে হয়, তখন সে কৃতিত্বের অহঙ্কার অনুভব করতে পারে না। এবং সার্কাস কুইন হওয়ার ইচ্ছেও জুড়িয়ে আসে। তখন সে ভাবে শিবনাথের কথা মতন তার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে গেলেই হত। খেলার জন্যে জীবন তুচ্ছ করবার কোন মানে হয় না। এক ট্র্যাপিজ থেকে আর এক ট্র্যাপিজে যেতে যেতেই এত কথা কখনো কখনো মনে আসে যমুনার, আর তার কাছে খেলা ও জীবন দুই-ই ঝাপসা হয়ে যায়।

সেদিন সকালে রঘুনাথের তাঁবু থেকে শিবনাথ চলে যাবার পরেও আরও অনেক সময় যমুনা হারকু সাহেব আর রাধানাথবাবু সেখানে বসেছিল। তার কথা শুনে রঘুনাথের কী মনে হয়েছিল যমুনা বুঝতে পারেনি। কিন্তু শিবনাথ চলে যাবার পর তার খুব লজ্জা হচ্ছিল—কেমন করে অত কঠিন কথা সে তাকে বলতে পারল সেদিন। রাধানাথবাবুর ওপর যমুনার কোন টান থাকবার কথা নয়—সেদিন তার হয়ে সে শিবনাথের সঙ্গে ঝগড়াই বা করল কেন!

শিবনাথ চলে যাবার পর হারকু সাহেব বলেছিল, "আঁখ দেখিয়ে গেল বাবু, আপনি শুনলেন সব বাত?"

"হাঁ, শুনলাম।"

"আভি বিচার আপনি করবেন। যমুনা আছে, রাধানাথবাবু আছে—তারা আপনার কছে কোমপ্লেন করবার লিয়ে এল—"

রঘুনাথ শুকনো হেসে বলেছিল, "আমার বিশ্বাস হয়েছিল শিববাবু যমুনাকে সাদি করবে—"

রাধানাথবাবু আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের সামনে একটা হাত তুলে হেসে উঠেছিল হারকু সাহেব, "সাচ বাত কিনা বলুক যমুনা—" তার কথার অপেক্ষা না করেই সে বলেছিল, "শিববাবুর বাত বিলকুল ঝুট বাবু—"

"হাঁ ঝুট", রাধানাথবাবু হাঁটুর ওপর থাবড়া মেরে চিৎকার করে উঠেছিল,

"বিয়ে করবার আর লোক পেল না যমুনা! বিয়ে করবার জন্যে সার্কাস কোম্পানীতে এসেছে ও?"

"হাঁ-হাঁ, ঠিক বাত রাধানাথবাবু! সার্কাসে যমুনা এল খেলবার লিয়ে। সাদির ভাবনা ভাবলে খেল খতম হয়ে যাবে।"

ঠিক কথাই বলেছে হারকু সাহেব। তার কথা মেনে নিতে পারলেও রাধানাথবাবুকে সহ্য করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে যমুনার পক্ষে। রাধানাথবাবু তার বিয়ে দেয়ার জন্যে তাকে নিয়ে সার্ক্যসে আসেনি। যে জন্যে এনেছে তা করতে পেরেছে যমুনা— সে জেনারেল ম্যানেজারকে আয়ত্তে এনে নতুন খেলার সুযোগ পেয়েছে—মাইনে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছে। শিবনাথ যা করতে পারেনি, যা করতে পারত না—হারকু সাহেব তা-ই করে দিয়েছে।

এখন শিবনাথের ভাবনা ভাববার দরকার কী যমুনার!

পুষ্পরাজের নির্দেশ মতন সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। ঊষা একা দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাপিজের প্ল্যাটফর্মের ওপর। আর কাউকে থাকতে দেয়নি পুষ্পরাজ। ঝুপঝুপ করে পর-পর কয়েকবার শব্দ হয়েছিল। খেলা শেষ করে একে-একে নিচে সাদা লম্বা জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে হাসি যমুনা গোপালন বিজয়ন আর যুগল। এখন একদিকে পুষ্পরাজ আর একদিকে ঊষা।

"রেডি?"

"নেই", ঊষা স্যুয়িং নিতে পারল না। বড় অন্ধকার। নিচে দর্শকদের কথা ভুলে কাতর স্বরে বলে উঠল, "বাত্তি বুতায় দিয়া কাহে?"

"আঁধারমে খেল হোগা। রেডি?"

"নেই, নেই। কুছ নেই দেখতা। হাম নেই সেকেগা।"

"ডরো মত, রেডিয়ম জ্বলতা দেখো। চলা আও—"

ঊষা পুষ্পরাজের কথা মতন ঘন অন্ধকারে দেখল তার গায়ে সরু তার বাঁধা, সেখানে রেডিয়ম চিকচিক করছে। ট্র্যাপিজে এবং পুষ্পরাজের গায়েও আলোর রেখা খেলছে। ইচ্ছে করলে ঊষা খেলা দেখিয়ে দিতে পারবে ঠিক, কিন্তু তার সাহস হল না। অন্ধকারের খেলা তাকে পুষ্পরাজ কখনো শেখায়নি।

অসহিষ্ণু পুষ্পরাজ তার নাম ধরে ডাকল, "ঊষা", এবং তার পাশে একই প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে বলল, "বহুৎ রুপেয়া মিলেগা, এয়সা খেলা ই সার্কাসমে কোই নেই দেখা। দেখো হাজার আদমী খেলা দেখনে আয়া—"

নিচে তাকাল ঊষা। দেরী হচ্ছে বলে চিৎকার করছে দর্শকরা। ব্যাণ্ডের মাচা থেকে একটা বিলিতি সুর ভেসে আসছে। মাইকের মধ্যে দিয়ে আসা গোকুলবাবুর গলার স্বরও ঊষা শুনল। সম্ভবত মাইক বিকল হয়েছে। গোকুলবাবুর কথা কেটে-কেটে যাচ্ছিল।

"এবার দেখুন আশ্চর্য খেলা। আঁধারে শূন্যে সন্তরণ। এই চমকপ্রদ সন্তরণ করছেন ভারত বিখ্যাত ট্র্যাপিজ শিল্পী পুষ্পরাজ ও ঊষা। আঁধারে শূন্যে সন্তরণ।"

পুষ্পরাজ ঊষার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, "গোকুলবাবু অ্যানাউন্স কর দিয়া। শুন ঊষা, হাম দোসরা ট্র্যাপিজ মে যাতা। দো মিনিট টাইম দেগা তুমরা। নেই খেলনেসে নিকাল যাও। হাম যমুনাকো খেলনে বোলেগা—"

কথা শেষ করে চলে গিয়েছিল পুষ্পরাজ, ঊষাকে স্যুয়িং নেয়ার জন্যে শেষবারের মতন সঙ্কেত করছিল। তার এমন অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ

খ‍ুঁজে পাচ্ছিল না ঊষা। আরও কয়েক মুহূর্ত সে ইতস্তত করল। এবার স্যুয়িং না করলে অসন্তুষ্ট হবে পুষ্পরাজ এবং সে যা বলেছে তা-ই করবে—যমুনার সঙ্গে খেলবে।

পুষ্পরাজের গায়ের সরু তার থেকে, তার ট্র্যাপিজের দড়ি থেকে রেডিয়মের যে আলো চিকচিক করছিল তা লক্ষ করে স্যুয়িং করল ঊষা এবং প্রথমেই দু-বার ভল্ট খেয়ে তার হাত ধরল। কিন্তু এখন কী হবে? প্ল্যাটফর্মে আর কেউ নেই। সময়ের নির্ভুল হিসেব করে কে তার দিকে অন্য ট্র্যাপিজ ঠেলে দেবে?

"ঊষা, এতনা টাইম লেতা কাহে?"

"ক্যায়সে যায়গা হাম?"

"প্ল্যাটফর্মমে গোপালন হ্যায়। দেখো দোসরা ট্র্যাপিজ আ গিয়া। হামরা হাত ছোড়—"

"নেই। প্ল্যাটফর্মমে কোই নেই হ্যায়।"

আগে সন্দেহ করেনি ঊষা, এখন সে স্পষ্ট বুঝল পুষ্পরাজ ইচ্ছে করেই সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে, সকলকে সরিয়ে দিয়েছে। পুষ্পরাজের হাত ধরে অসহায় একটা মেয়ের মতন মাটি থেকে অনেক ওপরে ঝুলতে ঝুলতে তার চিঠির কথা মনে হল ঊষার এবং তার ভয় হল সে তাকে নিচে ফেলে দেবে।

"ঊষা, হামরা হাত জবল যাতা, ছোড়—"

"নেই ছোড়ে গা। তুমরা মতলব হাম সমঝ গিয়া।"

"কেয়া মতলব?"

"তুম হামরা গিরায় দেগা, দেশমে ভাগ যায়গা। উ নেই হোগা—কভভি নেই হোগা। আম তুমকো যানে নেই দেগা—"

কথা শেষ করতে পারল না ঊষা। তার পেটে খুব জোরে আঘাত করেছে পুষ্পরাজ, জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। ঊষা জালের ওপর পড়ে ছটফট করছে। খুব গোলমাল হচ্ছে, তাকে ঘিরে আছে অনেক মানুষ। ঘাড়ে লেগেছে ঊষার। সে মাথা তুলতে পারছে না, কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।

"মা—মা গো!" ঊষা যন্ত্রণায় চীৎকার করে খাটের ওপর উঠে বসল।

"কেয়া হুয়া?" নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছিল পুষ্পরাজ, ঊষার চীৎকার শুনে চোখ খুলল। বিরক্ত হয়ে তার খাটের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "পেটমে কুছ গড়বড় হুয়া?"

স্বপ্নের উত্তেজনায় শরীর কাঁপছিল ঊষার। ভয়ে তার স্বর বন্ধ হয়ে এসেছিল। পুষ্পরাজের একটা হাত শক্ত করে ধরে অন্ধকারে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপচাপ বসেছিল।

"কেয়া হুয়া বোল না?" ঊষার হাত ঝাঁকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল পুষ্পরাজ।

ঊষা আরও কিছু সময় বোবার মতন তাকিয়ে থাকল, পরে খুব নিচু স্বরে ছেড়ে ছেড়ে বলল, "এক স্বপন দেখকে বহুৎ ডর লাগা—"

বিরক্তির ছোট একটা শব্দ উচ্চারণ করল পুষ্পরাজ। ঊষার মুঠি থেকে হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের খাটে শুয়ে পড়ে অল্প শেলষের সঙ্গে হঠাৎ বলল, "কেয়া দেখা? এতনা জোরসে চিল্লায়া—কেয়া, কুন্দনলাল জুত্তিসে মারতা?"

কোহিনুর সার্কাসের কুন্দনলালের কথা, এমন কি তার ছেলেমেয়েদের কথাও ভুলে গিয়েছিল ঊষা—পুষ্পরাজ আবার মনে পড়িয়ে দিল। ঊষা কী

বলবে হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। একবার তার ইচ্ছে হল পুষ্পরাজের মুখের ওপর বলে, হ্যাঁ।

কিন্তু ঊষা তা বলল না। স্বপ্নের কথা মনে করে পুষ্পরাজকে তার আঘাত করবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে সে বলল, "হাম দেখা তুম হামরা ট্র্যাপিজসে গিরায় দিয়া।"

"হাম?" একটু ইতস্তত করে পুষ্পরাজ বলল, "কাহে?"

"কেয়া জানে!"

আর কিছু বলল না পুষ্পরাজ, পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। ঊষা তখনো তাকিয়েছিল তার দিকে। ঊষার ঘাড় সত্যিই এখন ব্যথায় টনটন করে উঠছিল।

শুয়ে পড়লেও তার ঘুম আসবে না বলে সে সারারাত জেগে-জেগে পুষ্পরাজকে পাহারা দেয়ার কথা ভাবছিল। হয়তো স্বপ্নের জন্যে ঊষার ভয় হচ্ছিল সে আজ রাতেই তাকে এখানে একা ফেলে রেখে দেশে পালিয়ে যেতে পারে।

॥ পঁচিশ ॥

শুধু একজন মানুষের সঙ্গেই সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে চেয়েছিল শিবনাথ, যার আসন তার চেয়ে অনেক নিচে— যে তার শত্রুর মতন। তাকে পরাস্ত করে শিবনাথ একমাত্র যমুনার কাছেই কথা রাখতে চেয়েছিল, এবং নিজের বুদ্ধি ও শক্তিরও প্রমাণ দিতে চেয়েছিল। কেননা শেষ যেদিন যমুনার তাঁবুর বাইরে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, সেদিন যমুনার অবিশ্বাস ও অসন্তোষ তাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। তার কথা রূঢ়, শাসনের মতন। সেসব নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল শিবনাথকে, সেদিন তাকে আশ্বাসের একটি কথাও বলতে পারেনি সে।

কিন্তু শিবনাথ জানত সুযোগ হবে, সময় আসবে। যমুনাকে যা কথা দিয়েছিল শিবনাথ সে তা একদিন রাখবেই। তার পথ সুগম হয়ে আসছিল। হারকু সাহেবের মিথ্যা কথার জন্যে শিবনাথের ওপর প্রথম প্রথম কিছু অসন্তুষ্ট হলেও রঘুনাথ তাকে আবার আগের মতন বিশেষ মান-মর্যাদা দিচ্ছিল এবং শিবনাথের বিশ্বাস হচ্ছিল সে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যমুনার সঙ্গে তার মধুর সম্পর্কের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে পারবে। হারকু সাহেব আসলে যা, তা আর একবার নতুন করে যমুনাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল শিবনাথ।

যেদিন যশোদা লিলুয়ায় ফিরে গেল এবং রঘুনাথকে স্পষ্ট করে তার সঙ্গে যমুনার সম্পর্কের কথা প্রকাশ করতে পেরেছিল শিবনাথ, সেদিন তার ইচ্ছে ছিল সাহস করে যমুনার তাঁবুতে যাবে, রাধানাথবাবুর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করবে এবং সময় মতন মোহনলালের নাম করে হাসির সঙ্গে হালকা রসিকতা করার চেষ্টাও করবে। এ কদিনের দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝি কয়েক মুহূর্তেই মিটিয়ে ফেলবে শিবনাথ।

কিন্তু তার বাসনা চরিতার্থ হল না। হারকু সাহেবের সঙ্গে যমুনা ও রাধানাথবাবুকে রঘুনাথের তাঁবুতে আসতে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়ে

গিয়েছিল শিবনাথ এবং সতর্ক প্রহরীর মতন তাদের রক্ষা করতে চেয়েছিল বলে সেখান থেকে উঠে যেতে পারেনি। রঘুনাথকে সেদিন কিছু আগে সে তার বিয়ের কথা জানিয়েছিল এবং হারকু সাহেবকেও বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে এরা তার খুব কাছের মানুষ।

পরে বিমূঢ় হয়ে গেল শিবনাথ। রাধানাথবাবুর ব্যবহার বড় অদ্ভুত, রহস্যের মতন। যমুনাও যেন অনেক দূরের, বড় অচেনা। তার দৃষ্টিতে কিম্বা ভঙ্গিতে পূর্ব পরিচয়ের কোন ইঙ্গিত ছিল না। যে মানুষের কারসাজিতে এমন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল সে-ও ছিল শিবনাথের ঠিক সামনেই। তার দিকে তাকিয়ে একটা অন্ধ আক্রোশ শিবনাথের মনে ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। কিন্তু দৈব এমনই প্রতিকূল যে সব বুঝলেও শত্রুকে লক্ষ করে একটা কড়া কথাও উচ্চারণ করবার সুযোগ হল না শিবনাথের—সবই নিক্ষিপ্ত হল যারা তার আপনার জন তাদেরই উদ্দেশে। যে সম্পর্ক সে আবার সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তুলতে চেয়েছিল তা আরও তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠল।

রঘুনাথের সামনেই বড় উগ্র হয়ে উঠেছিল শিবনাথ—সকলকে শাসিয়ে এসেছিল। এবং কয়েকদিন যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের মতন একটা অস্থিরতার মধ্যে হিমসিম খেতে খেতে সে বুঝল তার করবার কিছুই নেই। তার কথা তার নিজের কাছেই প্রলাপের মতন মনে হল। এখন ঘোলা জল অনেকটা উপচে উঠেছে, তা পার হয়ে যমুনার কাছে আবার পৌঁছনো বড় কঠিন।

কিন্তু তার কাছে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না শিবনাথের। সব শেষ হয়ে গেছে। যা খুশী তা করুক যমুনা, যার কাছে খুশী তার কাছে যাক। শিবনাথের আর কোন দায় নেই, কোন আকর্ষণ নেই। আস্তে আস্তে রাগ নিবে এল শিবনাথের, অস্থিরতাও প্রশমিত হয়ে এল। রঘুনাথের কাছে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছে বলে বড় লজ্জা পেল সে এবং তা গোপন করবার জন্যে সকলের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল।

শিবনাথের মনে হল সে-ও এতদিন নিজেকে অসম্মান করেছে, তার শত্রুর মতন হীন কাজ করে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে। সার্কাসের গুরুভার বহন করে মেয়েমানুষের হাতের পুতুল হয়ে ওঠবার জন্যে সে আসেনি এখানে।

সে এসেছে শক্তিচর্চা করতে, সাধনা করতে—সে এসেছে তার দুরূহ ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে একটা সার্কাস পার্টিকে বড় করে তোলবার জন্যে—ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে বিভোর ও বিব্রত হয়ে থাকতে নয়। এতদিন ভাবনায়-ভাবনায় তার শক্তির ক্ষয় হয়েছে, ব্যাঘাত হয়েছে শরীরচর্চায়, সাধনায় বিঘ্ন ঘটেছে।

নিজেকে ধিক্কার দিল শিবনাথ, অনুতাপ করল। তার জগদ্বিখ্যাত হওয়ার যে-স্বপ্ন সার্কাসের ভিতরের পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল, তা আবার তুলে আনল শিবনাথ এবং একনিষ্ঠ আবেগে প্রথম জীবনের মতন আবার মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করল দুরূহ ক্রীড়াসাধনে।

"নোয়েল সাহেব, কাগজ দিন—"

"কী লিখবেন শিববাবু, চিঠি?"

"না", দৃঢ় গলায় শিবনাথ প্রোগ্রাম মাস্টার নোয়েল খানের তাঁবুর মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল "চিঠি-ফিঠি লেখবার সময় আমার নেই। দুটো-একটা নম্বর করতে দেবেন না আমাকে। আমি প্রত্যেক খেলায় চারটে নম্বর করব। আমি দাঁত দিয়ে বেঞ্চি তুলব, ঘোড়া তুলব। ওয়েট লিফটিং করব, হাতিও বুকে তুলব। এসব নম্বরের কথা লিখুন, আমি সই করে দিচ্ছি।"

কোন কারণে শিবনাথ খুব উত্তেজিত হয়েছে মনে করে কৌতূহল প্রকাশ করল প্রোগ্রাম মাস্টার, "কী হল শিববাবু, এত রাগ হল কেন?"

শিবনাথ হেসে বলল, "রাগ হবে কেন? ফাঁকি দিলাম না অনেক দিন? খেলায় বেশী করে মন না দিলে একদম গাড্ডায় পড়ে যাব নোয়েল সাহেব। শক্তি কমে যাবে, খেলা পড়ে যাবে। তাই আগে থেকেই সাবধান হতে চাই।"

"বাঃ বাঃ, শিববাবু! এমন মেজাজ থাকলে আপনি বহুৎ দিন ফিট থাকবেন—দুনিয়াজোড়া নাম হবে আপনার।"

"তাই তো চাই নোয়েল সাহেব।"

খেলার মধ্যে ডুবে গেল শিবনাথ। দর্শকের দিকে তাকায় না, হাততালির শব্দ শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। এমনকি, তার খেলার সময় গোপাল আর করালীকান্ত যখন তার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আসে, তখনো হাসে না সে—ধাক্কা মেরে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়।

নিজের শক্তি ও প্রতিভায় আবার অগাধ আস্থাবান হয়ে উঠলেও এখনো এক এক সময় হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যায় শিবনাথ, ভিতরে ভিতরে পরাজয়ের একটা জ্বালানুভব করে। অসংখ্য মানুষ তার শক্তির পরিচয় পেয়ে চমকে যাক, মুগ্ধ হোক—যমুনার কাছে সে ভীরু এবং দুর্বল হয়েই থাকল, শক্তির কোন পরিচয় সে তাকে দিতে পারল না।

আজকাল রাতে আর বাইরে বার হয় না রাধানাথবাবু, হারকু সাহেব রোজই তাকে তার তাঁবুতে ডেকে নিয়ে যায় এবং সে-ই তাকে ধরে পৌঁছে দেয় হাসি আর যমুনার কাছে। জোর করে অন্য দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেও তখন বড় দুর্বল হয়ে পড়ে শিবনাথ। কেননা হারকু সাহেব অনেক সময় বসে থাকে বেহুঁশ রাধানাথ বাবুর তাঁবুতে। শিবনাথ ধরে নেয় সে তখন তার মতন পাশে বসে যমুনার, তার সঙ্গে গল্প করে, গায়ে হাত দেয়।

এসব ভাবতে ভাবতে শিবনাথের জগদ্বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন আবার ঝাপসা হতে থাকে, একটা যন্ত্রণায় গভীর রাতে আবার সে বড় অস্থির হয়। হারকু সাহেবের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে কান পেতে থাকে শিবনাথ। সে যমুনার তাঁবু থেকে বার হবে কখন?

ইংরেজী মাসের প্রথমেই এবার দোল পূর্ণিমা। দু-একদিন আগে রঘুনাথ গেছে লিলুয়ায়। হারকু সাহেবও কাল রাতে বেরিয়ে গেছে। এখনো ফেরেনি। মাঝে মাঝে সে অল্প সময়ের জন্যে বাইরে যায়। কোথায় যায় কেউ খবর রাখে না।

দোলের দিন দুপুরের খেলা বন্ধ। মালিক কিংবা জেনারেল ম্যানেজার দুজনেই ছিল না বলে সকলে একটু বেশী ফূর্তি করছিল। একটা বড় পিচকিরি কিনেছে বামন ক্লাউন গোপাল, বালতিতে রং গুলে সে বেলা আর শান্তার পিছনে ছুটছিল। কে বেগুনি কালির বড় ছাপ মেরে দিয়েছে গোপালের পিছনে। লেখা আছে, গাধা।

বাঘ-সিংহর খাঁচায় আবীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল নবীন। সে নতুন রিং মাস্টার এখন, জন্তু-জানোয়ারের গায়ে রং না দিয়ে থাকতে পারবে কেন? হাতির চোখ বাঁচিয়ে তাকেও আবীর মাখিয়ে লাল করে দিয়েছে নবীন। ভাল্লুকের সাদা কপালেও আবীরের ছিটে পড়েছে। ঘোড়ার গায়েও লাল আভা।

"এই গোপালবাবু, কী করলেন?" চোখ রগড়াতে রগড়াতে শান্তা বলল,

"একটাই শাড়ি যে আমার, তা-ও ভিজিয়ে দিলেন?"

"দেব না? বাগে পেয়েছি আজ—" বালতিতে পিচকিরি ডুবিয়ে গোপাল বলল, "শাড়ি ভিজছে তো কী হয়েছে, খুলে ফেল না মাইরি, ভাল করে দেখি তোমায়—"

"যাঃ, ভারী অসভ্য আপনি!"

টুনি মাসি গোপালের কথা শুনতে পেয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে হাসল। তাকে লক্ষ করে পিচকিরি তুলেছিল গোপাল, টুনি মাসী হাত তুলে বলল, "আরে থাম থাম গোপাল, আমাকে ভিজিয়ে আর কী করবে?"

"ছুঁড়িদের ভিজিয়ে দিয়েছি টুনি মাসী।"

"তা বেশ করেছ, এবার ধর না একটাকে। একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চুমু খাও—"

গোপাল টুনি মাসীর কথা শুনে একটা সলজ্জ ভঙ্গি করে বলল, "ধ্যেৎ!"

"কেন, বামন বলে কি যৌবন নেই তোমার?"

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গোপালকে দেখতে দেখতে ফিক ফিক করে হাসছিল বেলা আর শান্তা।

তাদের দিকে তাকিয়ে বড় করুণ স্বরে গোপাল বলল, "যৌবনের প্রমাণ দেয়ার মেয়ে পাই না টুনি মাসী, বামন বলে কেউ কাছে আসে না। দূরে দাঁড়িয়ে হাসে, টিটকিরি দেয়—ওই দেখনা।"

"এই বেলা, এই শান্তা—চুপ—" তাদের ধমক দিয়ে টুনি মাসী রং-এর বালতি উপুড় করে দিল গোপালের মাথায়।

"এই এই এই, হাক থুঃ—" বালতি আর পিচকিরি ফেলে রেখে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল গোপাল।

তাঁবু থেকে বার হয়নি শিবনাথ। তার কাছে রং নেই, পিচকিরি নেই। তার পায়ের কাছে লোহার দুটো বড় বড় বল, বারবেল, ছোট বড় থালার মতন লোহার কয়েকটা প্লেট। শিবনাথ নিচু হয়ে কখনো লোহার বল কখনো এক-একটি প্লেট পরীক্ষা করে দেখছিল। এবং এক-একবার বাইরে তাকাচ্ছিল।

সকাল হলেও এর মধ্যে রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। হাওয়া গরম। শিবনাথের ঘাম হচ্ছিল। তার হাতের কাছে রুমাল ছিল না, মাঝে মাঝে সে ধুতির একাংশ তুলে ধরে কপাল ও গলায় বুলিয়ে নিচ্ছিল।

প্রত্যেক বছর দোলের দিন শিবনাথের উৎসাহ থাকে সবচেয়ে বেশী। কাউকেই ছাড়ে না সে। প্রত্যেককে তাঁবু থেকে টেনেটেনে বের করে রং দেয়। গত বছর মেটিয়াবুরুজে হাতির পিঠে চড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল শিবনাথ, আবীর ছড়াতে ছড়াতে ঘুরে বেড়িয়েছিল এদিক-সেদিক। মিছিলের মতন লোক যাচ্ছিল তার সঙ্গে সঙ্গে।

ফিরে আসার পর তার কিম্ভূত চেহারা দেখে খুব হেসেছিল যমুনা। তার মুখের কাছে মিষ্টি তুলে ধরে বলেছিল, "আপনাকে আর চেনাই যায় না যে শিববাবু!"

"তোমাকেই কি চেনা যায়—" যমুনার সিঁথিতে লাল আবীর সিঁদুরের দাগের মতন মনে হয়েছিল শিবনাথের, সে তা দেখতে দেখতে বলেছিল, "একেবারে বউ সেজেছ যে!"

"যাঃ।"

"দেখনা আয়নায়, মনে হচ্ছে যেন সিঁদুর দিয়েছ!"

শিবনাথের সামনে আয়নায় মুখ দেখেনি যমুনা, একটু সরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর যত সময় শিবনাথ ছিল তার তাঁবুতে, সে তার সঙ্গে আর মুখ তুলে কথা বলতে পারেনি।

এ বছর অন্য মানুষ হয়ে গেছে শিবনাথ। হোলি খেলায় তার মন নেই, উৎসাহ নেই। অনেকে এসেছিল কিছু আগে তাকে রং দিতে, সে বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কাউকে ঢুকতে দেয়নি তাঁবুর মধ্যে।

রাস্তায় আজ ট্রাম-বাসের শব্দ নেই, গাড়ির হর্নও কম। তা হলেও মানুষের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল, চীৎকার ভেসে আসছিল, "হোলি হ্যায়।" তা শুনতে শুনতে গুরুর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে একই কথা বার বার বলে যাচ্ছিল শিবনাথ "জয় গুরু! জয় গুরু!"

শিবনাথ দেখতে পায়নি তার তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল হাসি। হঠাৎ ভেতরে ঢুকতে সাহস হচ্ছিল না তার। হাসির হাতে রং-এর ঠোঙা, গায়ে-মুখে আবীরের দাগ, চুল উস্কোখুস্কো। সে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তার ভয় হচ্ছিল শিবনাথ তাকেও ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

কিছু পরে তাকে দেখতে পেল শিবনাথ, কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী খবর হাসি?"

হাসি খুব ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনাকে রং দিতে এলাম শিবুদা।"

শিবনাথ হাসল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রং দেবে? দাও না।"

হাসি চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে শিবনাথের তাঁবুর মধ্যে এল, ঠোঙা থেকে আবীর নিয়ে তার পায়ে রেখে সে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, শিবনাথ তাড়াতাড়ি দু-হাতে তাকে তুলে ধরে বাধা দিয়ে বলল, "আরে, কর কী হাসি! থাক থাক প্রণাম করতে হবে না—" সে হাসির কাছ থেকে কিছু আবীর নিয়ে তার মাথায় ছিটিয়ে দিল, "তোমরা সকলে ভাল আছ তো?"

"হ্যাঁ", হাসি খুব নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন আছেন?"

"ভালই।"

"এ বছর রং খেলতে বার হননি?"

শুকনো হাসল শিবনাথ। হাসির সহজ প্রশ্ন যেন তার দুর্বলতা মনের ভিতর থেকে আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে মুখে মাখিয়ে দিল। শিবনাথ তা মুছে ফেলবার জন্যে পা দিয়ে ঠেলে একটা বল কিছু দূরে সরিয়ে দিল, বারবেলের প্লেট ঠং ঠং করে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "তুমি খুব রং খেলেছ দেখছি।"

"জোর করে সকলে রং দিয়ে দিল শিবুদা—"

"কে, মোহনলাল?"

"না", করুণ একটা ছায়া কাঁপছিল হাসির মুখে, "সে না। গোপালবাবু শান্তা বেলা—এরা সব রং-এর বালতি নিয়ে এসেছিল, আপনার কাছে আসেনি?"

"এসেছিল, ভাগিয়ে দিয়েছি।"

হাসির রং-এর ঠোঙা ফুটো হয়ে মাটিতে ঝুরঝুর করে আবীর পড়ে যাচ্ছিল। একটা টুলের ওপর ঠোঙা নামিয়ে রেখে সে ভিজে গলায় আস্তে বলল, "আপনার কাছে আসতে আমার খুব ভয় করছিল শিবুদা। ভেবেছিলাম, আপনি আমাকেও ভাগিয়ে দেবেন—"

"আমি কি তা পারি হাসি!"

শিবনাথের সঙ্গে কথা বলবার সময়ও হাসি বাইরে তাকাচ্ছিল, একটা

আতঙ্ক ফুটে উঠছিল তার চোখে-মুখে। তা হলেও সে এত তাড়াতাড়ি শিবনাথের তাঁবু থেকে চলে যেতে পারল না, মৃদু অভিযোগ করার মতন বলল, "কথা বলেন না তো।"

শিবনাথ বলল, "তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে কি আমার ইচ্ছে হয় না হাসি। খুবই হয়। কিন্তু রাধানাথবাবু আবার রেগে যাবে, আমাকে গালাগাল করবে—তাই চুপচাপ থাকি।"

"বাবার স্বভাবই ওই রকম। আপনি মাপ করবেন শিবুদা, আমাদের ওপর রাগ করবেন না।"

হাসির কথা শুনতে শুনতে শিবনাথের মন বড় নরম হয়ে আসছিল। সে তার জগদ্বিখ্যাত হওয়ার যে-স্বপ্নকে সতর্ক ও যত্নবান হয়ে লালন করবার চেষ্টা করছিল, ভিন্ন আর এক বাসনা এখন তা আবার ঢেকে দিল। কিছু সময় ইতস্তত করল শিবনাথ। লোহার বলের ওপর আপন মনে পা ঘষল। হাসির ছেঁড়া রঙের ঠোঙা থেকে কিছু আবীর তুলে ইতস্তত ছড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, "যমুনা জানে তুমি এখানে এসেছ?"

"না।"

"জানলে বকবে না?"

"না, বকবে কেন", হাসি জটিলতার ঘন জালটা মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে যমুনা ও শিবনাথের সম্পর্ক আবার আগের মতন স্বচ্ছন্দ করে তোলার ইচ্ছায় বলল, "আপনার সাথে ঝগড়া করেছে বলে আমিই দিদিকে বকেছি।"

বারবেলের বড় একটা প্লেট হলুদ রোদের আভায় চকচক করছিল, সেদিকে তাকিয়ে সুখের অনুভূতিতে শিবনাথের মুখও খুব প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার স্বর বড় রুক্ষ এবং কথা বলবার সময় তার প্রসন্ন মুখও এক-একবার কয়েকটা ভাঙাচোরা রেখায় ঈষৎ কঠোর দেখাচ্ছিল, "যমুনাকে বকে, রাধানাথবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই হাসি—" শিবনাথ মাথা ঘষে-ঘষে বলল, "সবই ভাংচির ব্যাপার।"

"জানি", হাসি কিছু পরে অনুনয় করবার মতন বলল, "আপনি দিদিকে সব খুলে বলুন না শিবুদা?"

শিবনাথ মাথা নাড়ল, "না। যমুনা আমার কথা শুনবে না, আমাকে গাল বাড়িয়ে জুতো খেতে হবে—"

"ইস, মারুক দেখি একবার আমার সামনে আপনাকে জুতো—" হঠাৎ উত্তেজনা দমন করে নিল হাসি, আস্তে বলল, "আপনার সাথে ঝগড়া করে দিদির খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। বেশী কথা বলে না, হারকু সাহেবের সামনেও কাঠ হয়ে বসে থাকে—"

"হারকু সাহেব রোজ যায় নাকি তোমাদের রাউটিতে?"

শিবনাথের গলার স্বর কিছু কর্কশ। হাসি তার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নিচু করল। শিবনাথের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "আমাদের রাউটিতে আসবেন?"

"আমি? এখন? না-না—"

"আসুন না শিবুদা", হাসির গলায় একটা আবেগ উথলে উঠছিল, "এখন কেউ নেই, বাবাও বেরিয়েছে। আমার ভাল লাগছে না শিবুদা, আপনি আসুন।"

অল্প অল্প ঘাম ফুটে উঠছিল শিবনাথের কপালে, গলায় তৃষ্ণা উঠছিল। মনে মনে এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছিল সে, তার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে হাসিকে

ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছিল। রাস্তায় চীৎকার, সার্কাসের আর সব মানুষের খুশীর এলোমেলো বর্ষণ। শিবনাথ লোহার বল দেখল, বারবেলের ছোট বড় প্লেট দেখল, গুরুর ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "না-না।"

হাসি আবার ডাকল, "শিবুদা?"

তার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ হাসল। তার শক্তিচর্চার সব সরঞ্জাম, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় আকাঙ্ক্ষা, তার গুরুর বাণী মানুষী দুর্বলতার দীপ্তিতে ম্লান, বিবর্ণ হয়ে এল। এখন রং খেলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছেঁড়া একটা শার্ট পরল শিবনাথ, টুলের ওপর থেকে হাসির আবীরের ছেঁড়া ঠোঙা সাবধানে তুলে নিয়ে বলল, "চল তবে।"

হাসি আর সব মানুষের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, তার পিছনে শিবনাথ খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিল। তার কপালের ঘাম হাওয়া মুছে দিয়েছে, তার গায়ে আবীরের মিষ্টি গন্ধ।

শিবনাথের মনে হচ্ছিল লোহার একটা খাঁচা থেকে হাসি তাকে হঠাৎ বাইরে বের করে এনেছে। অবসর যাপনের মতন কয়েকটা হালকা মুহূর্ত শিবনাথকে তার একনিষ্ঠ সাধনার কৃচ্ছ্রসাধন থেকে মুক্ত করে আবার যমুনার তাঁবুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

॥ ছাব্বিশ ॥

"দিদি, শিবুদা এসেছে।"

পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল যমুনা। হাসির কথা শুনে চমকে শিবনাথকে দেখল। তার গায়ে অল্প অল্প রং-এর দাগ, হাতে আবীরের ঠোঙা। যমুনার দিকে চোখ পড়তেই মনের বিশৃংখল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে হাত মুঠো করে থাকল শিবনাথ।

সে অনেক পরে হঠাৎ আবার যমুনার কাছে এল। প্রথমেই কথা বলতে পারল না। এমন করে এক কথায় এখানে চলে আসার সঙ্কোচ তাকে বড় দুর্বল করে রাখল। কিন্তু চুপ করে বাইরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেও আস্তে আস্তে একটা অপ্রীতিকর সকাল, মনোমালিন্যের সব গ্লানি শিবনাথের মন থেকে মুছে যাচ্ছিল।

পলকে যমুনাকে দেখে নিয়েছে সে—দেখেছে যমুনার শাড়ি সাদা, রং-এর ছোপ নেই, আবীরের দাগও নেই তার দেহের কোথাও। তার মতন যমুনারও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কারণ বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল শিবনাথের কাছে। তার মুঠি আলগা হয়ে এসেছে। তার খেয়াল ছিল না যে, ফুটো ঠোঙা থেকে সব আবীর মাটিতে পড়ে গেছে।

তাঁবুর ভিতর মাটি স্যাঁতসেঁতে। কিছু আগে জল ঢালবার সময় যমুনার হাত ফসকে জল পড়েছিল মাটিতে, তার পায়ে কাদার মতন দাগ লেগেছিল—তা ধুয়ে ফেলবার এখন ইচ্ছা হচ্ছিল যমুনার। সে পা কাত করে তার পায়ের ময়লা দেখছিল। প্রথমে বিস্ময় এবং খুশির একটা চমক তার অনুভূতিকে খুব চোখা করে তুললেও পরে শিবনাথের সঙ্গে কথা বলবার ভাষা তার মুখে এল না।

এখন হারকু সাহেব নেই, রাধানাথবাবুও বাইরে গেছে। সুযোগ বুঝে

এই সময় এসেছে শিবনাথ—সেদিনকার অপমানের শোধ নেবে। কয়েকদিন থেকে বড় অবসন্ন হয়ে আছে যমুনা। তার এখন তর্কাতর্কি করবার ইচ্ছা ছিল না—ভয় হচ্ছিল, শিবনাথ যে আবার তার কাছে এসেছে সে কথা হারকু সাহেব শুনবে, আর সকলে জেনে যাবে এবং তা হলে হয়তো পরের ক্যাম্পে লীলা সার্কাস কুইন হয়েই থাকবে—তার জন্যে কিছু করবে না হারকু সাহেব।

যমুনা শিবনাথকে ভেতরে ডাকল না, বসতে বলল না। তার পায়ে নরম মাটির দাগ দেখতে দেখতে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "রং খেলতে এসেছেন?"

শিবনাথ ছেঁড়া ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়ে তার হাতের রং শার্টে ঘষতে ঘষতে বলল, "হাসি ডেকে আনল, তাই এলাম—। যমুনার শাড়ি ও মুখ গলা পা এইসব একবার ভাল করে দেখে সে হাসল, "আমি এ বছর রং খেলিনি—।" যমুনা কিছু না বললেও কথা বলতে বলতে শিবনাথ অন্যমনস্কের মতন তাঁবুর ভেতরে ঢুকল, "তুমিও দেখছি রং খেলতে বার হওনি, শাড়ি একেবারে সাদা—"

শিবনাথের স্পষ্ট প্রশ্নের মধ্যে এমন এক অন্তরঙ্গতার সুর খেলছিল যা যমুনাকে কিছু সময়ের জন্যে অপ্রস্তুতের মতন করে তুলল এবং তার কথার উত্তরে একটা স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়ার আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেও যমুনা হঠাৎ স্থির করতে পারল না কী বলবে। এই সময় রং-এর বালতি নিয়ে কেউ এখানে এসে পড়লেই যেন ভাল হত।

যমুনা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "ওসব আর ভাল লাগে না। ছেলেখেলা করবার সময় কোথায়!"

"তা ঠিক। আমারও সেইরকম মনে হয়েছিল—"

"আপনি তো খেলেছেন দেখছি।"

শিবনাথ এখনো রং ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এসব হাসির কাণ্ড।"

"বসুন না শিবুদা—" যমুনার শুকনো মুখ, কাঠ-কাঠ ভাব হাসির ভাল লাগছিল না বলে খাট থেকে দু-একটা ময়লা কাপড়, পাউডারের টিন আর রাধানাথবাবুর ভিজে গামছা সরিয়ে দিয়ে সে শিবনাথকে বসবার কথা বলল।

হাসির কথায় শিবনাথ বসতে পারল না। এবং হঠাৎ এখান থেকে কেমন করে চলে যাবে তা-ও ভাবতে পারল না। এ যেন কোন অন্যায় না করে উপযাচক হয়ে হার স্বীকার করার মতন। তা করতেও হয়তো কোন দ্বিধা করত না শিবনাথ, ইতস্তত করত না যদি যমুনাও তার দিক থেকে কিছু কোমল হত—সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে তার সঙ্গে আবার আগের মতন ব্যবহার করবার চেষ্টা করত।

শিবনাথের হাতে আবীর ছিল না, রং খেলবার কোন সরঞ্জাম নিয়ে সে যমুনার কাছে আসেনি, হাসির কথায় কেন হঠাৎ চলে এসেছে তা তাকে বুঝিয়ে বলবার সময় এখন নয়, সুযোগও নেই। শিবনাথের মনে হল, সে যমুনার কাছে তার দুর্বলতার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেকে তার কাছে আরও ছোট করে তুলেছে।

এইরকম অসংলগ্ন ভাবনা ভাবতে ভাবতে শিবনাথ বলল, "রাধানাথবাবুর সেদিনের কথা শুনে আমার মাথাটা হঠাৎ বড় গরম হয়ে উঠেছিল, উনি যা-তা বলেছিলেন বলে—"

যমুনা বলল, "সেসব এখন আর বলে লাভ কী। যদি কিছু বলবার থাকে, বাবাকেই বলবেন।"

শিবনাথ হাসল, "তিনি আমার কথা কি আর শুনবেন, কোথা থেকে কী হয়ে গেছে, তুমি তো সবই বুঝতে পার।"

যমুনা তার ঠাণ্ডা এবং বিষণ্ণ মুখ তুলে শিবনাথকে দেখল, কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে আস্তে বলল, "কী আবার হবে, কিছুই হয়নি—" আরও পরে শিবনাথকে সুযোগ মতন আঘাত করার তীব্র ইচ্ছা তার বুক ঠেলে উঠছিল বলে সে বলল, "কিছু হয়ে থাকলে তো ভালই—আমার ভাল হয়েছে তো।"

যমুনার ভাল কী হয়েছে তা শিবনাথ বুঝতে পারল না। তার মনে হল, সে তাকে বিদ্রূপ করছে। কেননা, যমুনার স্বরে সুখের কোন প্রকাশ ছিল না, তার এক-একটি কথা ভিজে, ভারী—দুঃখ প্রকাশ করার মতন। তার দুঃখের কারণও ধরতে পারল না শিবনাথ।

তা হলেও নিজের দুর্বলতা ও কৌতূহল দমন করবার খুব চেষ্টা করতে করতে সে বলল, "ভাল হলেই ভাল, কিন্তু কী হল?"

এক পা দিয়ে আর এক পা ঘষে ঘষে ময়লা তুলে ফেলেছে যমুনা, এখনো তার দৃষ্টি ছিল পায়ের দিকেই, "পরের ক্যাম্পে আমি সার্কাস কুইন হব, শুনেছেন?"

খুব জোরে বলে উঠল যমুনা এবং তাকিয়ে থাকল শিবনাথের মুখের দিকে। কিন্তু সে তখনো হাসছিল, "শুনিনি, তবে আঁচ করতে পারছিলাম এমন একটা কিছু হবে—"

যমুনার মনে হল শিবনাথ তাকে খোঁচা মারছে. তার হাসি কতকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবার মতন। যমুনা জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে বুঝলেন?"

"ওসব আমি বুঝতে পারি", শিবনাথের মুখ থেকে অল্প অল্প হাসির রেখা মিলিয়ে গিয়েছিল, মৃদু ঝাঁজের আভাস ছিল তার কথায়, "এসব না হলে সার্কাস চলে কী করে!"

যমুনা শিবনাথের কথার অর্থ না বুঝে উষ্ণস্বরে বলল, "কী বলছেন, বুঝি না।"

শিবনাথ বলল, "থাক যমুনা, বুঝে আর কাজ নেই। তোমার ভাল হয়েছে, সুখের কথা—"

"হ্যাঁ, খুব ভাল হয়েছে।"

"ব্যস, ফুরিয়ে গেল", শিবনাথের কথাও ফুরিয়ে গিয়েছিল, এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোন মানে হয় না, তা হলেও তার মনে হল, যমুনা বড় অসহায়, সে ভুল করেছে। তাকে আরও দূরে ঠেলে দিতে মন চাইল না শিবনাথের।

সে তার ভুল সংশোধন করে দেখার আর অল্প চেষ্টা করল, "তবে কী জান যমুনা, সময়ে তোমার আরও ভাল হত—" একটু চুপ করে থেকে শিবনাথ হাসির শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল-মন্দ বোঝবার মতন বুদ্ধি আছে তোমার, আমি আর কী বলব!"

যমুনা বলল, "আগে ছিল না, এখন হয়েছে—" শিবনাথের সঙ্গে ঝগড়া করবার মতন স্বরে সে কিছু পরে আরও বলল, "সময়ে আর কী ভাল হত আমার, বলতে পারেন?"

"দেখতেই পেতে।"

যমুনা বারবার বাইরে তাকিয়ে দেখছিল, পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠছিল। শিবনাথের সঙ্গে এমন অস্থির হয়ে সে ছাড়া-ছাড়া কথা বলছিল, "সার্কাসের

মেয়ের সময় বড় কম শিববাবু, বেশীদিন বসে থাকলে বয়স বেড়ে যায় না?"
"আমি সার্কাসের কথা ভাবি না।"
"তবে কিসের কথা ভাবেন?"
শিবনাথ ভেবে ভেবে আস্তে আস্তে বলল, "আরও পরের কথা—যখন খেলবার সময় ফুরিয়ে যাবে, মালিক কিংবা জেনারেল ম্যানেজার আর টানবে না—"
যমুনা শিবনাথের সব কথা শুনতে পারল না, বাধা দিয়ে বলল, "সে তো অনেক পরের কথা, কিন্তু যতদিন খেলা দেখাবার ক্ষমতা আছে ততদিন নিজের ভালমন্দ নিজে না বুঝলে চলবে কেন!"
"তা তো ঠিক," চলে যাচ্ছিল শিবনাথ, বার হতে গিয়ে থামল, পিছন ফিরে বলল, "এই ভাল-মন্দ আগে বুঝলে অনেক ভাল হত যমুনা, আর এক-জনের ঘাড়ে শুধু শুধু দোষ চাপাতে হত না।"
যমুনা এত সময় ধৈর্য রেখেছিল, আর পারল না। তার বুকের মধ্যে যে ব্যথা দপদপ করে উঠছিল, এখন তা গলা ঠেলে বেরিয়ে এল, "মিছে কথা বলবেন না, আমি কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাইনি—"
"তা তুমিই জান," শিবনাথ বলল, "একটা বাজে লোকের ভাঁওতায় ভুলে তোমরা সকলে মিলে আমাকে জব্দ করে দিলে।"
"বাজে লোক বলছেন কাকে?" যমুনা কিছু উচ্চস্বরে বলল, "ওসব আর বলবেন না। যে কথা রাখে, মানুষের উপকার করে তাকে যদি বাজে লোক বলেন, তবে আপনি নিজে কী?"
শিবনাথ রাগল না, যমুনার কথায় ঝাঁজের প্রকাশ দেখে হাসল, "তা-ও তুমি জান যমুনা।"
কথা শেষ করে শিবনাথ আর দাঁড়িয়ে থাকল না, বাইরে রোদে বেরিয়ে এল। হাসি দাঁড়িয়ে ছিল এক দিকে চুপচাপ, শিবনাথ তার দিকেও আর দেখল না, পালিয়ে যাবার মতন সে পা টিপে টিপে হাঁটছিল। মান-সম্মান আর কিছু ছিল না তার, নির্জনে কোথাও কিছু সময় সে আত্মগোপন করে থাকতে চাচ্ছিল।
কিন্তু নির্জন জায়গা এখানে নেই, শিবনাথকে যমুনার তাঁবু থেকে বার হতে দেখেছে অনেক মানুষ। তারা রং খেলতে খেলতে চীৎকার করতে থাকলেও শিবনাথের মনে হচ্ছিল তারা তাকে লক্ষ করেই হাসাহাসি করছে।
শিবনাথ বার হয়ে যেতেই হাসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনা, তার কাঁধে হাত রেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "কেন তুই ডেকে আনতে গেলি মানুষটাকে? কেন, বল?"
যমুনার বিবর্ণ মুখ ও একটা অস্থিরতা লক্ষ করতে করতে হাসির ধারণা হয়েছিল, শিবনাথকে দেখে সে খুশী হবে, আবার হাসাহাসি করবে এবং আগের মতন মিষ্টি করে কথা বলবে—আজ কেউ ছিল না বলেই শিবনাথকে জোর করে টেনে এনেছিল হাসি।
কিন্তু যত সময় ছিল শিবনাথ তত সময় যমুনা ও তার কথা শুনতে শুনতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হাসি, তার দুঃখ হচ্ছিল। সে ভাবছিল দোলের দিন তার জন্যেই যমুনার কড়া কথা শুনতে হল শিবনাথকে।
"ভাল বুঝেছিলাম, তাই ডেকেছিলাম—" যমুনার অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখে একটুও ভয় পেল না হাসি, তার হাত সরিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করল না, গলার

স্বর যমুনার চেয়েও অনেক বেশী তুলে বলল, "মানুষটার সাথে যেমন ব্যবহার করলি—আর আসবে না।"

"কে চায় তার মুখ দেখতে?" যমুনা আরও জোরে হাসিকে নাড়া দিতে দিতে বলল, "কেন তুই তার রাউটিতে গেছিলি, শুনি? বাবা যদি জানতে পারে, হারকু সাহেব যদি টের পায়?"

"কী হবে তবে?" হাসি অবোধ মেয়ের মতন যমুনার মুখের ওপর দু' চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

"জানিস না? লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে—"

হাসির জেদ চেপে গিয়েছিল, এত পরে সে জোর করে যমুনার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তা বলে মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে হবে? তাড়িয়ে দেবার হলে অনেক আগেই দিত—বুঝলি?"

যমুনার মাথার ঠিক ছিল না, তার চোখ দপদপ করছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল—হাসির সঙ্গে ঝগড়া করলেও মনে মনে সে যেন নিজেকে শাসন করছিল—কথা বলে বলে নিজেকেই বোঝাতে চাচ্ছিল যে, সে কোন ভুল, কোন অন্যায় করেনি।

"যাকে দিয়ে কোন উপকার পাব না, যার কোন ক্ষমতা নেই, তার সাথে ভাল ব্যবহার করে কী লাভ হবে আমার? সে মানুষ যত দূরে দূরে থাকে ততই আমার ভাল।"

"দূর করে তো দিলি, এখন যাকে দিয়ে উপকার পাবি তাকে মাথায় রাখ—" যমুনাকে আরও কিছু শোনাতে যাচ্ছিল হাসি কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ হয়ে গেল।

সে দেখল উত্তেজনার আর কোন প্রকাশ নেই যমুনার মুখে। হঠাৎ বড় শান্ত হয়ে গেছে সে এবং তার চোখ থেকে জল পড়ে যাচ্ছে।

কিছু সময় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হাসি, পরে যমুনার গায়ে হাত রেখে খুব আস্তে বলল, "দিদি, কাঁদছিস কেন রে?"

যমুনা হাসির হাত জোরে ঠেলে দিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলল, "আমার যা খুশি আমি তাই করব। তোর কী? তুই যা আমার সুমুখ থেকে—" সে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মুখ ঢাকল।

হাসি যমুনার গায়ে আর হাত রাখল না কথাও বলল না, কিন্তু খুশির একটা আভা ফুটে উঠেছিল তার মুখে—শিবনাথকে আর একবার এখানে নিয়ে আসবার ইচ্ছা হচ্ছিল হাসির।

ইচ্ছা হলেও হাসি জানত সে আর কোনদিন শিবনাথের সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারবে না। আজও তার তাঁবুতে আবীরের ঠোঙা নিয়ে যেত না, কয়েক দিন থেকে হাসির মন খুব সুস্থ ছিল না বলেই সে গিয়েছিল। মোহনলাল তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়, ভাল করে কথা বলে না। হাসি ভেবেছিল, আজ সে অন্তত একবার আসবে—রং খেলবে। মোহনলাল এল না।

কাল রাতে হাসি একসময় যমুনাকে বলেছিল, "দিদি, মোহনবাবুর কী হয়েছে জানিস?"

আজকাল যমুনার মেজাজ কোন সময় প্রসন্ন থাকে না, হাসির প্রশ্ন শুনে সে আরও বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "কে জানে। রাজ্যের মানুষের মনের খবর রাখার গরজ আমার নেই।"

"মোহনবাবু রাজ্যের মানুষ হল?"

"থাম, থাম—" তাড়া দিয়ে হাসিকে থামিয়ে দিয়েছিল যমুনা। ঘুমবার ভান করে অন্য পাশ ফিরে শুয়েছিল।

কিন্তু হাসি জানে, রোজকার মতন কালও অনেক রাত অবধি ঘুমতে পারেনি যমুনা—ছটফট করছিল, এক-একবার জোরে জোরে ভারী নিশ্বাস ফেলছিল। তখন শিবনাথের কথা মনে হয়েছিল হাসির এবং রং খেলবার ছল করে সে তাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসার কথাও ভেবে রেখেছিল।

যমুনার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না হাসির। সে যেমন ভেবেছিল তেমন হল না। হাসি জানে, এর পর যমুনার মেজাজ আরও খারাপ হবে এবং শিবনাথকে ডেকে আনবার জন্যে পরে সে তাকে আবার বকাবকি করবে। মোহনলালের সব কথা হাসি তাকে শিগগির বলতে পারবে না।

টালিগঞ্জে এসে অনেক বদলে গেছে মোহনলাল। সার্কাসে সে আর বেশী দিন থাকবে না। এই ক্যাম্প শেষ হলেই সে কাজ ছেড়ে চলে যাবে। শুধু সার্কাস ছেড়ে নয়, টালিগঞ্জে আসবার কিছু পরেই হাসির মনে হয়েছে তাকেও তার ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা—সে কথা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছে মোহনলাল।

খেলার সময় সে মুখ নিচু করে গীটার বাজায়, হাসির দিকে আগের মতন তাকিয়ে দেখে না। প্র্যাকটিসে যাওয়া-আসার সময় কিংবা হঠাৎ কখন দেখা হয়ে গেলে মোহনলাল তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায়—এমন ভাব দেখায় যেন সে হাসিকে দেখতে পায়নি। কয়েকদিন সকালবেলা মোহনলালকে খুঁজেছিল হাসি, দেখা পায়নি। সকালে সে আজকাল তাঁবুতে থাকে না, কোথায় যায় হাসি জানে না—চাকরি খুঁজতে কিনা, কে জানে।

"কোথায় যান রোজ রোজ?" একদিন প্র্যাকটিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর মোহনলালকে দেখতে পেয়ে যমুনাকে এগিয়ে যেতে দিয়েছিল হাসি, নিজে অল্প পিছিয়ে পড়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "নতুন কাজ পেলেন নাকি?"

"কাজ? না। তবে এই, কাজের মতন আর কী!"

"কী?"

"বাড়ি বাড়ি গিয়ে গীটার শেখাতে হবে। মাইনে ছাতার সার্কাসের চেয়ে অনেক বেশী। আর খাতির কত!"

মোহনলালের কথা বুঝতে পারেনি হাসি, আবার জিজ্ঞেস করেছিল, "কাদের বাজনা শেখাবেন?"

"কত মেয়ে শিখতে চেয়েছে আমার কাছে—" মোহনলাল আঙুল তুলে বলেছিল, "ওইসব বাড়িতে থাকে। সার্কাস দেখতে আসে, দেখনি? কী সুন্দর দেখতে এক-একজন!"

"ওদের শেখাবেন?"

"শেখাব না?" মোহনলালের চোখে অহঙ্কার দপদপ করে উঠছিল, "খেলা দেখতে এসে ওরা কান খাড়া করে গীটার শুনেছে—যেচে আলাপ জমিয়েছে আমার সঙ্গে—বাড়িতে ডেকেছে—"

"গিয়েছিলেন?"

"রোজই তো যাই—"

তেমন সব মেয়েদের কথা ভাবতে ভাবতেই সার্কাসের পাঁচিলের ওপারে সাদা আর হলদে রং-এর বাড়ি দেখতে দেখতে মোহনলাল বলেছিল, "লেখাপড়া জানা

ভদ্রমানুষের কথাবার্তা বলবার ধরনই আলাদা। তারা বাজনা শোনে, গুণের কদর বোঝে। সার্কাসের মানুষের মতন এমন আকাঠ নয়।"

মোহনলালের কথা শুনতে শুনতে হাসির মনে হয়েছিল, সার্কাসের মানুষ বলে সে তাকেও এখন ধরে নিয়েছে, কেননা তার দৃষ্টিতে অবজ্ঞার এমন অদ্ভুত প্রকাশ ছিল, যা হাসির মনে কাঁটার মতন ফুটছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলেছিল, "কাজ ছেড়ে চলে যাবেন আপনি, মোহনবাবু?"

"হ্যাঁ, যাব। আর না, খুব হয়েছে। অনেক পাপ করেছিলাম, তাই এতদিন থাকতে হল।"

হাসির কথা ভাবল না মোহনলাল, সে নিজে কোথায় থাকবে, কোন্নগরের পাকা বাড়িতে চলে যাবে কিনা তা-ও বলল না। হাসির চুপ করে সরে যাওয়া উচিত ছিল, সে যেতে পারল না—আরও স্পষ্ট করে মোহনলালের কথা শুনতে চাইল।

"কোথায় থাকবেন?"

এখানে প্রথম এসে যেখানে ছিলাম, মেসে। কথাবার্তা বলে রেখেছি। এই ক্যাম্প শেষ হবে—ব্যস আমিও নেই—" হাসির দিকে দেখেনি মোহনলাল তাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগও দেয়নি, আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে গিয়েছিল।

সেই শেষ। তারপর মোহনলালের সঙ্গে আর কথা হয়নি হাসির। এ সময় যমুনার মন প্রসন্ন থাকলে সে তাকে সব বলতে পারত, মোহনলালকে ডেকে এনে যমুনা তা হলে খোলাখুলি জেনে নিতে পারত, সে কী করবে। এইসব ভেবেই শিবনাথের কাছে গিয়েছিল হাসি।

কলের কাছে ভিড় জমেছে। হাসির দিকে তাকিয়ে যুগল হাসছে। হাসি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু এখন সে মনে মনে যুগলকেই ডাকছিল। এবং এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাধানাথবাবুর ওপর টান অনেক কমে আসছিল হাসির।

"দিদি, হারকু সাহেব—" কিছু দূরে হারকু সাহেবকে দেখে যমুনাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে হাসি বলল।

এত তাড়াতাড়ি হারকু সাহেবের ফেরবার কথা নয়, যমুনা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তাদের তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে করালীকান্তর সঙ্গে কথা বলছে হারকু সাহেব।

চোখে দ্রুত আঁচল বুলিয়ে হাসিকে আবার ধমক দিল যমুনা, "হল এবার?"

"কী?"

"কেন এসেছে হারকু সাহেব, জানিস না? শিববাবুর কথা যদি জিজ্ঞেস করে তবে কী বলব আমি?"

হাসির ভয় লাগছিল। তার মনে হচ্ছিল, এখুনি একটা গোলমাল হবে, তাঁবুর মধ্যে এসে তাকে খুব বকবে হারকু সাহেব—মারবে। এখন রাধানাথবাবু নেই, যমুনাও তাকে বাধা দেবে না। হাসি ভাবছিল, তা হলে সে আবার শিবনাথের কাছেই ছুটে যাবে—তাকে গিয়ে বলবে, "আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে এরা যে মেরে ফেলল—আমাকে বাঁচান!"

॥ সাতাশ ॥

ফাল্গুনের শেষ বেলায় পড়ন্ত বিকেলের আলো ঈষৎ ফিকে, অস্থির বাতাস থেকে থেকে অধীরতা প্রকাশের মতন একটা ধ্বনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। কেননা, আকাশ ভরে প্রতীক্ষার দীপ্তি এখন বড় শুভ্র। দোলপূর্ণিমার চাঁদ হঠাৎ দপ করে ফেটে পড়বে।

শূন্যতার একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করতে করতে মনে মনে ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র হয়ে উঠছিল করালীকান্ত। এখনো তার চুল লাল-লাল, রুক্ষ। দুপুরে স্নানের সময় বিকট জ্বালায় অস্থির হয়ে সে খুব জোরে জোরে মাথায় সাবান ঘষেছিল। চুলের রং তুলে ফেলবার জন্যে নয়, যে দাহ তাকে অস্থির ও হিংস্র করে তুলেছিল তা কিছু প্রশমিত করবার জন্যে।

কাল রাতে টুনি মাসীর তাঁবুতে যেতে পারেনি করালীকান্ত। গোপালকে দিয়ে তাকে বলে পাঠিয়েছিল যে, তার শরীর খারাপ এবং টুনি মাসীর উঁকি মেরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলে সে ঘুমের ভান করে পড়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে ঘুমনো একেবারেই অসম্ভব ছিল।

কাল আর একটা চিঠি এসেছিল করালীকান্তর। তার বউ শোকে অপ্রকৃতিস্থর মতন হয়ে কিছু কঠিন কথাও লিখেছে। করালীকান্তর প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। তাই সে এল না তার মেয়ের মৃত্যুশয্যায়। যা হোক, শান্তি লিখেছে—আর তার আসবার দরকার নেই। তার মেয়ে শেষ অবধি ধনুষ্টঙ্কার হয়েই মরেছে। শেষের দিকে তার শরীর আরও ছোট হয়ে এসেছিল, ফেনা ঝরছিল মুখ থেকে, জ্ঞান ছিল না।

শান্তির চিঠি করালীকান্ত পেয়েছিল কাল দুপুরে। ম্যাটিনি শোর দেরি ছিল না বলে ইচ্ছে করেই চিঠি খোলেনি সে। তা ছাড়াও তার মনে হয়েছিল, সেই এক কথা লেখা থাকবে চিঠিতে। পরে ছিল রাতের খেলা। আরও পরে সার্কাসের পোশাক বদলাবার সময় চিঠিটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল করালীকান্তর ছেঁড়া শার্টের পকেট থেকে।

করালীকান্তর গালে মুখে লাল ও সাদা রং, মাথায় বড় পরচুলা, লাঠি পড়ে ছিল পায়ের কাছে। চিঠি পড়বার পর শোকের কোন অনুভূতি তাকে ঈষৎ বিচলিত করেনি, শুধু তার হাত শক্ত হয়ে এসেছিল এবং মেয়ের মৃত্যুর খবরের ছোট কাগজটা সে মুঠো করে ধরেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে, পরে একটা অশুচি জিনিসের মতন তা টুকরো টুকরো করে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর খুব সংযত এবং স্বাভাবিক স্বরেই গোপালকে বলেছিল, "শরীরটা ভাল নেই রে। আমি শুয়ে পড়লাম। যা, টুনিকে বলে আয় যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।"

একটা কিছু করা দরকার—করালীকান্ত কী করবে তা হঠাৎ ঠিক করতে পারল না। সারা সকাল আবীর পড়েছে তার গায়ে, রং-এর ঝাপটায় বুক পিঠ ভিজে গেছে। সে বাধা দেয়নি, অল্প অল্প হাসছিল এবং শান্তির চিঠির দু-একটা কথাই তার মনে পড়ছিল—প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। এসব কিছুই নিজের বুকের ভিতর খুঁজে পাচ্ছিল না করালীকান্ত। শুধু একটা কঠিন

শূন্যতা তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল এবং তার হিংস্র চোখ হারকু সাহেবকে খুঁজছিল।

হারকু সাহেব ফিরেছে অল্প আগে। সন্ধ্যার খেলা শুরু হতে এখনো কিছু দেরি। দোলের দিন বেশী লোক আসবে না বলে অফিস টেণ্টে বসে অকারণে সে মেজাজ খারাপ করে যাকে সামনে দেখছিল তাকেই গালাগাল করছিল। অনেক মদ খেয়ে এসেছে হারকু সাহেব। তার তাঁবুর ভিতরে মদের উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ছিল।

হারকু সাহেবের কাছাকাছি আর কে কে ছিল লক্ষ করল না করালীকান্ত, আস্তে আস্তে তার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "হারকু সাহেব, একটা জরুরী কথা ছিল আমার আপনার সাথে—"

হারকু সাহেব অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখল করালীকান্তকে, শব্দ করে কাঠের ছোট টেবিল নিজের আরও কাছে টানল, "আপনার বাত শুনবার টাইম আজ আমার হবে না, করালীবাবু—"

করালীকান্ত রূঢ় স্বরে বলল, "শুনতেই হবে।"

"জো হুকুম! বাপ রে বাপ! আপনি কোম্পানীর মালিক বনে গেলেন মশাই মালুম হচ্ছে—"

"হ্যাঁ, মালিক!"

হারকু সাহেব নেশার ঘোরে চীৎকার করার মতন বলল, "কী জরুরী বাত আপনার? বিবি বাচ্চা পয়দা করল? বেটীর বীমার? ছুট্টি চাই, রুপেয়া চাই? বলেন কী দরকার?"

তোমার বাপের সাদি দিবার দরকার—করালীকান্ত মনে মনে বলল। তার মুখ ঈষৎ কঠিন, বুক ঠেলে একটা ঝাঁজ উঠে আসছিল; কিন্তু ঝগড়া করবার মন এখন ছিল না করালীকান্তর, সে বলল, "আমি ছুটি চাই হারকু সাহেব—"

"মিলবে না, ক্যাম্প যখন ভাঙবে তখন ছুটি লিবেন—"

করালীকান্ত দৃঢ় স্বরে চেপে চেপে বলল, "আমি আজ রাতের গাড়িতে বাড়ি যাব—"

"না।"

"হারকু সাহেব, আমি যাবই। রাতের খেলায় আমি রিং-এ যাব না—"

"আপনার নোকরি থাকবে না, করালীবাবু।"

"দরকার নেই, আপনি অন্য লোক দেখুন।"

"ব্যস, ফিনিশ! আপনি আভ্ভি নিকাল যান—" হারকু সাহেব এত সময় বসেছিল, এখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "লেকিন এক পইসা আমি এখন দিব না আপনাকে। আপনি খুশি মতন যাবেন, নবাবের মতন বাত শুনাবেন—চুক্তির বাত খেয়াল নাই আপনার?"

"ওসব ছাড়ুন, যা পারেন করবেন।"

"হাঁ-হাঁ, ওইরকম রোয়াব আমি বহুত দেখেছি।"

অফিস টেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল করালীকান্ত। শ্যাওলার মতন আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। এখন টুনি মাসীও তাকে টানল না। এখনো একটা দাহ আছে তার বুকের মধ্যে। হারকু সাহেবকে কঠিন কথা শুনিয়ে এসেও শান্ত হতে পারল না সে। করালীকান্ত বুঝল না আসলে কার ওপর তার রাগ।

এখন এক-একবার নবীনের মনে হয় একটা কঠিন রোগ থেকে সে কোন অলৌকিক উপায়ে আরোগ্য লাভ করে হঠাৎ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠেছে। এ নবীন সে নবীন নয়, যে নিজের খাটে একা-একা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে থাকত--ঈর্ষার যন্ত্রণায় ছটফট করত। এ নবীন অন্য মানুষ। লীলা এখন তাকে সম্মান করে—ভালবাসে কিনা তা যদিও নবীন স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। তবে এখন একটা বিশ্বাস জন্মেছে তার যে, লীলা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে তার কাছে এগিয়ে আসবেই।

"এখন কেমন?" সকালবেলা লীলাকে রং মাখাতে মাখাতে তার মাথা বুকে চেপে ধরে নবীন জিজ্ঞেস করেছিল, "ভীতু মানুষ বলবে আর আমাকে?"

"অন্য কেউ না বললে আমি বলব কেন?"

"সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি না?"

লীলা খুব করুণ করে বলেছিল, "হুঁ।"

"এখন হয়েছে কী, দেখবে লীলা, বাঘকে আমি কুত্তার মতন খেলাব। মাইরি রিং-এ গেলে হাতির বল আসে আমার গায়ে, ভয়-ডর থাকে না।"

লীলা হেসে বলেছিল, "ভীতু মানুষের ধরনই এমন।"

"ফের?"

লীলা জিব কেটেছিল, "ভুল করে বলে ফেললাম গো।"

দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় দর্শক কিছু কম। ঝকঝকে চেহারা মানুষগুলোর। তারা নবীনকে দেখছে। তার হাতে চাবুক। গায়ে লাল কোট, আঁট প্যান্ট—তার চোখে হিংস্র পশু বশ করার আগ্রহ জ্বলছে।

বাঘের খাঁচার দরজা খোলা। সুরয আর চাঁদনী বেরিয়ে এসেছে। নবীনের নাকে তাদের গায়ের উৎকট ঘ্রাণ বড় মধুর লাগছিল। একটা বিলিতী নির্ভীক সুর বাজাচ্ছে ব্যাণ্ড মাস্টার, তা নবীনের মনে আরও তেজ—আরও সাহস সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল।

লীলাকে যে কথা দিয়েছিল নবীন, বাঘকে কুকুরের মতন খেলাবে, তা প্রমাণ করে দেওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে ওঠে, রিং-এর মধ্যে এসে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে না। অন্যান্য রিং মাস্টার যেমন করে জানোয়ার খেলায়, দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চটাস চটাস চাবুকের শব্দ করে দর্শকদের ফাঁকি দেয়, নবীন তেমন করে না। সে এগিয়ে যায় বাঘের কাছে, তার গায়ে হাত দেয়, হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়ায়।

"এ নবীন," জোসেফ শুকনো গলায় বলে, "জান দিবি? বেশী বাড়াবাড়ি করিস না, বুঝলি? জানোয়ার বড় শয়তান।"

নবীন হেসে বলে, "সাহস থাকলে জানোয়ার ভয় পায়।"

"থাম থাম।" ঈর্ষায় চক চক করে জোসেফের দু চোখ. "দু-দিন রিং মাস্টার হয়ে তুই আমার চেয়ে বেশী চিনিস জানোয়ার?"

"জানোয়ার আমাকে চেনে তো বটে।"

"ঝাপটা মারলে বুঝবি, যা বলি তা শুন—"

কিন্তু জোসেফের কথা শোনে না নবীন। সে পুরনো লোক। রিং-মাস্টার মদনমোহনের সঙ্গে প্রথম থেকেই আছে এ সার্কাসে। তারই এখন রিং-মাস্টার হওয়ার কথা। নবীনের সহকারী হয়ে খেলা দেখাবার সময় তারও মুখ বাঘের মতন হিংস্র হয়ে ওঠে, নবীনের হাত টেনে সব সময় তাকে সতর্ক করে—তখন রাগ হয় নবীনের। তার মনে হয় জোসেফ তাকে ভীতু অপদার্থ প্রমাণ করে

নিজে রিং-মাস্টার হয়ে বাঘ খেলাতে চায়।

সুরেষের প্রকৃতি খুব ঠাণ্ডা, কতকটা নবীনের মতন। এক-একবার বড় বড় হাঁ করে জোর আওয়াজ তোলে। তার অনেকটা কাছে এগিয়ে যায় নবীন, পিঠে হাত বুলোয়। কিন্তু চাঁদনী এখনো অবাধ্য। আক্রমণ করবার সুযোগ খোঁজে, থাবা আঁচড়ায় সব সময়। রিং-মাস্টারকে গ্রাহ্য করে না। চাবুক তুললে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে—বেশী গর্জন করে।

"চাঁদনী!"

নবীনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলল জোসেফ, তাকে আর একবার সাবধান করবার জন্যে বলল, "বেহুঁশ হোস না।"

সকাল বেলা খাঁচার মধ্যে আবীর ছিটিয়ে ছিল নবীন, চাঁদনীর কপালে লাল আভা। লীলার কথা ভাবল নবীন, তাকে আবীর মাখিয়ে বুকে টেনে নেওয়ার কথাও তার মনে হল। সে জোসেফকে অগ্রাহ্য করে চাঁদনীর আরও কাছে এগিয়ে গেল।

একটা জেদ চেপে গিয়েছিল নবীনের। আজ অনেক বেশী সময় নিয়ে সে খেলাবে অবাধ্য চাঁদনীকে—খেলাবেই। নবীন হঠাৎ মাতালের মতন হয়ে উঠল।

"চাঁদনী সিট হিয়ার—" একটা বড় গোল টুলের ওপর নবীনের লম্বা চাবুকের আওয়াজ উঠল, চটাস। বাঘিনী শুধু মুখব্যাদান করে হুঙ্কার ছাড়ল, নবীনের দাপট দেখে ভয় পেল না, তার কথা শুনল না।

আবার আরও জোরে ডাকল নবীন, "চাঁদনী!"

জোসেফ ছিল তার পাশে, কাশী পিছনে। নুরু আর অনন্ত লোহার খুঁটির কাছে বসে মোটা দড়ির ওপর হাত রেখেছিল।

"ব্যস, খতম কর নবীন," জোসেফ চাঁদনীর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে উঠল, "আউর টাইম লাগবে, শালীর মেজাজ খুব খারাপ।"

না, আর সময় লাগবে না—নবীন মনে মনে বলল, অনেক টাইম দিয়েছি আমি তোকে। আজ আমার হুকুম মানতেই হবে চাঁদনী। দেখ কত মানুষ, হাততালির আওয়াজ শুনবি না? জোর হাততালি পড়লে লীলা শুনবে, হারকু সাহেব শুনবে। চাঁদনী, আমার ক্ষমতা ভোজবাজির মতন সব মানুষকে তাক লাগিয়ে দেবে।

অন্য রিং-মাস্টারের মতন পশুকে ভয় দেখাবার জন্যে নয়, চাবুক নামিয়ে নবীন চাঁদনীর কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকে মানুষের অনুরোধের ভাষা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। এই সময় সে পলকে তাকিয়ে নিয়েছিল সব শ্রেণীর দর্শক-দের দিকে। তাদের চোখের কৌতূহল ও বিস্ময় নবীনকে আরও সাহসী করে তুলেছিল।

"চাঁদনী!"

"আরে নবীন, তফাত যা—" প্রথমে জোসেফ বুঝতে পারেনি যে নবীন চাঁদনীর প্রায় মুখের কাছে গিয়ে পড়বে। সে তার হাত টেনে সরিয়ে আনবার আগেই লাফ দিল চাঁদনী—নবীনের পেটে থাবা মারল।

হিংস্র চাঁদনী নবীনের ঘাড় লক্ষ করে এগিয়ে যাবার আগেই ধাক্কা মেরে নবীনকে সরিয়ে দিল জোসেফ, তার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে উন্মত্তের মতন বাঘিনীকে প্রহার করতে থাকল—যেন সে ভয় পেয়ে খাঁচায় ঢুকে যায়। দড়ি ঢিলে করে দিয়েছে রিং-বয়রা, খাঁচা বাঘের আরও কাছে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

মাটিতে পড়ে আছে নবীন, তার পেট চিরে রক্তের ধারা নেমেছে। দর্শকরা ভয় পেয়েছে, চীৎকার করছে। অনেকে বেরিয়ে গেছে, কেউ কেউ হুড়মুড় করে বাইরে যাবার চেষ্টা করছে। এরকম দুর্ঘটনা জুয়েল সার্কাসে আগে কখনো ঘটেনি। ব্যাণ্ডের মানুষরা প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে চুপচাপ বসেছিল, পরে আরও জোরে ড্রামে ঘা মারল, ক্ল্যারিওনেটে ফুঁ দিল। এবং ঠিক সেই সময় হারকু সাহেবের উচ্চস্বর ভেসে এল মাইকের ভিতর দিয়ে।

"আপনারা ঘাবড়াবেন না, চুপচাপ জায়গায় বসুন। কিচ্ছু হয়নি। রিং-মাস্টারের তবিয়ৎ ঠিক ছিল না। এখন দোসরা নম্বর দেখুন—"

বাঘের খাঁচা বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। নবীনের ওঠবার ক্ষমতা নেই। তাকে সাবধানে ধরাধরি করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল তার তাঁবুতে। আর কিছু পরেই ছিল লীলার খেলা। গোলমাল শুনেছিল লীলা, দুর্ঘটনার খবরও পেয়েছিল। নবীনকে যখন ধরাধরি করে তার সামনে নিয়ে আসা হল তখন সে জানবার চেষ্টা করল না যে সে বেঁচে আছে কি-না, ভিড় ঠেলে ঝুঁকে পড়ে তার স্বামীর মুখ দেখবার আগেই সে দু-হাতে চোখ ঢেকে যন্ত্রণায় চীৎকার করে ডাকল, "হারকু সাহেব!"

হারকু সাহেবও এসেছিল নবীনের তাঁবুতে। সে এমন ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে হঠাৎ বিচলিত হওয়ার মানুষ না। কিন্তু লীলার চীৎকার অদ্ভুত এক আর্তনাদের মতন মনে হল হারকু সাহেবের। সে দেখল লীলাকে। নম্বর করবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল লীলা। তার মাথায় লাল রিবন, গায়ে গোলাপী সাটিনের ফ্রক ও জাঙিয়া, চোখে সুর্মার ঘন রেখা। এখন মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে লীলাও তাকিয়ে আছে হারকু সাহেবের দিকে।

অনেক দিন পর এত মানুষের সামনেও লীলার সঙ্গে কথা বলল হারকু সাহেব, "নবীনকে চাঁদনী চাপ্পড় মারল লীলা।"

"বাঁচবে না?" লীলার স্বর নিস্পৃহ, মুখ রুক্ষ। সে এক দৃষ্টিতে হারকু সাহেবের দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানতে চাচ্ছিল।

"হাঁ-হাঁ, জরুর বাঁচবে।"

লীলা বলল, "না, হারকু সাহেব, ও বাঁচবে না। উঃ, কত রক্ত—"

"আরে তোরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস, এ বাচ্চু উঠাও উসকো জলদি—আভ্‌ভি হাসপাতালমে লে যানে হোগা।"

নবীনের চোখ বন্ধ, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। তার দু-হাত পেটের ওপর। জামা ছিঁড়ে গেছে। তার ক্যাম্পখাট রক্তের ধারায় লাল হয়ে গেছে। আর বেশী সময় তাকে এখানে রাখা যায় না। সুবলবাবুকে ডাকল হারকু সাহেব। এবং আর অল্প পরেই নবীনকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। কাছেই সরকারী হাসপাতাল।

এরিনায় তখন অন্য নম্বর চলছে। বামন ক্লাউন গোপাল আর সহদেব চরর্‌ চরর্‌ লাঠির আওয়াজ করে হালকা রসিকতা করছে। কিন্তু দর্শকরা বড় চুপচাপ, যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিছু আগে তার ছাপ এখনো আছে তাদের মনে। ক্লাউন তাদের হাসাতে পারছে না।

হারকু সাহেবের নেশা ছুটে গেছে। কিন্তু অস্থিরতার একটা বেগ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে সেখানে। এখন রঘুনাথ নেই, তার দায়িত্ব অনেক বেশী, অনেক কাজ। নবীন বাঁচবে কি-না কে জানে। অনেক মানুষ প্রশ্ন করবে তাকে—হয়তো পুলিশও আসবে।

কিন্তু নবীন বাঁচুক মরুক—তা পরের কথা। টালিগঞ্জে আরও কিছুদিন খেলা চলবে। এরিনা থেকে আজ রাতে ভাঙা মন নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না এত দর্শক। তাহলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে কোম্পানীর।

"লীলা", নবীনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর বড় নম্র স্বরে বলল হারকু সাহেব, "যাবি?"

"কোথায়?"

"হাসপাতালে, নবীনকে দেখবার লিয়ে?"

"না-না।"

"তবে চুপচাপ থাক। তোর নম্বর আজ বন্‌ধ্—"

হারকু সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা অলৌকিক কাজ করে তাকে চমকে দেওয়ার জন্যে মন থেকে যন্ত্রণার সব কাঁটা তুলে ফেলে লীলা বলল, "কেন, আমার তো কিছু হয়নি হারকু সাহেব।"

হারকু সাহেব অবাক হয়ে লীলাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত, পরে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "নম্বর করতে পারবি লীলা? ঠিক বাত বল? কুছ গড়বড় হবে তো ডবল একসিডেন হয়ে যাবে—"

"কিছু হবে না হারকু সাহেব, ঠিক পারব।"

"সাবাস!" লীলার পিঠে জোরে হাতের আওয়াজ তুলে হারকু সাহেব বলল, "তুই তৈয়ার থাক লীলা। আমি আউর এক কাম করি—তোর সাথে থাকবে করালীবাবু। ব্যস, মানুষ তবে জরুর হাসবে—"

কিন্তু করালীকান্ত কোথায়! হারকু সাহেবের মনে পড়ল সে বিকেলবেলা ঝগড়া করেছে তার সঙ্গে—কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখনো সে এখানে আছে কিনা কে জানে। হারকু সাহেব কাউকে ডাকল না, নবীনের রক্তের দাগ ছিল তাঁবুর মধ্যে, বাইরে ঘাসের ওপরেও—তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হারকু সাহেব একটা উত্তেজনার বশে খুব তাড়াতাড়ি করালীকান্তর তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

করালীকান্তর তাঁবু অন্ধকার। ইচ্ছে করেই সে আলো জ্বালেনি, জ্যোৎস্নার হালকা রেখা তাঁবুর মধ্যে স্থির হয়েছিল। তা এখন ভাল লাগছিল না তার। আলো বাজনা এবং সার্কাসের চীৎকার তাকে বড় অপ্রসন্ন করে তুলেছিল। এখানে থাকবার তার আর দরকার নেই। এখন চলে গেলেই হয়। অল্প জিনিসপত্র যা আছে, সব বেঁধে নিয়েছে করালীকান্ত।

সন্ধ্যার খেলা আরম্ভ হওয়ার আগেই সে গেট অবধি গিয়েছিল, এতক্ষণে তার ট্রেনে থাকবার কথা। গোপাল যেতে দেয়নি, খবর পেয়ে টুনি মাসীও তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। দোলপূর্ণিমার রাতে গিয়ে কাজ নেই; কাল আর সব মানুষ ঘুম থেকে ওঠবার আগেই সে চলে যাবে।

টুনি মাসী বলেছিল, "ভগবান মুক্তি দিচ্ছে গো তোমাকে! সার্কাস থেকে বার হওয়ার পথ করে দিল। বুঝি সব, কিন্তু বুক তো বাঁধতে হবে।"

টুনি মাসীর ভিজে চোখ, নরম গলার স্বর কিছু বিব্রত করেছিল করালী-কান্তকে, তার শোক যন্ত্রণা দাহ কিছু সময়ের জন্যে নিবে এসেছিল। টুনি মাসীর কথা শুনল করালীকান্ত, আজ যেতে পারল না।

তাঁবু অন্ধকার হলেও হারকু সাহেব করালীকান্তকে দেখল। এবং ভিতরে এসে তার একটা হাত ধরে অসংযত স্বরে বলল, "করালীবাবু, নবীনকে বাঘ খুব উণ্ডেড করে দিল—শুনলেন?"

"হ্যাঁ," নির্বিকার করালীকান্ত বিড়ি টানতে টানতে ধোঁয়া ছাড়ল হারকু

সাহেবের মুখের ওপর, বিরক্তি প্রকাশ করার মতন ছোট একটা শব্দ করল।

"আপনি উঠেন, রেডি হোন—"

"আমি কী করব?"

"রিং-এ যাবেন, সব মানুষের সাথে হাসি-ঠাট্টা করবেন। না হলে জাহান্নমে যাবে জুয়েল সার্কাস—"

"যাক!"

"করালীবাবু, এই সার্কাসের নিমক আপনি বহুত রোজ খেয়েছেন—শুনেন, নবীন ফিনিশ হয়ে যাবে, লেকিন সার্কাস থাকবে—"

"হারকুসাহেব, আমি কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে পয়সা দেননি, আমার বিপদের কথা শোনেন নি—" করালীকান্ত হঠাৎ অন্ধকার তাঁবুতে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকল, "নিমক খাওয়ার কথা আপনি আমাকে শোনাবেন না—"

"করালীবাবু, সেসব বাত বিলকুল ভুলে যান। এখন বাবু নাই। আপনি আছেন, আমি আছি—করালীবাবু, লীলাও তৈয়ার। সার্কাসের প্রেসটিজ রাখবার লিয়ে সে নম্বর করতে নারাজ হল না। সার্কাসের তাঁবুতে আপনার জীবন কাটল—কেন আপনি প্রেসটিজ রাখবেন না, বলেন?"

হারকু সাহেব যেমন মানুষ হোক, যতই ক্ষমতা থাক তার—করালীকান্তর মনে হল এখন সে তাকে বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করছে। এখন করালীকান্ত তার কথা না শুনে তাকে ফিরিয়ে দিলে সুনাম নষ্ট হবে জুয়েল সার্কাসের—যে সার্কাস তাকে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং তার নিজের সংসারের সব কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়ে তাকে পাথর করে রেখেছে।

বিড়ি নিবিয়ে ফেলল করালীকান্ত, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে হারকু সাহেব, আমি তৈরী হচ্ছি—"

হারকু সাহেব লীলাকে যে কথা বলেছিল, করালীকান্তকেও তা বলল, "সাবাস!"

নবীনের রক্তের কিছু কিছু দাগ তখনো ছিল রিং-এর ভেতর, লীলা দেখল না—করালীকান্তও না। রোজকার মতন আজও হাসছিল লীলা, এক-একবার মুখ তুলে দর্শকদের দিকেও তাকাচ্ছিল। ফাঁকা-ফাঁকা আসর। বেশী মানুষ আসেনি আজ, অনেকে ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেছে। এখনো একটা আতঙ্ক থরথর করছিল। করালীকান্ত হাসাতে পারল না একটি মানুষকেও। লীলার দুরূহ ব্যালেন্সের খেলা চললেও হাততালির শব্দ হল না একবারও।

মানুষ হাসছে না। করালীকান্ত দেখল হারকু সাহেব এসে বসেছে প্রথম শ্রেণীর একটা চেয়ারে। করালীকান্তকে দেখতে দেখতে একমাত্র সে-ই হাসছে। কিন্তু শুধু তাকে হাসাবার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরেও আবার রিং-এর মধ্যে এসে দাঁড়ায়নি করালীকান্ত। সে এসেছে জুয়েল সার্কাসের দর্শকদের আতঙ্ক-মুক্ত করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতে। তা যদি আজ না করতে পারে করালীকান্ত, তা হলে যে বিশেষ মর্যাদা একটু আগে তাকে দিয়েছে হারকু সাহেব তার কোন অর্থ থাকবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে নতুন কোন ভঙ্গি দেখাতে চাইল করালীকান্ত, নতুন কথা শুনিয়ে ভীতু গম্ভীর মানুষগুলোকে হাসাতে চাইল।

"হেই ম্যাডাম—হালুম! আই টাইগার—" লাঠি পায়ে মেরে চরর্ চর্রর্ শব্দ করল করালীকান্ত, বড় হাঁ করে হামাগুড়ি দিয়ে লীলার কাছে এগিয়ে

এল, "ঘোঁত-ঘোঁত! এই যে সারেরা, ম্যাডামরা! বাঘ ঘোঁত-ঘোঁত করে আবার হালুম-হালুমও করে—হালুম! হালুম! হালুম! নো ফিয়ার, ভয় পাবেন না!"

কথা বলছে করালীকান্ত যন্ত্রের মতন। তার হাতের লাঠির আওয়াজও আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে আস্তে হচ্ছিল। শুকনো গলার স্বর। ভাঙা আসরে রিং-এর আলোর নিচে দাঁড়িয়ে করালীকান্ত বুঝতে পারছিল, তার কথা কিংবা ভঙ্গিতে প্রাণের কোন স্পর্শ নেই।

শান্তির চিঠির কথা আবার মনে হল তার, মেয়ের কথা মনে হল। রাস্তায় খেলা করতে গিয়ে কাচের টুকরো ফুটেছিল তার পায়ে—ধনুষ্টঙ্কার হয়ে শরীর বেঁকে বেঁকে সে শেষ হয়ে যায়।

"কাচকা টুকরা—কাচের গুড়ো—" দেহ বেঁকিয়ে চলতে চলতে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে জোরে বলে উঠল করালীকান্ত, "কাচকা টুকরা পায়ের মে চুভ গয়া—" সুর করে এইসব কথা বলতে বলতে সে খুব তাড়াতাড়ি চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

কিছু পরে হঠাৎ থেমে পড়ে ডান পা তুলে প্রায় চোখের কাছে নিয়ে এসে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে করালীকান্ত বলল, "এই পা ছোট হবে, আরও ছোট হবে—আরও—আরও—" হঠাৎ পড়ে যাওয়ার একটা ভঙ্গি করে সে মাটিতে বসল এবং জিব দিয়ে পা চাটতে চাটতে চোখ-মুখ হাত ও পায়ের এমন অদ্ভুত ভঙ্গি করল যে তাকে একটা জানোয়ার বলেই মনে হচ্ছিল দর্শকদের।

খেলা শেষ করে চলে যাচ্ছিল লীলা, মাটিতে রক্তের দাগ দেখতে দেখতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল করালীকান্ত, লীলার পিঠে আস্তে লাঠির আঘাত করে সে আর একবার বলল, 'ঘোঁত!'

"কাচকা টুকরা পায়ের মে চুভ গয়া—ঘোঁত—" করালীকান্ত গান গাইতে গাইতে ছুটোছুটি করছিল, তার চোখ থেকে জল পড়ছিল। এখন করালীকান্তর মনে হচ্ছিল—মুখও অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেননা, তার কথায় ও ভঙ্গিতে প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে। এত বছরের সার্কাস-জীবনে রিং-এর মধ্যে এসে কোনদিন সে এমন কাঁদবার সুযোগ পায়নি।

॥ আঠাশ ॥

টালিগঞ্জের সরকারী হাসপাতালে পরদিন খুব সকালে নবীন মারা গেল। জোসেফ অনন্ত কাশী হারকু সাহেবের কথামতন সারা রাত অপেক্ষা করছিল হাসপাতালের বারান্দায়, যন্ত্রণার কোন চিৎকার বার হয়নি নবীনের মুখ দিয়ে। অবিশ্রান্ত রক্তপাতের ফলে তার শিরা-উপশিরা ঝিমিয়ে এসেছিল। মধ্যরাতের পর থেকেই তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর পর একটা সাদা চাদরে তার দেহ ঢেকে রাখা হল।

ভোরের হাওয়া সিরসির করছিল কাশী জোসেফ আর অনন্তর গায়ের ওপর। সারা রাত ঘুম না হওয়ার জন্যে গলা শুকনো, হাওয়ায় তন্দ্রার মতন মনে হচ্ছিল—তখন নার্স এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। কোন ভূমিকা না করে খুব অল্প কথায় বলল, "আপনাদের পেশেণ্ট মারা গেছে।"

ওরা তিনজন একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল। চমক ঠিক নয়, কেননা কাল রাতেই ওরা বুঝে নিয়েছিল আর কোনদিনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে না নবীন—বেঁচে উঠলে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকবে—তা হলেও নার্সের মুখ থেকে

নবীনের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে তীব্র একটা উত্তেজনায় হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াবার সময় হাসপাতালের নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চ উল্টে পড়ে গিয়েছিল।

নার্স ক্লান্ত, ঈষৎ বিরক্তও। সে চলে যাচ্ছিল, শব্দ শুনে অপ্রসন্ন মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু আস্তে।"

জোসেফ বলল, "ভেতরে যাব মেমসাব?"

"এখন না, আটটার পরে আসবেন। ডেড বডি আপনাদের দেওয়া হবে কি পোস্টমর্টেম হবে, আমি জানি না।"

নার্স চলে যাওয়ার পরেও আর কয়েক মুহূর্ত হাসপাতালের লম্বা বারান্দায় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জোসেফ কাশী আর অনন্ত। মৃত্যু দুর্ঘটনা এবং রাতারাতি দেহের বিকৃতি সার্কাসের মানুষের কাছে হয়তো কিছুই না, নম্বর করবার মতন এ খবরের জন্যেও তারা সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে, কিন্তু কাল রাতে—মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে একটা মানুষ ছিল তাদের পাশে তাদেরই মতন সুস্থ ও সবল—আজ একটু দূরে ঘরের ভেতর পড়ে আছে তার মৃতদেহ—এখনো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

নার্স অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে এখন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে জোসেফ অনন্ত আর কাশী হাসপাতালের বারান্দা পার হয়ে যাচ্ছিল। যে বেঞ্চ উল্টে গিয়েছিল, আসবার সময় খেয়াল করে তা আবার ঠিক করে রেখেছিল ওরা।

চারপাশে ওষুধের কড়া গন্ধ, কোন কোন ঘর থেকে দু-একবার রুগী চিৎকার করে উঠছিল। ওরা কথা বলল না—ট্রাম-লাইনের পাশে খুব সরু রাস্তা ধরে সাবধানে কয়েক পা হেঁটে সার্কাসের জমির গেটের ভেতরে ঢুকল।

আর কাউকে নয়, সবচেয়ে আগে খবর দিতে হবে হারকু সাহেবকে। তিনজনকে হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেখে কেউ কেউ এগিয়ে এল তাদের কাছে, নবীনের খবর জিজ্ঞেস করল। শুকনো হাসল জোসেফ, "পরে শুনবি আগে শুনুক ছোট মালিক—"

এত সকালে অন্য দিন ঘুম ভাঙে না হারকু সাহেবের। আজ এক পায়ের ওপর আর এক পা দিয়ে শুয়ে থাকলেও তার চোখ খোলা। জোসেফ অনন্ত আর কাশী তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তাদের দেখে উঠে পড়ল হারকু সাহেব এবং তারা কিছু বলবার আগেই শব্দ করে গলা পরিষ্কার করে একটা ভীতি কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, "সব ফিনিশ?"

"হ্যাঁ।"

হারকু সাহেব খাট থেকে নামল, পিছনে দু' হাত রেখে খুব তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আপন মনেই বলল, "বেচারা!"

জোসেফ বলল, "আপনাকে হাসপাতালে একবার যেতে হবে—"

"জরুর যাব। এ অনন্ত, সুবলবাবুকে বোলাও। আভ্‌ভি লিলুয়ায় বাবুকে খবর ভেজাতে হবে।"

ভোরবেলা সার্কাসের ছোট ছোট সব তাঁবুতে হাওয়ার মতন নবীনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে গেল। এই সাংঘাতিক খবর চেপে রাখা যায় না। সকলের সামনে আহত হয়েছে নবীন—নিহত হয়েছে। হারকু সাহেবের মনে হচ্ছিল হঠাৎ সব গোলমাল থেমে গেছে, চারপাশ বড় চুপচাপ। এবং সে একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের আশঙ্কায় লীলার তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হয়তো এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেছে লীলা—হাসপাতালে ছুটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। একটা অপরাধ-বোধ হারকু সাহেবকে আতঙ্কগ্রস্তের মতন

করে তুলেছিল—যেন নবীনের মৃত্যুর জন্যে লীলা তাকেই দায়ী করবে। তাকে শান্ত করবার জন্যে হারকু সাহেব তার কাছেই যাচ্ছিল।

হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে বড় স্থির হয়ে মাটিতে বসেছিল লীলা। তার চোখ শুকনো, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্তের মতন। এক দিকে বড় চায়ের ভাঁড়, অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে। কাগজের ওপর কয়েকটা সস্তা বিস্কিট—খুব সকালে কাউকে দিয়ে আনিয়েছিল লীলা—এখনো সেসব স্পর্শ করেনি।

হারকু সাহেবকে দেখে লীলার চোখ দুটো হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সে এক হাতে চায়ের ভাঁড় এবং অন্য হাতে বিস্কিট তুলে নিয়ে বলল, "খান।"

কঠোর এবং দুঃসাহসী হারকু সাহেব বেশী সময় লীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। তার মনে হচ্ছিল এখনো কিছু শোনেনি লীলা। নিজের বুক শক্ত করে চেপে সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করতে করতে হারকু সাহেব কিছু দূরে নবীনের একটা আবীর-লাগা রঙিন শার্ট দেখল, "ঘাবড়াবি না লীলা, একটা খরাপ খবর শুন—"

হারকু সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই বড় শান্ত স্বরে লীলা জিজ্ঞেস করল, "শ্মশানে কখন নিয়ে যাওয়া হবে হারকু সাহেব?"

লীলা আস্তে কথা বললেও একটা রূঢ় আঘাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল হারকু সাহেব, তার দৃষ্টির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তুই যাবি হাসপাতালে?"

লীলা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বার মতন শব্দ করল, "নাঃ, সে তো আর নেই—" হারকু সাহেব চা-বিস্কিট নিল না দেখে সে তা আবার নামিয়ে রেখে নরম গলায় বলল, "ভীতু মানুষটাকে কেন তুমি রিং মাস্টার করে দিলে হারকু সাহেব? যার একটুকু সাহস নেই সে কি বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারে!"

লীলার গলায় কান্না ছিল না, হারকু সাহেবকে দায়ী করার কোন প্রকাশও ছিল না, তার স্বর একটা মৃত মানুষের প্রতি করুণায় আর্দ্র—হারকু সাহেব লীলার মন বুঝল না।

তাকে এখনো স্থির ও শান্ত থাকতে দেখে সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছায় সে বলল, "সাহস দেখাল বটে নবীন, ভীতু মানুষ কে না! মরল, লেকিন বাঘ মানাবার হিম্মত তার ছিল রে লীলা।"

নবীনের মৃত্যুর খবর টুনিমাসীর মুখে প্রথম শুনেছে লীলা। তাকে শক্ত করে চেপে ধরে আপনজনের মতন অকৃত্রিম সমবেদনায় কথা বলছিল টুনি-মাসি। সে-ও ভেবেছিল লীলা চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে সব মেয়েই ভেঙে পড়ে, দিশা হারায়। লীলা কাঁদতে পারল না। সে জানত, সেই এক কথা শোনাতে হারকু সাহেব তার কাছে নিশ্চয়ই আসবে। এবং সে এখন তাকে ঈষৎ বিচলিত হতে না দেখে ভালবাসছে কি ঘৃণা করছে, লীলা বুঝতে পারল না।

হারকু সাহেব বলল, "উপ্পরওয়ালার যেমন খুশ তেমন হবে, তুই ঘাবড়াবি না লীলা।"

"না।"

"আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোর কী দরকার আমাকে বলবি—কোন ভাবনা করবি না।"

লীলা দু'-এক পা এগিয়ে এসে কিছু দূরে বাঘের খাঁচা দেখতে দেখতে রুক্ষ নীরব স্বরে বলল, "সাদা থান চাই আমার—"

"কী বললি?"

"বিধবা হলাম না হারকু সাহেব? থান পরব না? মাছ-মাংস—এসব কিছুই আর খাব না—"

"চুপ থাক লীলা। এখন কিছু করবি না—" লীলার তাঁবুর কাছাকাছি অনেক মানুষ এসে জড়ো হয়েছিল, হারকু সাহেব ছিল বলে তারা ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল, হারকু সাহেব সকলকে ডাকল, "ভিতর আসুন, এর সাথে বাতচিত বলেন, বেচারার বড় কষ্ট হল!"

একটা মৃত্যু কিছু সময়ের জন্যে সকলের মন ভারী করে তুললেও খেলা বন্ধ হল না। যারা আছে, সার্কাসের চক্রে ঘুরতে ঘুরতে তাদের বেঁচে থাকতে হবে জীবনপণ করে। সে চক্র অচল হয়ে থাকতে পারে না। যে জানোয়ার খেলাতে গিয়ে মরেছে নবীন, তাকে খেলাবে জোসেফ—জোসেফ না থাকলে আর একজন। চাবুকের ঘা এড়াবার জন্যে ক'টা মানুষকে মারবে চাঁদনী! অসংখ্য মানুষ বেঁচে থাকবার জন্যেই চাঁদনীর সংগে খেলবে।

রঘুনাথ বলল, "হারকু সাহেব, আর না। অনেক হল। এবার তাম্বু গুটাবার দরকার—"

"হ্যাঁ বাবু", হারকু সাহেব রঘুনাথের কথা না বুঝে বলল, "কৃষ্ণনগরে ক্যাম্প ঠিক হল, আমরা আউর তিন-চারদিনের ভিত্তর—"

অসহায়ের মতন হাসল রঘুনাথ। স্পষ্ট করে সে তার মনের কথা হারকু সাহেবকে বলতে পারছিল না।

অন্য ক্যাম্পের কথা বলেনি রঘুনাথ। এই জীবনমৃত্যুর ভয়ঙ্কর খেলার মালিক হয়ে থাকার তার আর উৎসাহ ছিল না। যশোদার অভিশাপের মতন উক্তি তার মনে একটা বিশ্রীরকম ভীতি সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। লিলুয়ায় নবীনের মৃত্যু-সংবাদ শুনে পাগলের মতন হেসে উঠেছিল যশোদা এবং রঘুনাথের ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "এখন হয়েছে কী, সবে তো শুরু—"

রঘুনাথ খুব আস্তে বলল, "কৃষ্ণনগরে যাবেন, আমি জানি, সেখানেও কোন না কোন মানুষ জখম হবে—" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল রঘুনাথ, তার পূর্বজীবনের কথা ভাবতে ভাবতে বলল, "আমার কাটামুণ্ডুর খেলা এর চেয়ে ভাল ছিল—সেখানে কারুর জীবননাশের ভয় ছিল না—"

রঘুনাথ ব্যথিত হয়েছে মনে করে তার দুর্ভাবনা লাঘব করবার জন্যে হারকু সাহেব হালকা স্বরে বলল, "নবীন বুদ্ধু ছিল বাবু, সেইজন্যে জান দিল।"

"কিন্তু ভোলা তো বুদ্ধু ছিল না।"

"সে মরল নিমকহারাম মদনমোহনের জন্যে—" রঘুনাথকে একটা সামান্য কারণে এমন ভেঙে পড়তে দেখে হারকু সাহেব অপ্রস্তুতের মতন ছেড়ে ছেড়ে বলল, "টাইম হলে উপ্পরওয়ালা বোলাবে বাবু, কোন মানুষ রুখতে পারবে না—" সে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর কিছু তুলে বলল, "কৃষ্ণনগরে বহুত লাভ হবে—"

"নাঃ", রঘুনাথ কিছু সময় চুপ করে থাকল, পরে বলল, "টাকা হল,

ধারও হল—তবে সুখ হল না হারকু সাহেব।"

"হবে বাবু, জরুর হবে।"

"নাঃ, আরও কত মানুষ জখম হবে, মারা যাবে—ভগবানের কাছে আমি কী কৈফিয়ত দিব হারকু সাহেব?"

"কৈফিয়ত আপনার কাছে কেউ তলব করবে না বাবু। হাঁ হাঁ, আমি বুঝি, নবীনের জন্যে আপনার মনে খুব কষ্ট হল। লেকিন একটা মানুষ মোটে মারা গেল। খেয়াল করবেন বাবু, আউর কত মানুষের জান আপনি বাঁচিয়ে রাখলেন।"

নবীনের মৃত্যুর জন্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়নি রঘুনাথের, কিছুদিন ধরেই একটা অবসাদগ্রস্ত মানুষের মতন তার সব উৎসাহ হারিয়ে যাচ্ছিল এবং তার প্রতি যশোদার সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাকে বড় দুর্বল করে তুলেছিল।

রঘুনাথের মনে হচ্ছিল তার গোটা জীবনটাই একটা ভিক্ষার ঝুলির মতন। যশোদার দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বেঁচে না উঠলেই যেন ভাল হত। কোন অবলম্বন নেই রঘুনাথের, তার নিজের বাড়িতেই সে শক্তিহীন প্রবাসীর মতন।

"হারকু সাহেব, আমাকে এইবার ছুটি দিন।"

"কোথায় যাবেন বাবু?"

রঘুনাথ কথা বলল না, ম্লান হাসল। কোথাও যাবে না সে, তার যাবার কোন জায়গা নেই। পরে সে কী করবে তাও তার জানা ছিল না। আপাতত সে যশোদার সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে তার কাছে এক নির্লোভ মহাপুরুষের মতন হয়ে উঠতে চাচ্ছিল।

"নবীন যেখানে গেছে, সেইখানে—"

"বাবু, এইরকম বাত বলবেন না। জলদি জলদি নয়া ক্যাম্পে গেলে আপনার মন ঠিক হয়ে যাবে।"

"কাকে নিয়ে যাবেন নয়া ক্যাম্পে?" রঘুনাথ খুব ভেবে কথা বলছিল, "খেলা জমবে না।"

"হাঁ বাবু, খেলা জমবে।"

রঘুনাথ হাসল, "শিববাবুর মাথা গরম। সে ছুটি চায়, দোসরা ক্যাম্পে যেতে নারাজ—"

"তার বদলি সুরেষ আছে।"

"মোহনলাল যাবে। করালীবাবু গেল। ঊষার তবিয়ত ঠিক নেই। লীলা পাগলার মতন হল। ভোলা গেল, নবীন গেল—"

রঘুনাথের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল হারকু সাহেব, "এসব লিয়ে ভাবনা করবেন না বাবু। যার খুশ হবে সে যাবে, লেকিন হাজার খেলোয়াড় আসবে—"

মনে কোন জোর পেল না রঘুনাথ। মাথা চুলকাল, পা ঘষল এবং পরে অন্য দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতন বসে থাকল।

আসলে কী কারণে সে এত নিরাশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে তা বোঝা হারকু সাহেবের কাছে খুবই কঠিন, তার এখনো মনে হচ্ছিল এসব শিবনাথের কাজ—সে নতুন কোন ভাংচি দিয়েছে তাকে। হয়তো তাকে আর জেনারেল ম্যানেজার করে রাখতে চায় না রঘুনাথ, তাই এইরকম কথা বলছে।

॥ ঊনত্রিশ ॥

শেষ ট্রাক এসে পেঁাছল অনেকবেলায়, দুপুর যায় যায় তখন।

চৈত্র খাঁ-খাঁ করছে, খোলা মাঠে কিছু শুকনো পাতা ঝরিয়ে গেছে এলো-মেলো গরম হাওয়া—সে সব একধারে জড়ো করেছিল রিং-বয়রা। এখন, এই ভরা দুপুরে দূর সমুদ্রে ছোট ছোট কালো নৌকোর মতন আকাশে চিল জ্বলছে, টানা টানা ডাক উঠছে এক একবার।

শেষ ট্রাকে এসেছিল হাসি, যমুনা, রাধানাথবাবু আর রাঘবনের ট্রুপ, তাদের মালপত্র ছাড়াও সার্কাসের কিছু সরঞ্জামও ছিলো। বড় তাঁবু খাটাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে রিং-বয়রা। তাম্বু মাস্টারের যন্ত্রপাতির আওয়াজ উঠছে—চীৎকার বকাবকি!

খেলা শুরু হতে হতে আরও দু'দিন। এ সময় অবসর সার্কাস আর্টিস্টদের। এখনো ঘরের টান আছে যাদের তারা ছোটে সেখানে, যাদের কেউ নেই, শুধুই সার্কাসের জমি আঁকড়ে থাকে, তারা পড়ে থাকে ভাংগা আসরেই। জুয়ো খেলে, মদ গাঁজা খায়, সুযোগ মতন মেয়েদের সংগে ইয়ার্কি-ফাজলামী করবার তালে থাকে।

চব্বিশ পরগণার ছোট একটা শহর, প্রায় গ্রামের মতন। দূরে দূরে বাড়ি ঘর। এবার তাঁবু পড়েছে ধু-ধু মাঠে, শ্মশানের কাছাকাছি। ক্যাম্পের পাশেই খুব বড় একটা পুকুর। শ্যাওলাধরা সিঁড়ি জল ছুঁয়েছে। কিছু দূরে ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবনও আছে। বাঁশবনের ভিতরে ঘুঘুর ডাক খেলে বেড়াচ্ছিল।

টালিগঞ্জ ক্যাম্পে আরও কয়েক সপ্তাহ খেলা চলত। দুর্ঘটনা যতই ঘটুক, দর্শক সেইসব গ্রাহ্য করে না, খবর রাখে না। ভিড় হচ্ছিল আগের মতন, সম্ভবত আরও বেশী। তাহলেও মালিকের কথা মতন সেখানকার ক্যাম্প রাতারাতিই ভেঙে দিতে হল।

যাবার কথা ছিল কৃষ্ণনগরে—এখন জমি পাওয়া গেল না—পেতে পেতে দিন পনেরো আরো। সুতরাং খুব অল্পসময়ের জন্যেই জুয়েল সার্কাসের তাঁবু পড়ল এখানে—বাদুড়িয়ায়।

একটা খুব দামী সিংহ, ভোলা—গলায় ঘা হয়ে মরল টালিগঞ্জে। রিং মাস্টার মদনমোহনের চাকরি গেল। নতুন রিং মাস্টার নবীন প্রাণ দিল হিংস্র বাঘিনী চাঁদনীর আক্রমণে। বুড়ো ক্লাউন করালীকান্ত চাকরি ছাড়ল। ব্যাণ্ডের দল থেকে গীটারবাদক মোহনলালও গেল। টালিগঞ্জের ক্যাম্পে লাভ লোকসান সমান সমান।

নতুন ক্যাম্পে খেলা শুরু হওয়ার আগে সকলেই যখন অবসর উপভোগ করে, শুয়ে বসে কাটায় আলস্যের এক এক মুহূর্ত, তখনো রাঘবন একটুও নরম হয় না—সে এ সময়ও তার ট্রুপের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের কাছ থেকে পুরো কাজ আদায় করে নেয়—বেত চালায় এক চুল এদিক ওদিক হলে।

রাঘবন কখনো ভোলে না সে শিক্ষক, পাকা খেলোয়াড় করে তুলতেই হবে প্রত্যেককে।

মার! মার! মার! মার হজম করতে না পারলে এইসব ছেলেমেয়েদের কেউ খেলোয়াড় হয় না সার্কাসের।

বড় তাঁবু খাটানো হচ্ছে, সেখানে প্র্যাকটিস চলে না এখন। রাঘবনের ট্রুপের ছেলেমেয়েরা খেলছে তাদের ছোট তাঁবুর বাইরে—কেউ কেউ প্র্যাকটিস করছে ভিতরে। রাঘবন খাটিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে কিছুসময় প্রত্যেকের দিকে চোখ রাখল, আর হাতের কাছে যে বেত ছিল কখনো কখনো তা শক্ত করে চেপে ধরে সে দাঁতে দাঁত ঘষল।

"এ হেম, বেত লাগাব। মাটিতে খাড়া হয়েও একবারও ছ'টা কাপ সসার মাথায় বসাতে পারলি না। হল কীরে তোর? শ্রীধরনের সাথে ঘুষঘুষ করে পীরিত করার সময় তো ভুল হয় না—"

কেবল তাকে মারল না রাঘবন, বেত চালাল শ্রীধরনের পিঠের ওপর খুব জোরে, জুত্তি লাগাব মুখে, পালটি খা একশবার। ড্রামের ভিতর ঘুষবার বেলা অত টাইম লাগে কেন? পালটি খেয়ে-খেয়ে বডি ঠিক রাখ্।"

একমাত্র নলিনীরই ছুটি এখন। তাকে খেলা শেখাবার আর দরকার নেই। সে পুরোপুরি তৈরী। নতুন কোন খেলা ইচ্ছে করেই তাকে আর রাঘবন শেখাবে না। সে জানে, নলিনীর বাপ এসে তাকে যে-কোনসময় রাঘবনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, অন্য সার্কাসে ঢুকিয়ে মোটা টাকা মারবে।

তা হলেও কাজ অনেক নলিনীর। যে কদিন সে আছে রাঘবনের ট্রুপে, ততদিন তাকে সকলের জন্যে রান্না করতেই হবে, সার্কাসের বাজনা বাজলে খেলও দেখাতে হবে। অমনি অমনি তার খাওয়া জোগাবার লোক নির্দয় ট্রুপ মাস্টার রাঘবন নয়।

তাঁবুর ভিতরে একদিকে বালতির ছোট উনুন জ্বলছে। তরকারী কেটে নুন মশলা মাখিয়ে রেখেছে নলিনী। তার গায়ে নোংরা রঙিন ব্লাউজ, ছেঁড়া শাড়ি। সবে বয়সের ছোঁয়া লেগেছে তার শরীরে, মনও থেকে থেকে ভারী হয়ে যায়। রান্না করতে করতে সে এক একবার মাস্টারের দিকে লুকিয়ে তাকাচ্ছিল।

"এ নলিনী," খাটিয়ার ওপর হঠাৎ উঠে বসল রাঘবন, নীল লুঙ্গি টেনে তুলে আরও শক্ত করে বাঁধল, "জলদি জলদি চা পিলাও এক কাপ।"

নলিনী রাঘবনের ফরমাস শুনে ভয় পেল না, হাসল। এবং অপ্রস্তুতের মতন থেমে থেমে বলল, "দশ পনেরো মিনিট দেরি হবে মাস্টার—"

রাঘবন কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"উনুনে ভাত ফুটছে—"

বেত তুলে নিয়ে নলিনীকে লক্ষ করে খুব জোরে ছুঁড়ে মারল রাঘবন, হাঁড়ি নামিয়ে রাখ—আগে চা করে দে আমাকে!"

আজকাল রাঘবন এইরকম ব্যবহার করে না নলিনীর সঙ্গে, এমন কড়া স্বরে কথাও বলে না। নলিনীর মুখে বিবর্ণ একটা ছায়া ফুটে উঠল। সে রাঘবনের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েকমুহূর্ত বোবার মতন, পরে উঠে দাঁড়াল—রাঘবনের বেত তার গায়ে লাগেনি, বাইরে গিয়ে পড়েছিল—নলিনী সেটা তুলে এনে খাটিয়ার ওপর রেখে দিল এবং তারপর ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মাস্টারের কথা মতন কেটলি বসাল উনুনে।

তাঁবুর একদিক রোদে ভরে গিয়েছিল। উনুনের ধারে বসে ঘামছিল নলিনী। আগুনের আঁচ গনগন করছে। অন্যসময় হলে সে শাড়ির এক প্রান্ত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলত, কিন্তু এখন সে তা করতে পারল না।

খেলা শেখাবার সময় মাস্টার তাকে অনেকবার মেরেছে—হাত দিয়ে, বেত

দিয়ে, কখনো কখনো পা দিয়েও—তখন এমন দুঃখ পায়নি নলিনী—আজ তার গলায় কান্না ঠেলে উঠছিল। কেন, সে স্পষ্ট করে বুঝল না।

কিছু পরে চোখের সামনে ভূত দেখার মতন চমকে উঠল রাঘবন। যদিও সে জানত যে কোন ক্যাম্পে যে কোন দিন নলিনীর বাবা তাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পড়তে পারে তবুও ভেবেছিল তার আসতে আসতে দিন কেটে যাবে আরও অনেক, এবং নলিনীকে ট্রুপে রেখে ততদিনে সে আর কিছু টাকা করে নিতে পারবে।

এই সার্কাসেরই এক ছোকরা রাঘবনের তাঁবু দেখিয়ে নলিনীর বাবা হরিহরণকে বলল, "এই যে। তোমাকে খুঁজছে মাস্টার।"

রাঘবনের আচ্ছন্নের মতন ভাব কাটতে কিছু সময় লাগল, যেন হরিহরণকে চিনতে তার বড় কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রের মতন উঠল রাঘবন, হরিহরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভীত, শুকনোস্বরে আস্তে বলল, "নতুন ক্যাম্প, কেমন করে এলে?"

বড় একটা ব্যাগ ছিল হরিহরণের হাতে, তাঁবুতে ঢুকেই সে তা রাখল খাটিয়ার ওপর। রাঘবনের কথার উত্তর দিল না, চারদিকে শুধু কড়া চোখে তাকাল, পরে নলিনীকে লক্ষ করে বলল, "তৈরী হয়ে নে, তোকে নিয়ে যাব।"

বাপকে এখানে দেখে নলিনী ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এখুনি তাকে নিয়েই গোলমাল তর্কাতর্কি শুরু হবে। হরিহরণের যেমন স্বভাব, সে জোর করে তাকে নিয়ে যাবেই এবং চীৎকার করে গালাগাল করবে রাঘবনকে।

বাপকে শুধু একবার চোখ তুলে দেখল নলিনী, কাছে এল না, কথাও বলল না। আশঙ্কা ও উত্তেজনায় তার মুখ বিবর্ণ হল এবং বুক থরথর করে উঠছিল।

রাঘবন বলল, "বস, বিশ্রাম কর। এ নলিনী, চা এক কাপ তোর বাপকেও দিবি বুঝলি। রেবতী আমিনা, আরে হেম, যা যা তোরা। খুব প্রাক্‌টিস হয়েছে, আর দরকার নেই। তোমার জন্যে কিছু তরকারী বানাতে বলি হরিহরণ?"

হরিহরণ বেশ রূঢ় স্বরে বলল, "কিছু দরকার নেই। মাস্টার, তুমি বড় ভুগিয়েছ আমাকে, সাত মাস একটা পয়সাও পাঠাওনি। মেয়েটাকে সার্কাসে পাঠালাম কি এইরকম ঠকাবার জন্যে?"

রাঘবন ঝপ করে খাটিয়ায় বসল, পেটে খুব জোরে জোরে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, "টাকা আমি যেমন পেরেছি তোমাকে পাঠিয়েছি—"

"সব হিসাব আছে আমার, তুমি আমাকে আজ পর্যন্ত সবসুদ্ধ আশী টাকা পাঠিয়েছ।"

"নলিনীর খরচ নেই? তার জামা কাপড়, খাওয়া? খেলা তো শিখল সেদিন। আমি তাকে বসে বসে খেতে দিলাম না কতদিন? খেলা শেখালাম না?"

নলিনীর বাবা দাঁত চাপল, মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলে উঠল, "আমি সব জানি। তুমি যে কেমন লোক মাস্টার, তা খুব ভাল করেই বুঝেছি। ওকে তোমার ট্রুপে না দিয়ে অন্য সার্কাসে রাখলে, পয়সাকড়ি অনেক বেশী পেতাম আমি।"

"তা দিলেই তো পারতে অন্য সার্কাসে—"

"তুমি জোর করনি, ধাপ্পা দাওনি আমাকে?"

রাঘবন আবার উঠে দাঁড়াল, ঝগড়া করবার মতন বলল, "কিসের ধাপ্পা?"

"বলনি, ছ'মাসের মধ্যে আমি নলিনীকে ছ'টা নম্বর শেখাব, তারপর মাস-

মাস একশ' টাকা পাঠাবে আমাকে?" এক মিনিট থামল হরিহরণ, "পাঠিয়েছ? ওর মা মরেছে টাকার অভাবে, ভাই মরেছে! সব লিখেছিলাম তোমাকে, জবাব দিয়েছিলে আমার একটা চিঠিরও?"

রাঘবন একটা উত্তেজনার ঘোরে ফস্ করে বলল, "আমি চিঠি পাইনি।"

"চুপ মাস্টার, চুপ", রাঘবনকে যেন মারবে এমন ভাব দেখিয়ে একটা হাত তুলে সামনে এগিয়ে এল হরিহরণ, "তুমি চোট্টা, তুমি ডাকু। এ নলিনী, তুই জানিস তোর মা মরেছে, তোর ভাই মরেছে—তুই চিঠি লিখিসনি এসব জেনে আমাকে, বল?"

নলিনীর একবার ইচ্ছে হল যা সত্যি তা বলে হরিহরণকে। অপদস্থ হোক রাঘবন। কেন সে শুধু শুধু বেত ছুঁড়ে মারল তাকে।

তবে, সেসব বলতে পারল না নলিনী, বাপের দিকে দেখল না, সে ভাল করে তার কথা শুনতেই পায়নি। চায়ের জল ফুটে গিয়েছিল, টিনের একটা সবুজ মগে কিছু চা পাতা ফেলে তার মধ্যে গরম জল ঢেলে সে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকল। এবং তারপর শাড়ির এক প্রান্ত দিয়ে মুখ কপাল ও গলার ঘাম মুছে নলিনী আবার ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিল উনুনের ওপর।

আরও পরে সে দুটো চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রাঘবন আর হরিহরণের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "বিস্কিট আনিয়ে দেব?"

"না-না," মাটিতে পা ঠুকে গলা ফাটিয়ে হরিহরণ বলল, "তোকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে, বললাম না তৈরি হয়ে নিতে? জামাকাপড় জিনিস যা আছে গুছিয়ে নে সব—"

রাঘবন ঘন ঘন মাথা নাড়ল। তার কাপে চা টলমলো করছিল, মাটিতে কিছু উছলে পড়ল। সে ভারী গলায় খুব আস্তে বলল, "এখন ও যেতে পারে না।"

হরিহরণ তেড়ে উঠল, "কেন?"

কতগুলো নিয়মকানুন আছে তো কোম্পানীর। সেসব না মানলে চলে! এখন এখানে মালিক নেই, জেনারেল ম্যানেজার নেই। পরশু থেকে খেলা শুরু হবে, ট্রুপের প্রেস্টিজ নেই আমার? তুমি যদি আমাকে আগে চিঠি লিখে জানাতে—"

"চুপ মাস্টার," হরিহরণ রাঘবনের কথার মাঝে চীৎকার করে উঠল, "আমি অনেক চিঠি লিখেছি তোমাকে—আজ কোন কথা শুনব না, তুমি না যেতে দিলে আমি আমার মেয়েকে জোর করে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাব। দেখি, কে বাধা দেয়।"

রাঘবন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করল "নিয়ে যাবে কোথায়?"

"অত খবরে তোমার দরকার কী?"

"দরকার আছে—" হরিহরণের সঙ্গে ভদ্রভাবে একটা বোঝাপড়া করে নেয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল রাঘবন, সে ভাবল, সম্ভবত কিছু টাকা এখন হাতে গুঁজে দিলেই তার মেজাজ নরম হয়ে আসবে।

রাঘবন একটু ভেবে বলল, "আমি নলিনীর মাস্টার, যত্ন করে তাকে খেলা শিখিয়েছি, কত পরিশ্রম করেছি তার জন্যে, এখন তুমি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? সে ভাল থাকবে না খারাপ থাকবে—এসব আমার জানবার দরকার নেই?"

হরিহরণ কিছু সময় চুপচাপ থাকল। চায়ের কাপে চুমুক দিল। হয়ত